অন্য বিবর

অবনী সাহা

॥ পরিবেশক ॥

নয়া প্রকাশ

২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

Anya Bibar

(A Research Novel based on Prostitution)

প্রকাশ করেছেন
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়
২০৬/১ই বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

॥ ১৯৬২ ॥

ছেপেছেন
শ্রীবঙ্কিম দাস
ওরিয়েন্ট প্রেস
১২৩/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬
ও
গুপ্ত কোম্পানী
১৬/৩ই ডিক্সন লেন
কলিকাতা-১৪

এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতো
বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং নতু বিশ্বসন্তি।

তস্মান্নরেণ কুলশীলসমন্বিতেন
বেশ্যা শ্মশানসুমনা ইব বর্জ্জনীয়া ॥

—শূদ্রক

এরা (বেশ্যারা) বিত্তের অর্থাৎ টাকা-পয়সার জন্য হাসে এবং কাঁদে। পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে, কিন্তু পুরুষকে বিশ্বাস করে না। সেজন্য শ্মশানে-ফোটা-ফুলের ন্যায়, কুলশীলসমন্বিত ব্যক্তির, বেশ্যাকে বর্জন করা উচিত।

●

সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
বিবেকো নাস্তি মূর্খানাং বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্ ॥

—কালিদাস [মৃত্যুকালীন কবিতা]।

বেশ্যাদের সদ্ভাব, সম্পদের স্থায়িত্ব, মূর্খ ব্যক্তির বিবেক এবং কর্মের বিনাশ

বিশ্বনাথ মন্দিরে যে মহিলাটি ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম সেরে পিছন ফিরলো, তাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। চিনতে পেরে চমকে উঠেছিলাম। একি, কমলরাণী নয়!

কমলরাণীও আমাকে চিনতে পেরেছিলো! বিস্ময় আপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলো, একি দাদা, আপনি এখানে!

আশ্চর্য বৈকি! কোলকাতার নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের চূড়ান্ত নাস্তিক প্রবর সত্যেন রায় ওরফে সতু রায়কে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে দেখলে যে-কেউ চমকে উঠতো বৈকি!

কিন্তু আমিও চমকে উঠেছিলাম। চমকে উঠেছিলাম কমলরাণীর পরণের থান কাপড় দেখে। কমলরাণী আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলো। তারপর একটি বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলো, দ্বিজু মারা গেছে দাদা। দ্বিজু চৌধুরীকে খুন করে ফেলেছে ওরা।

কমলরাণীর চোখ দিয়ে কি এক ফোঁটা জল পড়লো! কে জানে।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, সকাল বেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জেগে ওঠে। তখন ওখানে যেওনা রায় মশাই। সোনাগাছি বাই লেনে তখন সবে সন্ধ্যে। গোটা রাস্তাটা তখনও এঁটো কাঁটা, ঠোঙ্গা, ডিমের খোশা, মাংসের হাড়ে ভর্তি। চাই কি ডজন খানেক ভাঙা গেলাস, দু চারটে খালি মদের বোতলও পেতে পারো। কিন্তু গতরাত্রির উদ্দাম চঞ্চলতা, উচ্ছ্বল যৌবনের উপচানো অপচয়ের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পাবে না। সারা সোনাগাছি বাই লেনের বাতাসে একটা ভারী কটু গন্ধ তখনও বয়ে চলেছে। মাথা ঝিম ঝিম করা এক ক্লেদাক্ত আবহাওয়া ছড়িয়ে থাকবে। তখন কোন কাজ হবে না।

—বেশতো, তাহলে না হয় একটু বেলায় যাওয়া যাবে।

চৌধুরী হাসতো। হেসে বলতো, তোমার পূর্বপুরুষ নাকি উনবিংশ

শতকের জমিদার ছিলেন। তাঁদের কাহিনী শোননি! তাঁদের দৈনন্দিন কার্যসূচী! রাত তিনটের আগে ঘুমুতে যেতেন নাকি কেউ! কেউ কেউ তো আবার সকাল বেলা। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের এক জায়গায় এ ইঙ্গিত পড়নি ভায়া! তোমরা তো রীতিমত লেখাপড়া জানা ছোকরা! এক লেখাপড়া জানা পণ্ডিতের কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। কালিদাস মেঘকে বলেছেন,

তস্মিন্ কালে নয়ন সলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং শান্তিং নেয়ং
প্রণয়িভিবতোবর্ত্ম ভানোস্ত্য জাশু।

'মেঘ! সেই অতি ভোরে—ভালো করে আলো ফোটার আগে, সারারাত অন্য খানে কাটিয়ে লম্পট পুরুষগুলো ঘরে ফিরে আসে, ও তাদের অলসঅঙ্গ শিথিলকবরী সতীলক্ষ্মী পত্নীদের কাছে গিয়ে, কত মিছে কথা বলে তাঁদের ভুলায়। দুঃখিনীদের দুঃখের নয়ন জল মুছিয়ে দেয়, সুতরাং তুমি আবার সূর্যের পথ আটকে থেকো না। তুমি যদি ও-সময় সূর্যকে ঢেকে থাকো, তাহলে ঐ পুরুষগুলো, এখনও রাত আছে ভেবে বাড়ী ফিরতে দেরী করবে। ওদের তো দয়া মায়া বলে কিছু নেই।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু জমিদার বাবুই দেরী করে উঠতেন। বেলা বারোটার আগে তাঁদের নাসিকা গর্জন থামতে চাই তো না। তারপর তৈলমর্দন পর্ব। সেও প্রায় ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। নাপিতের পাওনা চানের কাপড় গামছা। তৈল মর্দনকারীর লভ্য তেলের বাটী। বকশিস্। এরপর স্নান পর্ব বিকেল পর্যন্ত। চান করতে করতে রাত্রির গল্প, শলা পরামর্শ এক পর্ব। তারপর খাওয়া সেরে (সেও রাজসিক কারবার) দিবা নিদ্রা। সন্ধ্যে বেলায় দরবার। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দরবার। জলসা। অভিসার।

সোনাগাছি বাই লেনের দেহোপজীবিনীরা জমিদার নয়। কৌলিণ্যেও অন্ত্যজ। তবু কার্যক্রমে কিছু মিল আছে বৈকি। তাদেরও বেলা দশটা বারোটা পর্যন্ত নিদ্রা পর্ব। সে নিদ্রা বেভোল বেহুঁসের নিদ্রা। ক্লান্তি অপনোদনের নিদ্রা।

সে সময় যেওনা ভায়া। রঙচঙে নতুন পুতুল জলে ডুবিয়ে নিলে যে

অবস্থা হয়, এর চেয়ে সুন্দর লাগবে না তোমার। যে কাজে যাবে, কাজও হবে না।

বললাম, বেশ তাহলে বিকেল বেলাই যাওয়া যাবে। তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যেও চৌধুরী। না, চৌধুরীকে বোধহয় তখন 'আপনি' বলেই সম্বোধন করতাম। চৌধুরীও কি আপনি, এজ্ঞে, বলতো? তা হবে, ঠিক মনে পড়ছে না।

তবে আমার কথার উত্তরে চৌধুরী হেসে ফেলেছিলো।

—তা মন্দ বলনি। কে যেন মেয়ে দেখতে যেয়ে বলেছিলো, মেয়েকে সাজাবার দরকার নেই, যেমন আছে তেমনি নিয়ে আসুন। কিন্তু তা যায়নি, কারণ কনে তখন গাড়ু গামছা নিয়ে বাথরুম থেকে বেরুচ্ছিলো। বিকেল বেলা ওদের গামছাপরা মূর্তি দেখতে পার বটে। সবাই না হলেও এক বাড়ীতে আর কটা পয়সাওয়ালা 'ইয়ে' থাকে বলো। ও সময়টা ওদের গা-ধুয়ে, চান করে তৈরী হয়ে নেবার সময়।

চান করে গা ধুয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তারা প্রসাধন করবে। দিনের পর দিন দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের চিহ্নগুলো, দন্ত ক্ষত, নখর ক্ষতের চিহ্নগুলো সযত্নে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করবে। আর সাজসজ্জা! তাও করবে বৈকি। বাজারের আধুনিকতম ডিজাইনের কাপড় পরবে। জামা গায় দেবে। যথাসম্ভব গয়নাও পরবে। সবই আধুনিক ধরণের। ভদ্র পল্লীর সর্বাধুনিক রীতি নীতির অনুকরণে। কখনও কখনও তাদের চেয়েও আরো এগিয়ে। আরো উদ্ধত, আরো নির্লজ্জ ভঙ্গীতে। চুল বাঁধবে। লিপষ্টিকের ছোঁয়া লাগাবে। সুগন্ধি মাখবে। তারপর দাম অনুযায়ী যে যার জায়গা নেবে।

বলেছিলাম, দাম অনুযায়ী মানে?

—খোকা, ও পাড়ায়ও কুলীন অন্তজ সব আছে, তোমাদের ভদ্র পাড়ার মতো। কেউ সেখানে রাণীর হালে থাকেন। লোক লস্কর, তকমা আঁটা দারোয়ান, জুরীগাড়ি পালকি বেহারা, আধুনিক মডেলের মোটর, রেফ্রিজারেটার, ক্লিনিং মেশিনওয়ালী। তাদের অনেকে একহাজারী, পাঁচহাজারী মনসবদার। কেউ রক্ষিতা হিসেবে মাসোহারা পেয়ে থাকেন, কেউ কেউ আবার কারও বাঁধা নয়। মোটা ভিজিটে ব্যবসা চালায়। শেষ

বয়সে কাশী বৃন্দাবনবাসীও হন অনেকে। মন্দির মসজিদও গড়ে তোলেন এখানে সেখানে। এ তীর্থে, সে তীর্থে। দান খয়রাত, অতিথিশালা ধর্মশালাও আছে অনেকের। এরাই হচ্ছে ওদের সমাজে কুলীন। এই কুলীনদের মধ্যে কেউ কেউ দেহ ব্যবসায়িনী, কেউ কেউ আবার নৃত্য শিল্পে, সঙ্গীত শিল্পে, থিয়েটার বায়োস্কোপ শিল্পে দিকপালিকা। উনবিংশ শতকে তো বটেই, এই বিংশশতাব্দীতেও খুঁজলে এদের অনেকের দেখা পাবে। আবার খোলার বস্তির ঘিঞ্জি গলিতে বেখাপ্পা বেমাত্রা রঙ মেখে, ছেঁড়া রঙচটে শাড়ী ব্লাউজ পরে ছ' আনা আট আনায়ও লোক বসায়, এমনদেরও সংখ্যা এই কোলকাতা সহরে প্রচুর পাবে।

ওদের সমাজে মধ্যবিত্তও আছে। তারা রাস্তায় দাঁড়ায়না। রাস্তায় দাঁড়ানো এখন নাকি আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে শুনেছি। অনেক কিছু বিধি নিষেধ এখন। তবে পাহারাওয়ালা, অফিসার বাবুদের দক্ষিণা দিয়ে নাকি অনেক কিছুই সামলানো হয়। শত্রুতা করে অবশ্য অনেক নির্দোষকেও থানা—কোর্ট পর্যন্ত টানা-হিচড়ে যে করা হয় না, প্রকৃত দোষীদের সঙ্গে, তাও নয়।

মধ্যবিত্তদের অনেকেই ঘরেই বসে থাকে। দালাল আছে, তাদের মাধ্যমে খদ্দের আসে। 'মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি' হয়। পছন্দ হলে একা, বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে যায়। গান বাজনা, হৈ হুল্লোড় চলে। ফূর্তিফার্তা চলে। এক ঘণ্টা, সারারাত, সে খদ্দেরের ইচ্ছে, ট্যাঁকের ইচ্ছে। তবে খদ্দের লক্ষ্মী। তাদের ফেরাতে চায়না সাধারণত কেউই।

আর, একবার ঘর চেনা হলে, জানাশোনা হলে খদ্দেররা নিজেরাই পথ চিনে আসে। যে ক'দিন খুসী আসে। ভালো লেগে গেলে সহজে দোকান পাল্টায় না। আবার, নিজের থেকেও কেটে পড়ে, ওরাও কাটিয়ে দেয়, তেমন তেমন বুঝলে। কিন্তু সে হচ্ছে অন্য কথা। আলাপ যখন হয়েছে, সে কেচ্ছা কত শুনতে পাবে। এখন যা বলছিলেম, সুতরাং বিকেল বেলার অ্যাডভেঞ্চার বাদ দিতে হবে বন্ধু। কাজ কি ওদের ডিস্টার্ব করে। বিশেষ করে তুমি তো আর খদ্দের হওনি এখনও। আর আমি কিছু তোমার এজেন্টও নই।

হেসে বলেছিলাম, তাহলে আমাকে বাদ দিয়েই যাও চৌধুরী। তোমার
পাঁচ-হাজারী মনসবদার দেখার বাসনা নেই আমার।
—আহা, চটোনা ভায়া। তোমাকে ছাড়া কি চলে? গেঁয়ো যোগী কি
ভথ্ পায় ব্রাদার! ও পাড়ায় খদ্দেররা যেমন আনকোরা আমদানী চায়,
পাড়ার বাসিন্দেরাও আনকোরা, নবীশ খদ্দের পছন্দ করে। সুতরাং
সো। দুপুর বেলায় এসো। ঐ সময়টাই আজকাল নিরাপদ। রাত্তিরের
মেলা ঝামেলা নেই। চেনাজানাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম, অবশ্য
দি চেনা জানাদের তুমি নিজে চিনতে চাও সে স্বতন্ত্র কথা। সব চাইতে বড়
থা, ঐ দুপুর বেলাই যা ভিড় কম। দুপুর বেলায় এসো। দ্বিজু চৌধুরী
লে ডেকো। ঐ সময় আমিও অনেক বাড়ীতে গান শেখাই। গলাও
নেকের ভালো! দেখে শুনে বেছে নেওয়া যাবে। রিহার্শেলের ঘরের
বস্থাও করা যাবে। আর সে জন্যেই তোমাকে দরকার। নইলে ওপাড়ায়
মার যা সুনাম, আমি চাইলে ঝাঁটা পেতে পারি, ঘর পাওয়া মুস্কিল।
ঘরের ব্যবস্থা দ্বিজপদ চৌধুরীই করে দিয়েছিলো। চৌধুরী রেডিওতে
ন দেয়। দু'-পাঁচ মাস পর এক আধটা সম্প্রদায়ের প্রোগ্রামও পায়।
তিন খানা পল্লীগীতির রেকর্ডও আছে, দ্বৈত কণ্ঠে। এক আধটা একক
ার। যাত্রাদলের সঙ্গীত পরিচালকও ছিলো কিছু দিন। বিয়ে থা-ও
রেছিলো উঠতি বয়সেই। যাত্রার দলে থাকতে থাকতেই। স্ত্রী আঙ্গুর-
লা যাত্রার দলেরই মেয়ে। এনেছিলো অ্যামেচার অ্যাক্টর সুধু ঘোষ।
ফ্যুজি মেয়ে। পাকিস্তান হবার পর বাপ মাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে-
লো। এ ক্যাম্প থেকে সে ক্যাম্প ঘুরে নদের এক ক্যাম্পে। শেষ পর্যন্ত
কার থেকে পুনর্বাসনও পেয়েছিলো। কোলকাতার কাছেই। কাঠা
চেক জমি, আর কিছু নগদ টাকা। কিন্তু পরের বছরই বাপ দেহ রাখলো।
ার বাপেরই বা দোষ কি, অ্যাদ্দিন যে বুড়ো টেনে হিচড়ে আসতে
রেছিলো এই যথেষ্ট। পরের বাড়ী রান্না করে, বাসন মেজে পেট
লাতো মা। আঙ্গুরবালার বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো। দু চার বছর
মিয়েও বলে থাকতে পারে। মা বলতো বাড়ন্ত গড়ন। তা হবে। মার
সুখ বিসুখ করলে তাকেই যেতে হতো বাবুর বাড়ী রাঁধতে। সুধু ঘোষ

সেই বাবুর বাড়ীরই ভাগ্নে। থিয়েটারে অ্যামেচার হিসেবে সাইড্ পার্ট করতো। মদ ভাঙ্ খেতো। বন্ধু বান্ধব নিয়ে এখানে সেখানে হৈ হুল্লোড় করতো। মাথার উপর বুড়ো দাদু। কিন্তু সে বুড়োর সাধ্য কি এমন বুনো ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে আটকে রাখে। অনিবার্য কারণেই বাড়ন্ত গড়ন আঙ্গুরের উপর নজর পড়েছিলো ছোকরার। ফাঁক পেলেই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো। রাজা উজীর মারতো। বুড়ো মরলেই এ সম্পত্তি সেই পাবে, তখন আর তাকে পায় কে, এমনি তেমনি গল্প সল্প করতো। সুযোগ পেলে গা গতরে হাত দিয়ে আদর করতো। না, না, বলে আপত্তি করেও কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে গলে পড়তো আঙ্গুরবালা। ভবিষ্যতের স্বপ্ন হাতছানি দিতো। ভয়ও করতো।

এমনি সময় সুযোগ বুঝে মাও পাড়ি জমালো। কদ্দিন আর স্বামীকে ছেড়ে থাকে সতীলক্ষ্মী। রয়ে গেলো বাড়ন্ত গড়ন মেয়ে। বিশ্ব সংসারে একা।

তারপর একদিন সুধু ঘোষের হাত ধরেই যাত্রার দলে এসেছিলো আঙ্গুরবালা। যাত্রার দলে সখীর পার্টে চান্সও পেয়েছিলো। নাচতে হতো অন্য সখীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেও হতো।

গানের সুবাদেই দ্বিজপদ চৌধুরীর নাগালে আসা। সেই সুবাদে গাঁথে পুরেছিলো দ্বিজপদ। ষোল বছরের টস্‌টসে আঙ্গুর। না, তেমন রঙদার চেহারা পত্তর নয়। বরং রঙটা একটু চাপা, কপালটা একটু চওড়াই আঙ্গুরের ভাগ্যতত্ত্বে এইসব মেয়েদেরেই নাকি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে বলে থাকে গণৎকারেরা কিন্তু সব মিলিয়ে অমন গড়ন ক'জন বাঙালী মেয়ের হয়।

সুধু ঘোষ অবশ্য বিয়ে কোনদিনই করতো না আঙ্গুরকে। এ ধরণের মধুকরেরা সহজে কাউকে বিয়ে করেও না। তবে আঙ্গুরের প্রতি একটা জৈব আকর্ষণ না ছিলো তা নয়। কিন্তু হাতের কাছে ছিলো বলেই মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন ছিলোনা! বিরহটা চাগিয়ে উঠলো যেদিন করিৎকর্মা দ্বিজপদ চৌধুরী একেবারে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তুললো। দলসুদ্ধ বৌভাত খাইয়ে সবার প্রশংসা অর্জন করলো। বিয়ের কনে আঙ্গুরই রেঁধে বেড়ে খাওয়ালো। সামান্য যোগাড় যন্ত্র হলেও রাঁধুনীর বেটী আচ্ছা খেল দেখিয়ে দিলো। সুধু ঘোষের পাতে দু খানা মাছের টুকরোই দিয়েছিলো

কিন্তু আরও খেল দেখালো দ্বিজপদ চৌধুরী। যাত্রার দল থেকে নাম কাটিয়ে নিলো আঙ্গুরের। বড় অ্যাক্টরদের কথা বাদ থাক। বেতাল বেচাল খুব বেশী না হলে সখীর পার্টের মেয়েদের উপর বড় নজর দেননা তাঁরা। কিন্তু—অন্য পঞ্চজন! দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখে ক'জন বল সাধু থাকতে পারে। না থাকে! থাকার প্রয়োজনটাইবা কী! কে মাথার দিব্যি দিয়েছে সাধুসজ্জন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজতে। বলি, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই কি আর সাধুপুরুষ এ ব্যাপারে! মাতাঠাকুরাণী যেই বললেন, ভাগ করে নাও পঞ্চজনে, অমনি মাতৃভক্ত হয়ে পড়লেন। কত যুক্তি, কত সাফাই। তিনি বললেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলের হোক। এতে মায়ের কথাও থাকবে, আর দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিচ্ছেদও ঘটবে না। কারও ঈর্ষার কারণও থাকবে না।

রাজা দ্রুপদ যখন শুনলেন সখা পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন কৃষ্ণাকে জয় করেছে, তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না।

তিনি নিজে এসে কুন্তী দ্রৌপদীকে সামনে রেখে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আজ দিন ভাল, আজই তাহলে অর্জুন দ্রৌপদীকে বিয়ে করুক।

যুধিষ্ঠিরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ইয়ে তা কী করে হয় বলুন, আমি বড়, আমি বিয়ে না করতে অর্জুন কী করে বিয়ে করে! আর একটা কথা কি জানেন স্যার, যদিও অর্জুন কৃষ্ণাকে জয় করেছে, তবু আমাদের ভাইদের মধ্যে এমন একটা সদ্ভাব আছে, আমরা কোন উৎকৃষ্ট জিনিস পেলে সবাই মিলে ভাগ করে নি। আর দেখুন, আমাদের মাতাঠাকুরাণীও অনুমতি দিয়েছেন (বুঝুন মশায়, কাণ্ডখানা। কুন্তী ভুল করে বলে ফেলেছিলেন যা, যুধিষ্ঠির খুড়ো তাই আঁকড়ে ধরেছেন)।

বেচারা দ্রুপদ পাণ্ডবদের চটাতে সাহস পাচ্ছেন না। অথচ কাণ্ডটা যা ঘটতে যাচ্ছে বুড়োর চক্ষু চড়ক গাছ। চন্দ্রবংশে এ হেন কর্ম আর ঘটেনি। ঢোক গিলে বললেন, তা বাপু, তুমি যদি মনে কর এটা ন্যায়সঙ্গত হবে, তাহলে তাই কর, আমি আর কী বলবো। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেয়ান ঠাকুরাণীর সঙ্গে আর একবার কথা বলে নিও। বিয়েটা না হয় একদিন পরেই হবে।

বিয়ে হলো। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে একবছর করে দ্রৌপদী এক এক স্বামীর কাছে থাকবে ঠিক হলো। বেচারা অর্জুনের থার্ড চান্স। যুধিষ্ঠির বাবুর আনন্দের সীমা নেই। 'রাত্রি দিবা করে কেলি দোঁহে কুতুহলে।' এই রকম একদিন শয়নাগারে নয়, অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী। ব্যস, শর্ত অনুযায়ী অর্জুনের বনবাস। কে জানে প্ল্যানটা যুধিষ্ঠিরের কিনা! অর্জুন ছোকরাকেই তো ভয় বেশী তাঁর। তা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই যদি আরও স্ত্রী থাকতে এই কাণ্ডমাণ্ড করে থাকতে পারেন, যাত্রার দলের নকুল সহদেবরা ছেড়ে কথা বলবে কেন? বলি, তিলোত্তমাকে দিয়ে সুন্দ উপসুন্দ ঘায়েল করাবার পর দেবতাদের মধ্যে তিলোত্তমার স্বামীত্ব নিয়ে সে কী কাণ্ড। ইন্দ্র শচীকে বরখাস্ত করতে চায়। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে। মহাদেব অতখানি না যেয়ে (দেবাদিদেব বলে একটা চক্ষু লজ্জা আছে তো), মা-দুর্গার জন্য নাকি দাসী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। পরশুরামের মতে ব্রহ্মা বেগতিক দেখে, 'তিলোত্তমে, স্ফট, স্ফট স্ফোটয়' বলে ফাটিয়ে দিলেন তিলোত্তমাকে। দেবকুল তথা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিষ্কৃতি পেলেন গৃহবিচ্ছেদের হাত থেকে।

যাত্রার দলেও এমন আকছার ঘটে। তবে দলের যাঁরা কর্তাব্যক্তি তারা লক্ষ্য রাখেন, এই অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন দলের কোন ক্ষতি না হয়। হিংসার পরিণতিতে যেন দলভাঙাভাঙি না হয় (হয়ও)। ছুরী ছোরা না চলে। চললে পাঁচ ঝামেলা। দলেরও, দলের অন্যান্যদেরও।

দ্বিজপদ সবাইকে বলে কয়েই আঙ্গুরবালাকে নিয়ে বেলগাছিয়ার এক বস্তিতে ঘর বেঁধেছিলো। একখানা ঘর। নিচের অংশ ইটের। উপর অংশ টিনের। বারান্দায় একফালি রান্নার জায়গা। গোটা বাড়ীতে ৭।৮ ঘর ভাড়াটে। ওরই মধ্যে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলো আঙ্গুরবালা। ছোটবেলা থেকে নাহোক বাপ মারা যাবার পর থেকে তো পোড় খেতে খেতে চলতে হয়েছে! দ্বিজপদ সুখীই হয়েছিলো। কেউ কারও অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করেনি। মাতামাতি যা করেছে বর্তমান নিয়েই। দ্বিজপদের রুচিবোধ মন্দ ছিলো না। ছেঁড়া কাপড় ছিঁড়ে জানালার পর্দা তৈরী করতো আঙ্গুরবালা। বিকেল হলে গা ধুয়ে, কি চান করে টান টান করে চুল বেঁধে একটু আধটু

স্নো পাউডারও মাখতো। একে আঙুরের সুন্দর স্বাস্থ্য, সাজসে গুজসে যৌবন ফেটে পড়তো। গায় গতরে খাটতেও পারতো।

এদিকে সপ্তাহে এক আধদিন ছুটি পাওয়াও কঠিন ছিলো না। সেদিন দুজনে বেড়াতে বেরুতো। পয়সা থাকলে সিনেমায় যেতো। তারপর বেলফুলের মালা কিনে এনে রাত দুপুরে একে অন্যকে পরিয়ে দিতো।

তবে বাইরে গাওনা গাইতে গেলেই যা অসুবিধে। একেবারে ২.৪ মাসের ধাক্কা। তা বাড়ীওয়ালা, তার বউ ভাল মানুষ। তারা দেখেন। আর মাসের বাজার তো দ্বিজপদই করে দিয়ে যায়। তখনও তো র‍্যাশনের দোকানে লাইন দেবার দরকার হয়নি! দূরে গেলে সারা মাসের তেল নুন চাল ডাল কিনে দিয়েই যেতো। টাকা হাতে না থাকলে ম্যানেজার বাবুর হাতে ধরে আগাম নিয়ে কিনে কেটে দিতো। আর দলের মধ্যে দ্বিজপদ একেবারে ফ্যালনাও ছিলো না।

এসব কথা পনেরো বিশ বছর আগের কথা। তখনও দ্বিজপদ সোনাগাছি পাড়ার গানের মাষ্টার। দ্বিজু চৌধুরী ওরফে ফতো চৌধুরী নয়।

আমার সঙ্গে কিভাবে দ্বিজপদ চৌধুরীর আলাপ হয়েছিলো, আজ আর মনে নেই। অবশ্য এক আধবার যে তার আগে না দেখেছি তা নয়। তবে আলাপ বলতে যা, তা বোধ হয় আমাদের পাড়ার গানের মাষ্টার সুনীল ব্যানার্জির মারফতে। ঐ যে সুনীলবাবুর ছাত্রী ভারতী মুখার্জি বোম্বে যেয়ে প্রচুর নাম কিনে এলো।

রেডিওতে আগমনী গাইবার প্রোগ্রাম পেয়েছিলো দ্বিজপদ. সুনীল ব্যানার্জি আমাকে স্নেহ করতেন। তাই নিয়ে এলেন আমার কাছে। একটা 'আগমনী'র স্কেচ চাই পল্লীগীতির। কথা আর গান দিয়ে আধঘণ্টার প্রোগ্রাম। কথাগুলো আমাকেই পড়ে দিতে হবে রেডিও ষ্টেশনে। গানগুলো গাইবে কোনটা একক কণ্ঠে কোনটা সমবেত কণ্ঠে। আর্টিষ্ট তার পাড়ার কয়েকটি ললনা। ভদ্রঘরের মধ্যে সুনীল ব্যানার্জির ছাত্রী খেয়া ব্যানার্জি। ছেলেদের মধ্যে একজন দ্বিজপদ চৌধুরী। আর গোটা তিনেক চৌধুরীর ভদ্রপাড়ার শিষ্য। অর্থাৎ সময় অসময় যাদের রেকর্ড কোম্পানী বা রেডিওতে

চান্স করে দেবার নাম করে বেশ দু'পয়সা কামায় দ্বিজপদ। দ্বিজপদ বলতো, কালিদাসের শ্লোক খোঁজ নিয়ে ভ্যাখোগে ভাই, আমার পণ্ডিত মশায় বন্ধুটি কালিদাসের কথায় বলতেন,

সরল কুরল কঙ্কাঃ কাককাদম্বহংসাঃ
অহিনকুল মনুষ্যাঃ কে ন খাদন্তি মৎস্যান্।
অহমতিতনুজীবী ক্ষীণমীনোপভোগী
জগতি বিদিতমেতন্মৎস্যরঙ্গঃ কলঙ্কঃ ॥

'সরল কুরল, কঙ্ক, কাকহংসাদি পক্ষিগণ এবং সর্প, নকুল ও মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে কে না মাছ খায়। কিন্তু আমি ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৎস্যভোজী মাছরাঙ্গা নাম নিয়ে কলঙ্কী হলাম।'

'দ্বিজপদ যোগাড়ে মন্দ নয়। কী করে বিখ্যাত তবলচি তথা ঢোল বাজিয়ে কৃষ্ণকান্তকে বাগিয়েছিলো। দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের এক বাড়ীতেই তখন থাকেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী। কিন্তু রিহার্শেল হবে কোথায়! দ্বিজু চৌধুরীর নায়িকারা ভদ্রপাড়ায় এসে রিহার্শেল দিতে পারবে না (অবশ্য আমার ঘর সম্পর্কেও একবার অস্পষ্ট ইঙ্গিত যে না দিয়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী তা নয়। কিন্তু সুনীল ব্যানার্জির এক ধমকে তা গুবলেট হয়ে গিয়েছিলো।) শেষ পর্যন্ত ব্যানার্জি মশায়ই পথ বাৎলালেন।

বুঝেছো ফতো, আমার ছাত্রী যে গান গাইবে, তুমি তার বাড়ীতে যেয়ে তুলে দেবে। অবশ্য তোমার মতো গুণধর কী টেনে যাবে তাতো জানা নেই, আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো। তোমাকে তো বিশ্বেস নেই মিঞা। আর বাকিদের ব্যবস্থা তুমি করো। তোমার ঐ কমলারাণীকেই ধরে পড় না মকেস। বৈতরিণী পার করে দেবে'খন। তুই না পারিস্ আমার এই ভায়াকে সঙ্গে নিয়ে যাস। তাছাড়া তোর তো অন্য ছাত্রীরাও আছে, তাদের ওখানেও অ্যাটেম্প্ট নিতে পারিস্।

রিহার্শেল দেবার ঘর দ্বিজু চৌধুরী ঠিক করেছিলো আমাকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথম তিনচার দিন ওপাড়ারই এ বাড়ী সে বাড়ী। একদিন ফ্যাসাদ ঘটলো। দলের এক পুরুষ শিল্পীর এক আত্মীয় দাদা প্রবেশ করলেন। সর্বনাশ! কে জানতো সেই বাড়ীতে তাঁরও যাতায়াত ছিলো। বন্ধুটি তো সেই যে পান

কিনে আনার নাম করে ডুব দিলেন, দুঘণ্টার মধ্যে তার দেখা নেই। বাকীরাও এ ছুঁতোয় সে ছুঁতোয় কেটে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত কমলরাণীর ঘর। আর কমলরাণীর সঙ্গে সেই সূত্রেই আমার আলাপ। দ্বিজু চৌধুরীর সঙ্গে কমলরাণীর সম্পর্কটা কী ছিলো, সঠিক আমি অনেকদিন জানতুম না। বাহ্যত কমলরাণী ছিলো আসামের এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের রক্ষিতা। তিনশ' টাকা মাসোয়ারা পেতো। মাসে এক আধবার করে আসতেন ভদ্রলোক। এক আধদিন থাকতেনও। আমিও তাঁকে দেখেছি। উত্তর প্রৌঢ়। মাথার চুলে যতনা পাক ধরেছে, টাকের আক্রমণ তার চেয়ে বেশী। আপাত দৃষ্টিতে গম্ভীর চেহারার লোক। দ্বিজু চৌধুরী কমলরাণীকে গান তুলে দিতো। যদ্দূর দেখতাম দ্বিজুর নিজের গরজেই যেন। তাকে নিয়ে দ্বৈতকণ্ঠে ২।৩ খানা রেকর্ডও ছিলো দ্বিজুর। এ ছাড়া দ্বিজু চৌধুরীর পল্লীগীতির সম্প্রদায়ের মোটামুটি নিয়মিত শিল্পী ছিলো কমলরাণী। বয়স সাতাশ আটাশ। চেহারা পত্র একেবারে আগুন জ্বালানো না হলেও, বেশ ছিমছাম। চটকদার। সাজসজ্জা করলে বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠতো। রীতিমত ভদ্রপাড়ার মেয়েছেলের চেহারা। আর কমলরাণী সাজতে গুজতেও জানতো।

কমলরাণীকে একটু তোয়াজ করেই চলতো দ্বিজু চৌধুরী। তোয়াজ অবশ্য সে ওপাড়ায় প্রায় সবাইকেই করতো। তবু কমলরাণী যতখানি প্রশ্রয় দিতো দ্বিজু চৌধুরীকে, মুখ ঝামটা দিতো তার চেয়ে অনেক বেশী। দ্বিজু চৌধুরী হ্যা, হ্যা করে হাসতো। পা চাটা কুকুরের মত লেজ নাড়তো একটু আদর পেলেই। প্রথম দর্শনে বেশ একটু অহঙ্কারী মনে হতো কমলরাণীকে। নাক আর চোখ টান করে কথা বলতো। বেশ একটা সবজান্তা সবজান্তা ভাব। একটা রাজেন্দ্রাণী রাজেন্দ্রাণী ঢং।

মোট দশ ঘর ভাড়াটে ছিলো কমলরাণী যে বাড়ীতে থাকতো। বাড়ীওয়ালী বুড়ী থাকতো তিনতলায়। কমলরাণী থাকতো একতলায় দেড়খানা ঘর নিয়ে। একতলা হলেও বেশ খট্‌খটে। বেশ সাজানো গোছানো। দুই দেয়ালে দুটো প্রমাণ সাইজ আয়না। বেলজিয়াম গ্লাসের। মেঝের গদিতে বসলে গোটা শরীর দেখা যেতো। এ ছাড়া কয়েকটি বাঁধানো

ছবি, তার একটা ছবি বেশ একটু শালীনতা বিরোধী। এক আলমারী ভর্তি বই (পরে জেনেছিলাম, একটু আধটু পড়াশোনা করতো কমলরাণী)। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, পাশের ছোটঘরটিতে কমলরাণীর ঠাকুর। পরে অবশ্য অনেক বাড়ীতেই ঠাকুর পুজোর ঘটা দেখেছি আমি। কমলরাণীকেও দেখেছি। ভদ্রঘরের পুজো আচার মতোই। তেমনি সংযম। আত্মনিবেদন। কে বলবে এরা মোহিণী, কে বলবে এরা বাঘিণী। ব্যানার্জি আমার কাছ থেকে একটা ভজন লিখিয়ে নিয়েছিলো একবার। একদিন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তার এক প্রথম অঙ্কশায়িণীর কাছে। মেয়েটির তখন বয়স হয়েছে। ব্যানার্জি নাকি তার ওলাইনের প্রথম পুরুষ। ঠাকুর ঘর থেকে মেয়েটি ব্যানার্জির কথায়, সেই গানটি শুনিয়েছিলো। এমন মধুক্ষরা গলা, এমন জীবন্ত আত্মসমর্পণ আমি দীর্ঘদিন শুনিনি।

ব্যানার্জি গর্বিত মুখে বলেছিলো, কার ট্রেনিং আর কার দ্রব্যি দেখো ভায়া।

মেয়েটি নম্র স্মিতহাসি হেসেছিলো।

কমলরাণীর ওখানে রিহার্শেলের ব্যবস্থা করতে দ্বিজু চৌধুরী আমাকেই ধরেছিলো। বলেছিলো, আমি বললে হয়তো রাজী হবে না। তেড়ে মারতে আসবে। তবে কবি লেখকদের ও-খুব শ্রদ্ধা করে। অন্য বাড়ীতে সব সময় সুবিধে হবে না। বিশেষ করে সকালের দিকে। বিকেল রাত্রের তো কথাই নেই। কার বাবু কখন আসবে তার ঠিক নেই। পাঁচ জন নিয়ে কারবার। সব বাবু আবার এসব পছন্দও করে না। বাবু ছাড়া যারা, তাদের তো সকাল মানে বারোটা। প্রোগ্রামের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। কমল রাণীর ওসব বালাই নেই। ওর বাবু চাকরী করেন সেই আসামে। আসুক না আসুক, মাস গেলে তিনশ' করে কড়কড়ে টাকা ডাকে আসবেই।

বলেছিলাম, আসাম থেকে কোলকাতায়! কেন আসামে কি আর বস্তু মিলে না চৌধুরী! প্রাণের টান দেখি একনিষ্ঠ স্বামী দেবতাদের মতো হে।

চৌধুরী বলেছিলো, সেই পদ্যটি জানোনা, যারে দেখে মজে মন, কিবা হাড়ি, কিবা ডোম। আসলে ভদ্রলোকের বাড়ী ব্যারাকপুরে। আগে বাংলা

দেশেই চাকরী করতেন। বউ নেই। ছেলে পুলে আছে। ছেলেরাও লায়েক। একজন বুঝি কোন কলেজের প্রফেসর। বাড়ীতে যখন আসেন, তাও রাতের বেলা এখানে আসেন না। আসেন দিনের বেলা। বাড়ীতে একেবারে নাকি গুড্ বয়। পুজা পার্বন সন্ধ্যা আহ্নিকের বাড়াবাড়ি। সাধু সন্নেসীর ছড়াছড়ি। কিন্তু দুপুর বেলা ঠিক আসা চাই। আর ওসময় ঘরে অন্য কেউ থাকলে একেবারে ফায়ার।

—কেন, কেন ?

—কী যে বল, খোকা! তিনশ' টাকা মাসোহারা দেবে, যা নাকি তুমি চাকরী করে এখনও কামাতে পারনা, আবার ভাগীদার থাকবে এটা কেউ সহ্য করতে পারে নাকি ? রক্ষিতা তো সেজন্যেই !

—কিন্তু লুকিয়ে ছাপিয়ে ওরা যদি লোক বসায় !

—অনেকেই বসায় না। তবে যাদের টাকার লোভ বেশী, শরীরের ক্ষিদে বেশী, চিত্ত বিকৃতি বেশী তারা বসায়। অনুরোধ উপরোধে, আগের বাবুর অনুরাগে, বা বাঁধাবাবু আজ আসবেন না এই দুঃসাহসে ভর করে কেউ কেউ লোক বসায়। গান বাজনা ফুর্তিটুর্তি করে। মদ খেয়ে হৈ হুল্লোড় করে।

—ধরা পড়ে না ?

—অতি সাবধানী, আগপাছ ভেবে চিন্তে যারা করে তারা ধরা পড়ে না। কিন্তু দশদিন করতে করতে সাহস বাড়ে। বেপরোয়া ভাব আসে। আর জানইতো দশদিন চোরের একদিন বাবুর। সাধু কথাটা আর বললাম না। এই তো কিছুদিন আগে কমলরাণীদেরই দোতলায় একটি আধবয়সী মেয়েমানুষ ছিলো এক মাড়োয়ারী বাবুর বাঁধা। প্রতি হপ্তায় দিন তিনেক আসতো। সোম, বুধ, শুক্রবার। একবছরে বারের নড়চড় হয়নি। সেই ভরসায় বেশী টাকার লোভে লোক বসিয়েছে। আর আসবি তো আয়, ঠিক সেই সময়েই পেয়ারের বাবু এসে হাজির। এক হাতে একগাছা মোটা বেতের লাঠি। কানপুর না কোথায় পাওয়া যায়। কানপুরি সরষের তেলই বের করেছিলো দুজন সুদ্ধ পিটিয়ে। চুক্তিতে নাকি ছিলো, তার অজ্ঞাতে বা অসম্মতিতে কোন লোক বসাতে পারবে না। এমন কি বাবু ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটারে পর্যন্ত যেতে পারবে না।

বলেছিলাম, বলো কি চৌধুরী। এরা যদি এতো সতী লক্ষ্মীই চায়, তবে ঘরের স্ত্রী ছেড়ে এ পাড়ায় আসে কেন ?

চৌধুরী বলেছিলো, ঐ তো মজা। দলে পড়ে আসে, স্বেচ্ছায় আসে। নতুনত্ব পাবার লোভে আসে। বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে আসে। ঘরের লক্ষ্মীরা কি সব সময় এসব প্রশ্রয় দেয় ! আর এ ব্যাপারে মহাকবি কালিদাস থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অনেকের নাম পাবে। কীর্তি কাহিনী পাবে। সে আর একদিন শোনাবো' খন। এবার চলো দেখি ভায়া, কমলমুখী কমলরাণীকে একটু পটিয়ে দেবে চাঁদ। ক'দিন থেকে আমার সঙ্গে টার্মটা ভালো যাচ্ছে না। ইমামবক্স লেনের ছোটরাণীকে নিয়ে সিনেমায় নাকি যেতে দেখেচে কবে। আর বলো না বাবু, যেখানেই মেয়ে মানুষ সেখানেই জেলাসী। তা তোমার গৃহবধূই হোক, আর জনপদবধূই হোক।

কমলরাণী রাজী হয়েছিলো। কিন্তু ঐ সঙ্গে বলেছিলো, দ্যাখো বাপু, ঘরটর নোংরা করা চলবে না পাস সিগারেট দিয়ে। আর তোমার দলে গান গাওয়াও পোষাবে না আমার।

দ্বিজু চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বশংবদ হয়ে হাত কচলে বলেছিলো, তাহলে প্রোগ্রামই করবোনা আমি। আর যে ডুয়েট রেকর্ডটা আগামী মাসে করবো তাও বাদ দেবো।

মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিলো কমলরাণী, প্রোগ্রাম বাদ দেবে তুমি ! একটা পয়সা যার কাছে ফাদার মাদার। প্রোগ্রাম বাদ দিলে ধেনোর পয়সা জুটবে কোত্থেকে। আর এই প্রোগ্রামের টাকার বরাৎ দেখিয়ে যাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছো তারা তুলোধুনো করতে ছাড়বে না তোমায় !

—কেন, তুমি দেবে !

দ্বিজু চৌধুরী চোখে মুখে প্রেম প্রকাশ করে বলেছিলো।

—ঝাঁটা মারো অমন মুখে। কোথাকার আমার সোহাগের ইয়ে এসেচেরে। পয়সা তো আমার গাছ থেকে পড়ে কিনা ! গতর জলকরা পয়সা, তোমার মতো লোচ্চার জন্য দিতে পিরীতে পরাণ কাঁদচে কিনা আমার !

আমার সামনেই বলেছিলো কমলরাণী। একটু দ্বিধাসঙ্কোচ করেনি। দ্বিজু চৌধুরী পরে বলেছিলো, অত সাধু ভাষায় কথা বলেনা কমলরাণী, বুঝলে ভায়া। তার ভাষা কিতাব বহির্ভূত ভাষা। একমাত্র এপাড়ার শব্দভাণ্ডারের নিজস্ব। ওটুকু যে ভদ্রতা করেছে, সে শুধু তোমাকে দেখে।

ঝগড়া একটু নরম পড়লে, দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, আহা, একজন ভদ্র-লোক এলেন, তাকে একটু চা-টা খাওয়াও। নাকি কেবল ঝগড়াই করবে।

কমলরাণীর এতক্ষণে যেন আমাকে খুঁটিয়ে দেখার সময় হলো। একটু দ্বিধাগ্রস্ত, হয়তো বা একটু লজ্জিতই হলো।

ফাঁক পেয়ে দ্বিজু চৌধুরী একটু গর্বের সঙ্গে বললো (অর্থাৎ তার সঙ্গে যারা আসে তারা একেবারে হেজিপেজি নয়), এর লেখা 'আগমনীই' তো করছি এবার। সাংঘাতিক গুণী লোক। বাজারে বেশ কয়েকখানা নাটক নভেল আছে (ভগবান জানেন তখনও একখানা বইও বেরুয়নি আমার)। একটা বইতো সিনেমায়ই উঠবে শীগগির (কোন্ ফতু কোম্পানী তুলবে তা অবশ্য বলেনি দ্বিজু চৌধুরী)।

কমলরাণী ঘোমটাটা একটুখানি টেনে হেসে বললো, তা তোমার বন্ধু যখন, তুমিই তো সে সব ব্যবস্থা করবে। ভাগ্যি ভালো এমন লোকের পায়ের ধূলো পড়লো আমার ঘরে। তা সিনেমায় একটা চান্স না হয় করে দিও তোমার বন্ধুকে বলে।

বলেই কমলরাণী ঝিকে ডাকলে। ডেকে বললে, বাবুর জন্যে চা সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়। অন্য ভালো জিনিস তো এ পাড়ায় পাবিনে।

দ্রুতকণ্ঠে বললাম, না, না চা আমি খেয়ে এসেচি। এখন খাবো না। কমলরাণী চোখে মুখের একটা অপূর্ব ভাব করে বললো, খেয়ে এলে বুঝি খেতে নেই! এ লাইনে নয়া আদমী বুঝি। বেশতো আগে স্বরসন্ধি ব্যাঞ্জনসন্ধি আসুক, তখন কত কিছু খেতে হবে।

হঠাৎ ভ্রূকুঁচকে বললো, কিন্তু এটা আবার দেবদাসের ঢং নয়তো! ঐ যে ঘৃণাও আছে আবার প্রেম করতে বাধা নেই ভাব। দেখবেন আবার গোঁসা করে একশ' টাকার নোট ফেলে যাবেন না যেন। আমি আবার বাপু চন্দ্রমুখী নই।

লজ্জিত কণ্ঠে বললাম, কী যে বলেন!

কমলরাণী বললো, তবু ভাল, আপনি, আজ্ঞে দিয়ে স্বরু করেছেন। অনেকদিন শুনিনিতো, বেশ লাগচে। পাড়াটা অবশ্যি আপনাদের মতো লোকের কাছে নোংরাই। তবে চায়ের কাপগুলো কিন্তু ফ্রেস। এখনও বাক্স থেকে বের করা হয়নি।

বললাম, না, না ঘৃণা করবো কেন?

—বেশ যীশু যীশু লাগছে তো! আহা পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। ঝাঁটা মারো। পাপ আর পাপী যেন ভিন্ন। এ যেন রজকিণী প্রেম নিকষিত হেম আর কি। সোনার পাথর বাটি।

মনে মনে ভাবলাম, সাংঘাতিক মেয়ে তো। মুখে বললাম, না, না যীশু টিশু নয়। আর ঘৃণা করলে এখানে আসবো কেন?

—কেন আমাদের মতো অভাগিণীদের উদ্ধার করতে! অনেকে পতিত উদ্ধার করতে আসেতো! এখানে আসে। নোংরা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে আসে। শুচিবাইগ্রস্ত বিধবারা যেমন গঙ্গা চান করে এঁটো কাঁটা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ঘরে ফিরে। তা বাড়ী যেয়ে না হয় চান করেই ফেলবেন।

—তা চান করে ঘরে ঢুকবো কেন?

—প্রথম প্রথম করে। আমাদের বিছানা পত্র, চৌকি, চেয়ার সব কিছুতেই খারাপ রোগ আছে বলে অনেকেই মনে করে কিনা! তা প্রথম প্রথম আমাদের ঘৃণা অনেকেই করে। ভয়ও করে। পরে আমরাই ঘৃণা করি। অনেক সময় ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চলে যাই। দুচারদিন আসুন, দেখবেন কেমন সরগর হয়ে গেছে।

বললাম, তাই নাকি? কিন্তু সবাই এক রকম নাও হতে পারে তো! বিজু চৌধুরী এতক্ষণ মৌজ করে একটা সিগারেট টানছিলো। সম্ভবতঃ আমাদের কথা উপভোগ করছিলো। উৎসাহ দিয়ে বললো, সত্যিই তো। বেশ ভায়া, বেশ চালিয়ে যাও। বেশ একটা ভালো দরের 'ডিবেট' বলে মনে হচ্ছে।

কমলরাণী কী ভেবে একটু চুপ করে থেকে বললো, সবাই এরকম কিনা জানিনে, তবে আপনার ভবিষ্যৎ যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এমন তো

কত দেখলাম এ বয়সে। শুনুন তবে, প্রথম দিনই এসব বলতে হবে ভাবিনি। তবে যখন আমার ঘরে চা না খেয়ে আমাকে অপমানটাই করলেন, তবে শুনুন। আমি তখন কারো বাঁধা নই। দু টাকায় লোক বসাই। গলিতে রঙ মেখে আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে বসে থাকি। শুনিয়ে শুনিয়ে সুযোগ বুঝে রসের কথা কই। সস্তা দামের সিগারেট কাড়াকাড়ি করে খাই।

দ্বিজু বলে ওঠে, বিড়ি টাননিতো গো! দু'টাকায় বিড়ির বেশী পোষাত!

কমলরাণী ফুঁসে উঠে বলে, ঝাঁটা মারো মিনসের মুখে। এক নাগর নিয়ে রাত কাটতো নাকি! তেমন তেমন বরাত হলে পাঁচ সাত দশটা বসাতে কি বাধা!

দ্বিজু টেবিল চাপড়ে বলে, সাবাস সাবাস। স্বয়ং দ্রৌপদী ঠাকরুণও এমন সাহসিকা ছিলেন না। নাও, তারপর বল।

আমি অবাক বিস্ময়ে এই নির্লজ্জার দিকে তাকাতে যেয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

কমলরাণী কোপকটাক্ষে চেয়ে আরম্ভ করে, আহা লজ্জা পাবেন না। এখানে কি তবে ভাগবত পাঠ শুনতে এসেচেন নাকি। কেমন লোকগো তোমার বন্ধু! শুনুন তারপর, লোকের চলাচলতি রকম সকম দেখলেই বুঝি কে খদ্দের, কে নয়। কার আগ্রহ আছে অথচ কে উদাসীন। কত উদাসীন। কত সাধু পুরুষই তো যায় গলি দিয়ে। তিলক কাটা বোষ্টম বাবাজী থেকে কত উঁচুতলার লোক। গম্ভীর ভাবে যেতে যেতে 'দেখিনা দেখিনা' করেও এক পলক তাকিয়ে যায় নিস্পৃহ দৃষ্টিতে। এক পলকেই বুঝি কার চোখ চক চক করে ওঠে। কিন্তু সবাই আসেনা। ক্ষিদে পেলেও ক্ষিদে চেপে থাকে তো অনেকে। তার মধ্যে যারা নবীশ, তিনচার দিন হাঁটাহাঁটি করে, সাহস সঞ্চয় করে, একদিন হঠাৎ মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ে। দরদস্তুর করার সময়ও থাকেনা তাদের, পাছে কারও নজরে পড়ে যায়। রাতের বেলা এই পথ দিয়েই অনেকে সর্টকাট করে তো! একদিন এক ছোকরা এলো। কত হবে আর বয়স, বড় জোর ষোল সতেরো। দেখতে শুনতেও ভালো। একেবারে আনকোরা ব্রিদ্য এ লাইনে। এদের ঠকানো সোজা। পাঁচ টাকায় রফা করে ঘরে এলুম। বলে কিনা এক ঘণ্টা থাকবে। মনে মনে

হাসলাম। পাঁচ মিনিটে খদ্দের বিদেয় করার কায়দা কানুন শিখে গেছি তখন।

বাড়ীওয়ালী দেখে বললে, ওমা এ যে নাক টিপলে দুধ বেরুয়রে ছুঁড়ি! তা ঝিনুক বাটী পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুধের ব্যবস্থা তুই করে দিস্। নাকি বোতলই পাঠাবো একটা। বলি মাল কড়ি কিছু আছে-টাছে না ফতো কাপ্তান!

এতক্ষণ তবু সাহস ছিলো ছোকরার। কিন্তু দরজা বন্ধ করে গায়ের জামা খুলতেই, বলবো কি লেখক মশায়, বললে বিশ্বেস করবেন না, কাপড়টাও ছাড়িনি তখনও, ভেউ ভেউ করে সে কি কান্না। বলে কিনা, আমাকে যেতে দিন, আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আমার দিদির মতো!

মর, ড্যাকরা, দিদির মতো তো এখানে মরতে এলে কেন খোকা! বাড়ীতে বসে চুষনি কাঠি চুষলেই হতো!

দ্বিজু চৌধুরী বললো, মাইরী কমলি বিবি, আমি যদি খোকা হতাম? মারো শালা পাছায় লাথি। তা খোকা কি করলো ডারলিং?

—আর খোকা! তখন তো খোকার পায়ে ধরা বাকি। শেষে পকেটে যা ছিলো দশ পনেরো টাকা (কে জানে বাপের বাক্স ভাঙা টাকা কিনা) সব উবুড় করে দিয়ে দরজা খুলে দৌড়। পেছন থেকে কত ডাকলুম, ও আমার বাবা-কেলে ভাই, তোমার টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু কে কার কথা শোনে। মনে হয় নতুন রাস্তায় না পৌঁছে আর থামেনি।

বাড়ীউলী সব শুনে বললে, তোর যত আদিখ্যাতা কমলি। টাকা লক্ষ্মী। ওকি ডেকে ফেরৎ দেবার। ওতে মা লক্ষ্মী গোঁসা করে জানিস্‌নে। তোর নিতে মন না চায়, আমার কাছে থাক। মাসীকে কমিশন দিতে হয়। আর এতো উপরিই বাছা।

কৌতূহলী কণ্ঠে বললাম, তারপর আর আসেনি ছোকরা?

কমলরাণী হেসে বললো, আসেনি আবার! এখন তো সে একজন নাম করা মস্তান। তবে এখন আর দশ বিশটাকা দেয় না। আর উঁচু তলায়ও আসেনা। এখন নাকি বস্তি-টস্তিতেই যায়। পাঁচসাত বছর আগেও এপাড়ায় যাতায়াত ছিলো। একবার কাকে ছুরী মেরে যেন একবছর না দুবছর জেলও খেটেছে।

দ্বিজু চৌধুরী চুকলি কেটে বললো, হুঁ, একেবারে ঠিকুজি কুষ্ঠি দৈনন্দিন কার্যসূচী পর্যন্ত মুখস্থ। আহ-হা, প্রথম প্রেম।

কমলরাণী মুখ ভেংচে বলে ওঠে, ঝাঁটা মারো অমন প্রেমের! প্রেম না হাতি!

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, না, তোমাদের মতো লেখাপড়া শিখিনি ভায়া, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। ভালভাবেই পাশ করেছিলাম। মাষ্টার মশাইরা বলতেন, ছাত্র হিসেবে নাকি একেবারে খারাপ ছিলাম না। আর ছোটবেলা থেকেই গান বাজনার গলাও একেবারে মন্দ ছিলোনা। কিন্তু জানইতো তখনকার দিনে গান বাজনা করতো কারা। আর যারা ঐ নিয়ে থাকতো তারা বখাটে ছেলে বলে মার্কা মারা হতো। আমাদের দেখলে বাড়ীর কর্তারা মেয়েদের ভেতর বাড়ী চলে যেতে বলতেন, এমন ছিলো আমাদের দলের সুনাম। আর সত্যি বলতে কি, খুব যে ভাল ছেলে ছিলাম তাও তো নয়। যত সব বখা বন্ধুদের সঙ্গে গলাগলি। এখানে সেখানে চলাচলি। কোথায় কোন যাত্রার দলরে, কোথায় বাড়ী পালিয়ে রাত জেগে হৈ হুল্লোড়রে, এ সবই করতাম। পাড়ার সঙ্গীদের নিয়ে নতুনশোনা যাত্রার দলের বইয়ের অনুকরণে যাত্রা, থিয়েটার করতাম। দু পাঁচদিন বাড়ী থেকে ডুব দিয়ে যাত্রার দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম।

বাড়ীর কাছে এক জঙ্গল ছিলো। রীতিমত অরণ্য। দিনের বেলা তার মধ্যে ঢুকতে অনেকের ভয় করতো। সাপ, ভালুকের আড্ডা। বাঘও নাকি শীতকালে কোন কোন সময় আগমন করতো। তার মধ্যে অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে আড্ডা জমাতাম। থিয়েটারের রিহার্শেল দিতাম। পাড়ায় পাড়ায় এখানকার মতো থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতো ছিলোনা! থাকলেও আমাদের গণনার মধ্যে ধরা হতোনা। কাচা-মিঠে আমের লোভ দেখিয়ে রাখিয়ে রাণীর পার্ট, নায়িকার পার্ট করার জন্য দুঃসাহসিনী দু'একজন বাল্য-সঙ্গিনীও যোগাড় করতাম অতি গোপনে। কাক কোকিলে টের না পায় এমনিভাবে। কাক কোকিলে টের না পেলে কি হয়, কোন কোন সময় মেয়ের বাবা, দাদা, দিদিমা, ঠাকুরমা, কৌতুহলী প্রতিবেশীরা টের পেতেন। আমাদের অভিভাবকদের কাছে নালিশ যেতো। আমরাও টের পেতাম।

তবে পিঠে। হাতে পায়ের গিঠে গিঠে। তারপরে বাপরে মারে, সে কি মার। বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া মার। হাড় একখানে, মাংস একখানে করা মার। মেয়েরা, কাচামিঠে আমখাওয়া বাল্য সঙ্গিনীরাও সঙ্গীণ হয়ে দেখা দিতো। বিশ্বাসহন্ত্রী হয়ে বলে দিতো। সত্যিও বলতো, নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য মিথ্যেও বলতো। চাপে পড়েও সত্যমিথ্যা রচনা করতো: কখন কাকে অভিনয়ের ফাঁকে বেশী জড়িয়ে ধরেছি (ভগবান জানেন, ইংরেজী বইতো দূরের কথা, বাংলা সিনেমার বইও পাড়াগাঁয়ে যায়নি), কাকে কী ইঙ্গিত করেছি ; কাকে না পেলে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, এইসব হৃদয় বিদারক কথা বলেছি এইসব। মরুভূমিই করে তুলতেন অভিভাবক মশাইরা মারের চোটে।

এমনি করে তো ম্যাট্রিক পাশ করা গেলো। কলেজেও ভর্তি হলাম কিন্তু রক্তে যদি একবার বখা হবার বান ডাকে, তাহলে কি আর জাতকুল থাকে! বাঁশী শোনালেন কোলকাতার এক মস্তান মামা। কোলকাতার যমুনা পুলিনে যদি একবার বাঁশী বাজাতে পারি তাহলে নাকি গোপিণী দূরের কথা, চাই কি মথুরার রাজা হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য নয়। নতুন কেনা কলেজের বই পত্তর গোপনে বেচে দিয়ে, সেই মস্তান পাড়াতুত মামার কাছে দীক্ষা নিয়ে দেশ ছাড়লাম। শুনেছিলাম আমার মতো পুত্রের জন্যও নাকি আমার মাতাঠাকুরাণী কেঁদেছিলেন। তখন আমি কোলকাতায় আদাড়ে পাদাড়ে রং দেখে বেড়াচ্ছি। না, মস্তান মামা দীক্ষা দিয়ে, গুরুদক্ষিণা নিয়ে আগেই শিষ্যকে ত্যাগ করেছিলেন। তারপর কত লাথি ঝাঁটা খেয়ে, এ পাড়া সে পাড়া করে, অবশেষে যাত্রার দলের সঙ্গীত পরিচালক সুধা কণ্ঠ শ্রীশ্রীদ্বিজপদ চৌধুরী। আড়ালে প্রকাশ্যে যার আর এক নাম ফতো চৌধুরী। পরের পয়সায় যে নাইট্রিক এসিড্ পর্যন্ত খেতে পারে। এক পয়সা ধার নিলে একবছরে যে চিৎ হস্ত উপুর করে না। তবু, না, সুখও এসেছে বৈকি; ঝিলিক মেরে গেছে দুঃখের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু ঐ যে সেই বিখ্যাত অভিনেতার অমর বাণী, 'সুখ আমার সয়না।'

মাঝে মাঝে দু পাঁচজন পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যেও যে না এসেচি তা নয়। কিছু পড়াশোনা করারও সুযোগ পেয়েছি কিন্তু তোমাদের তথাকথিত ভদ্র-

সমাজে ফেরার পথে কাঁটা পড়েছে। রাজটীকা দেখে নাকি রাজভাগ্য চেনা যায়। আমাদের বেশ্যাবাড়ীর দালালদের কপালে বোধহয় ঐরকমেই কিছু আছে হে। বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাদের মুখ দেখলেই চিনতে পারে। তবে আমরাও আমাদের এই নতুন সমাজ নিয়ে ভালমন্দ, লাঠি ছুরি, মিথ্যা প্রণয়, রোগ শোক ছলনা, ব্যাভিচার নিয়ে সুখেই আছি বলতে গেলে। জেল ঘুঘুরা যেমন জেলের মধ্যেই স্বস্তিতে থাকে, ছাড়া পেলে জলের মাছের ডাঙ্গায় বাসের মতো মনে হয়, আমরাও ক্লেদাক্ত, অবজ্ঞাত অন্তজদের মধ্যে থাকতে ভালবাসি।

না, কমলরাণীর ওখানে চা আমি খেয়েছি। তবে তখন নয়, অনেকদিন পর। নতুন কেনা গেলাসেই খেয়েছিলাম। তাও আবার দোকানের চা নয়। কমলরাণী নিজে ইলেকট্রিক হিটারে নতুন কেটলিতে চায়ের জল ফুটিয়ে দিয়েছিলো। নিজের হাতে জলখাবার তৈরী করে দিয়েছিলো।

তারপর খাবার প্লেট ও চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলেছিলো, কী দাদা, এবারও ঘৃণা করবেন নাকি?

কমলরাণী আমাকে দাদাবলা আরম্ভ করেছিলো। বলতো, দাদা ছাড়া অন্য কিছু বলা তো ঠিক হবে না। তবে বন্ধু-দাদা। নইলে যা আমাদের মুখ, মনে কিছু করবেন না যেন, তা বলে রাখছি।

কমলরাণীর চা জলখাবারের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলাম, না, না, কী যে বল।

কমলরাণী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলো, সত্যি বলছেন!

বলেছিলাম, সত্যি নাতো মিথ্যে নাকি! সত্যি বলতে কি, বিশ্বেস করবে কিনা জানিনে, ছোটবেলা থেকেই তোমাদের সম্পর্কে যে সংস্কারটি মনে বাসা বেঁধে ছিলো তা হলো, এখানে যারা আসে তারা অধিকাংশই রোগ নিয়ে সমাজে ফিরে। সমাজকে কলুষিত করে। তোমাদের মধ্যে সবাই যে শরৎ চাটুয্যের সাবিত্রী, কি আঁধারের আলোর বিজলী বিবি বা দেবদাসের চন্দ্রমুখী নও, এ ধারণাটাও ছিলো। তবে ঘৃণা বলতে যা বোঝায় তা দাদা

বেঁধে ওঠেনি কোনদিন। প্রয়োজনও হয়নি। দ্বিজু চৌধুরীর সঙ্গে এখানে এসে তোমাদের নতুন করে দেখলাম।

কমলরাণী বললো, এই ক'দিনেই কী দেখবেন?

—যতটুকু দেখলাম। রুশ দেশের বারবণিতাদের নিয়ে লেখা 'য়্যামা দি পিট,' বইটা পড়লাম একদিন। পঁচিশ লক্ষের উপর বইটি বিক্রী হয়েছে। বারবণিতাদের একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে দেখলাম। এখানে এসে এই ক'দিনে দেখলাম, তোমাদেরও নিজস্ব একটা সমাজ আছে। তার ভালমন্দ আছে। ভাব-ভালবাসা ঈর্ষা, প্রতিহিংসা আছে, ঠিক যেমন যেমনটি উঁচুতলার সমাজেও দেখা যায়। সেদিন তোমাদের দুই ভাড়াটের, কী নাম যেন চঞ্চলা আর নইনীর ঝগড়া দেখলাম, যেমন করে মা মাসী তুলে গালাগাল শুনলাম, যে সামান্য কারণে তা ঘটলো, আমাদের পল্লীতে কলের জল নিয়ে দুই ভাড়াটের ঝগড়ার সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই গালাগালের রকমফের ছাড়া।

কমলরাণী বললেন, ওমা, আপনি বুঝি ঐ দুই ইয়ের নেত্য ও 'স'-কার ব-কার শুনেছেন। ও দুই মাগী ঝগড়ায় নামলে তো কাক পক্ষীটি পর্যন্ত বসতে পারে না বাড়ীতে। সে চুলোচুলি থামাতে দমকল ডাকতে হয়। যদি জলের তোড়ে মাগীরা ঠাণ্ডা হয়।

দ্বিজু চৌধুরী পরে বলেছিলো, আরে ভায়া ও-দুটো যে সতীন। বাড়ীওয়ালীর পিরীতের ইয়ে দুজনেই। চমকে ওঠো না ভায়া, অস্কার ওয়াইল্ড, বিটোফেনদের মতো এদেশেও স্যাডিষ্টের সংখ্যা কম নেই। আর ও পাড়ায় এসব নতুন নয়। ফ্রান্সে শুনেছি পুরুষ বেবুশ্যে আছে। আহা-হা, আমাদের দেশে যদি তেমন ব্যবস্থা থাকতো ভায়া!

কমলমণিকে বলেছিলাম, তোমাদের শুধু ঝগড়াই দেখিনি, ভাব ভালবাসা, সুন্দর রসজ্ঞান রসিকতাবোধ সবই দেখেছি। হয়তো একটু ভালগার, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সেদিন শুনলাম তোমাদের ও পাশের ঘরের মেয়েটি এক নাগরকে কালিদাস থেকে বলচে,

পৃথ্বী তাবত্রিকোণা বিপিননদনদী গ্রাবরুদ্ধং তদর্দ্ধং
তত্রাপ্যর্দ্ধং যুবানঃ শিশুগতবয়সো যোগিনো রোগিণশ্চ।

মান্যাস্তত্রাপি কেচিৎ শ্বশুরগুরুজনাঃ শেষভূতা কিয়ন্তো
মিথ্যাবাদো মমায়ং মুখরমুখরৈঃ পুংশ্চলী পুংশ্চলীতি॥

কমলরাণী হেসে উঠে বললো, সর্বনাশ, আপনি কি এমনি শ্লোক মেয়েদের শুনিয়ে বেড়ান নাকি ? আমি তো একেবারে গোমুখ্যো। ব্যাখ্যা করে দিন। লজ্জিত হয়ে বললাম, বাংলা করলে দাঁড়ায় এই পৃথিবীটা একটু ত্রিকোণ বিশেষ।

এর অর্ধেক নদ নদী বন পর্বত দিয়ে ভরা। লোকদের অর্ধেক পুরুষ, আবার তার অর্দ্ধেক বালক, যোগী, রোগী। বাকীদের মধ্যে মান্য-ব্যক্তি শ্বশুরাদি গুরুজন, এরপর বাকী ক'জন পুরুষ থাকে যে তাদের চাই। তবে কেন সব লোক মিথ্যা করে বলে, আমি বেশ্যা।

কমলরাণী বললো, বা সুন্দর সাফাই তো! শ্লোকটা শিখে নিতে হবে তো নতুনদির কাছ থেকে!

বললাম, নতুনদি মানে ?

—কেন আমাদের বুঝি নতুনদি, রাঙাদি, কালোদি নেই!

—না, না, তা থাকবে না কেন!

কমলরাণী হাসলো। বললো, মাস ছয়েক এসেছেন। ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। ভদ্রঘরের বউ। স্বামী শ্বশুর সব ছিলো। লেখাপড়া জানা বিদ্বান স্বামী। হলে কি হবে, বিদ্যের দৌড়, 'তোমার বুকে কি ফোড়া হয়েছে! কালকেই ডাক্তার ডাকতে হবে তো' গোছের। ক'দিন আর এই ন্যাকামি বা ছেলেমানুষী সহ্য করবে বউটা। স্বামী রইলো বই নিয়ে, বউ ওদিকে হাতছাড়া। কোন সুবাদের ঠাকুরপো দুবেলা স্তবস্তুতি করতো কিনা। আরও মাথা ঘুরে গেলো। তারপর অর্থ, সম্মানের মাথায় পদাঘাত করে সোজা কোলকাতা। একটা ছেলে হবার পর, ঠাকুরপোর স্তবস্তুতি শঙ্কর মাছের চাবুকে এসে নামলো। তারপর একদিন দিশে না পেয়ে, হাতের কাছের ফুলদানী দিয়ে ঠাকুরপোর মাথা তিন ইঞ্চি ফাঁক করে দিয়ে কেটে পড়লো। দু এক জায়গায় চাকরীর চেষ্টা যে না করেছিলেন তা নয়। কিন্তু রাহু পেছনেই লেগে রইলো। তারপর নামতে নামতে এই আঘাটায়। তবে হ্যাঁ, রুচি আছে নতুনদির। যাকে তাকে ঘরে বসায় না। জ্ঞানে শোনেও

বেশ। আহা, এমন মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারলেনা গো! অমন স্বামীর মুখে ঝাঁটা মারি। ঝাঁটা মারি।

বললাম, সত্যি তোমাদের কথা ভাবলে একটা বেদনা বোধ করি।

কমলরাণী কী যেন একটু ভেবে নিলো, তারপর বললো, আমার এখানে এক অধ্যাপক আসতেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিলো। প্রতিপত্তিও ছিলো। ইলেক্‌শনে দাঁড়িয়েও ছিলেন। আসতেন। কেন আসতেন বুঝতাম না। আর পাঁচজন যেজন্যে আসতো সেজন্যে নয়। বলতেন, কথা বলতে এলাম তোমার সঙ্গে। কেমন যেন সমীহ করতাম। সমীহ করার মতো চেহারাও। কিন্তু কী অমায়িক ব্যবহার। নতুনদি হলে কী বলতেন জানেন!

হেসে বললাম,

"কুস্ত্রী সজ্জন সঙ্গমে ন রমতে নীচং জনং সেবতে
যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাব জনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে॥"

কমলরাণী বললো, বেশ্যা কখনও সজ্জন ব্যক্তির সহবাসে আনন্দ লাভ করে না। যার যা স্বাভাবিক প্রকৃতি, সে কোন সময় তা ত্যাগ করতে পারে না।

কিন্তু না, আমার বিরক্ত লাগতো না। ভয় হতো কখন তার অমর্যাদা করে ফেলি। কে আবার না অমর্যাদা করে ফেলে। নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ভদ্রলোক আসতেন, গল্প করতেন। বড়জোর একটু আদর করতেন। তারমধ্যে কামনার চেয়ে স্নেহের স্পর্শই বেশী পেতাম।

বললাম, বলকি? একেবারে প্রোফেট।

কমলমণি বললো, এই ব্যবসায়ে নেমে কত ধরণের লোকই যে দেখলাম দাদা। পান থেকে চুণ খসলে, বায়নাক্কা না মেটালে লাথিও কম খাইনি। কপাল ফেটে রক্তারক্তি হয়েছে কতবার। নিজেও বদলা নেইনি তাও নয়। কিন্তু পথ চলতে চলতে এমন সব দু'একজন ঐ আপনার প্রোফেট এরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধ্যাপক বলতেন, বেশ্যাবৃত্তি একটা ঐতিহ্য সম্পন্ন বৃত্তি। দেব সমাজেও নাকি বেশ্যার স্থান নগণ্য নয়। বেশ্যা কন্যারা রাজরাণীও হয়েছে। শকুন্তলার কথা বলতেন তিনি। বলতেন, দেব সমাজে শুধু নয় পৃথিবীতে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

বললাম, তা আছে। নর্তকী হিসেবেই যে তাদের নাম ছিলো তা নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাদের দান অপরিসীম ছিলো।

কমলমণি বললো, হ্যাঁ, এসব কথাও বলতেন অধ্যাপক।

পথে আসতে আসতে কমলরাণীর অধ্যাপকের কথাই ভাবতে ভাবতে এলাম।

যখন স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের কোন বিপদ উপস্থিত হতো, উর্বশী রম্ভা মেনকার আশ্রয় নিতেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করছেন, কে জানে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য কিনা। চঞ্চল ইন্দ্র তার কেবিনেট মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে পরামর্শ সভা বসলো। স্থির হলো মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। তপস্যার ফল নষ্ট করতে হবে। অন্যমনস্ক বিভ্রান্ত করতে হবে ঋষিকে। ভয়ও আছে। দুর্বাসার পরই ক্রোধী ঋষি বিশ্বামিত্র। তপস্যার বলে ক্ষত্রিয় নন্দন হয়েও ব্রহ্মর্ষি।

ঠিক হলো স্বর্গ নটী মেনকা সুন্দরীকে পাঠান হোক। উর্বশীর নামও করলেন কেউ কেউ। কিন্তু উর্বশীর চেয়ে মেনকা অনেক বেশী অভিজ্ঞা। অনেক বেশী ধৈর্যশীলা।

মেনকা দেবতাদের আদেশ শুনে ভীতা যে হলেন না তা নয়। ঋষি বিশ্বামিত্রকে ভোলানো চাট্টিখানি কথা নয়। মদন ভস্মের পর সবাই একটু বেশী ভীত।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেতেই হলো তাকে। তবে সঙ্গে নিয়ে এলেন ঋতুরাজ বসন্তকে। বিশ্বামিত্র কোকিলের ডাকে, নূপুর নিক্কণ শুনে নয়ন মেললেন। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধান্ধ নয়ন শীতল হলো। মেনকার ঘণ জঘণ ও স্থূল বক্ষ, গুরু নিতম্ব দেখে মুগ্ধ হলেন। সময় বুঝে বক্ষাবরণ মুক্ত করলো মেনকা। অপাঙ্গে কটাক্ষ হানলো। ইন্দ্রিয়জিৎ ঋষি হুঁচট খেলেন। ছুটে এসে লীলাচ্ছলে পলায়নপরা যুবতীর পাণি আকর্ষণ করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লজ্জা সম্ভ্রম, তপস্যার ফল বিসর্জন দিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। শকুন্তলার জন্ম হলো।

সত্যি বলতে কি উর্বশী মেনকা রম্ভাদের হাতে অনেক মুনি ঋষিই ঘায়েল

হয়েছেন। সুবিধে করতে পারেনি কেবল অষ্টাবক্র মুনির কাছে। সেই যে, এক স্থবিরা ষোড়শীর ছদ্মবেশে সেবা করেছিলো অষ্টাবক্রের। গাত্রে তৈলমর্দন করে দিয়েছিলো। অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করে তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু না, অষ্টাবক্র অচল অটল। বলেছিলেন, ত্যাখো বাপু তোমাকে ভাল মেয়েছেলে বলে মনে হয়না, তুমি বরং কেটে পড়ো।

শিষ্টাচার পালনের জন্য নটী দ্বারা অতিথির মনোরঞ্জনের প্রথা অতীতকালে ছিলো। এ যুগেও নাকি ভারী কণ্ট্রাক্ট বাগাতে কোন কোন স্থলে মদ ও মেয়েমানুষের যোগাড় রাখতে হয়।

কমলরাণী বলতো, খোঁজ নিয়ে দেখুন গে শুধু কি আমাদের ভেট দেয়। তেমন তেমন ক্ষেত্রে নিজের বিয়ে করা মাগকে এগিয়ে দিতেও নচ্ছারদের বাঁধেনা। নিজের বৌকে বাজী রেখে আপনাদের যুধিষ্ঠির জুয়ো খেলেচে না? কমলরাণীর কাছে ঢাক ঢাক গুরগুর ছিলোনা। তার মুখের ট্যাক্স ছিলোনা। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় গেলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। আরও ঘনিষ্ঠভাবে বললে, ইন্দ্রপুত্র অর্জুন। একেবারে সোনা বাঁধানো চরিত্তির ছিলো তো ইন্দ্রঠাকুরের। তা যাক গে। দেবরাজ ইন্দ্র কৃতী পুত্রকে (কয়েকদিন আগেই নাকি শ্রীমান অর্জুন দেবাদিদেব মহাদেবকে বেশ একহাত নিয়েছেন) কাছে পেয়ে তাকে সম্মান দেখাবার জন্য দেবসভায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সেই সভাতে শ্রীমতী উর্বশী এক সর্পনৃত্য দেখালেন। অনন্ত-যৌবনা উর্বশীকে দেখে বিস্ময়বিমূঢ় অর্জুন এক পলক তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তা তিলোত্তমার নাচ দেখতে বসে সুবিধের জন্য পিতামহ ব্রহ্মা চারদিকে বদন বের করেছিলেন, এখবর কে না জানে। অভিজ্ঞ দেবরাজ পুত্রের মনোবাসনা অনুমান করে শচী দেবীকে দিয়ে উর্বশীকে বাড়ীতে ডেকে এনে বলিয়েছিলেন, সেদিন রাতে শ্রীমতী উর্বশী যেন কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষার জন্য মহাবীর অর্জুনের শয়ন কক্ষে যায়।

মহাবীর অর্জুনের প্রতি বিশেষতঃ মর্তের মানবের প্রতি উর্বশীর আকাঙ্ক্ষা চিরবিদিত। অর্জুনের পূর্বপুরুষ পুরুরবাকে তিনি বিয়েও করেছিলেন। তাঁর সন্তানও গর্ভে ধারণ করেছিলেন। সুতরাং অর্জুনের শয়ন কক্ষে যেতে উর্বশীর আপত্তির কারণ ছিলোনা।

মুখে বললেন, তা ঠাকরুণ, আপনি যখন এত করে বলচেন! অবশ্য আমার আর একটি 'এনগেজমেণ্ট' ছিলো।

ভাল করে সেজে গুঁজে (স্বর্গে নাইলনের শাড়ী প্রচলিত ছিলো কিনা আমি জানিনে), শ্রীমতী তো একটু রাত হতেই অর্জুনের কাছে যেয়ে হাজির।

বললেন, নৃত্যসভায় তোমার আঁখির আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি। হে বীর শ্রেষ্ঠ, তুমি এবার আমাকে তোমার শয্যায় গ্রহণ কর।

জিতেন্দ্রিয় অর্জুন তো অবাক! সে কি, তিনি তো কোন পাপ অভিপ্রায়ে উর্বশীর দিকে তাকান নি। উর্বশী চন্দ্রবংশীয় বহুরাজার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন বহুযুগ ধরে। সেই সব রাজারা কালের কবলে পতিত হয়েছেন যথা সময়ে। কত কাল গেলো। কত যুগ জীর্ণ হলো। কিন্তু সুন্দরী উর্বশী কী করে আজও তার অক্ষয় যৌবন এমন করে ধরে রাখলো, এই বিস্ময়। এই জিজ্ঞাসা।

উর্বশী বললেন, মেয়েদের বয়েস আর পুরুষের আয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। সে রহস্য—রহস্যই থাক। এখন এই কামনাবিহ্বলা আমাকে সকাম আলিঙ্গন করুন মহাবীর অর্জুন। আমি আলিঙ্গনের চৌরাশি প্রকার বন্ধন সম্পর্কে অবহিতা।

কী সর্বনাশ। স্বয়ং রাবণ রাজা তো তাহলে ছেলেমানুষ। তিনি পুত্রবধূ রম্ভাকে বলেছিলেন, 'শৃঙ্গারের অষ্টাদশ বিধি আমি জানি'।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত তো তাই লিখেছেন।

জিতেন্দ্রিয় অর্জুন (কী করে জিতেন্দ্রিয় তা ভগবানই জানেন। যে জায়গায় গেছেন, অনুগ্রহ করে সেখানেই কুলীন সেজেছেন মনে হয়। ব্রহ্মচর্য পালন কালেই না নাগকন্যা উলুপীসুন্দরী জোর করে পাতালে নিয়ে যেয়ে বিয়ে করে ছেড়ে দিয়েছিলো! শ্রীমান ইরাবান তো উলুপীর গর্ভজাত সন্তান বলেই জানি) জিভ্ কেটে বললেন, একী বলচেন দেবি! আপনি যুগে যুগে আমার পিতৃপিতামহ প্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধ পিতামহ, অতি অতি অতি বৃদ্ধ পিতামহদের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন, আপনি আমাদের কুলমাতা। আপনি আমার জননী স্থানীয়া।

কমলমণি থাকলে বলতো, মর ড্যাকরা। একেবারে যেন পাঁজিপুঁথি ছাড়া একপা চলতে নেই! ওদিকে গ্যাখোগে পাঁচ ভাই মিলে এক বউ নিয়ে ঘর করছে। সাধে কি দুর্যোধনকে সমাজের শিরোমণি বলা হতো, এঁদের নাবলে!

উর্বশী বললেন, তিনি স্বৈরিণী। তিনি কারও একার নন। যখন যাঁর উদ্দেশ্যে গমন করেন, তিনিই তার পতি।

রাবণ রম্ভার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তুমি আমার পুত্রবধূ হলে কী করে? রম্ভা বলেছিলো ঠিক এই কথাই। যেহেতু সে কুবেরের পুত্র নল কুবেরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে সুতরাং সে তার পুত্রবধূ। আরও ভরসা দিয়ে বলেছিলো, বেশতো আমি ফিরে এসে তোমার সঙ্গে সাতদিন বাস করবো।

রাবণ হেসে বলেছিলেন, সেদিন এই পুত্রবধুত্ব ঘুচবে কিভাবে?

রম্ভা বলেছিলো ঐ কথা। যখন যাঁর উদ্দেশ্যে গমন করবো, তিনিই তার পতি। কমলমণি বলতো, আমরা যার রক্ষিতা থাকি তার সঙ্গীদের ঠাকুরপো বলি। কোন ঠাকুরপো আবার আমাদের রক্ষক হলে এমনকি সেই পূর্বের নাগরও যদি তখন আসে. তিনি ঠাকুরপো। সম্পর্ক ঠিক করতে আমাদের পুরুতের কাছে যেতে হয়না। আমাদের বাড়ীর টিয়া পাখীটা পর্যন্ত আমাদের কূটনৈতিক শিষ্টাচার জানে।

বেরসিক রাবণ অবশ্য রম্ভার অনুরোধ মতো তাকে ছেড়ে দেন নি। কৃত্তিবাস পণ্ডিত লিখেছেন,

> "একে ত রাবণ তাহে সংগ্রামে প্রবীণ
> একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন।"

কিন্তু বেচারা অর্জুন বদনামের ভয়ে (কথাটা কি আর চাউর হবেনা!) কিছুতেই রাজী হলেন না।

অবশেষে কামোপেক্ষিতা উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন। কামোন্মুখ রমণীকে উপেক্ষা করে যে ক্লীবাচার করলেন অর্জুন, এজন্য তাকে সত্য সত্যই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হতে হবে।

বৃহন্নলাবেশিনী অর্জুন সেই ক্লীব।

সোনাগাছি বাই লেনের মোড়ে মোড়ে অনেক দোকান পাট। আপাত-

দৃষ্টিতে অনেক গুলোই নির্দোষ। কিন্তু রাতের বেলা তার রূপ স্বতন্ত্র। দরকার হলে, ওখান থেকেই আসে চোলাই করা মদ (দামী বিলিতি মদও), চরস, গাঁজা, কোকেন। হৈ হুল্লোড়, আর খিস্তি খেউড়ে সারা রাস্তা সরগরম হয়। চায়ের দোকান, তেলেভাজার দোকানের বয়গুলোর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। কোন খদ্দের কত দরের এক পলকেই ধরে ফেলতে ওস্তাদ তারা। কোন খদ্দেরকে তিনতাসের খেলা, কড়ির খেলায় আমন্ত্রণ জানানো নিরাপদ, এ চিনতেও ভুল হয়না। আর ঐ দোকানগুলোর সব খদ্দেরই যে আসল খদ্দের নয়, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাও বোঝা যায়।

দ্বিজপদ চৌধুরী বলতো, দায়ে না পড়লে রাতের বেলায় এপাড়ায় এসো না লক্ষ্মী ছেলে। প্রতিরাতেই এমন কি দিনের বেলার নিরালা অবসরেও রাহাজানি, ছিনতাই লেগেই আছে। সামান্য কথাকাটিতে ছোরাছুরি চলা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিজেরা করে, পরের জন্য ভাড়াটে হিসেবে মারামারি খুনোখুনি করে। দত্ত বাড়ীর বড়বাবুর পিরীতের মেয়ে মানুষের ঘরে হঠাৎ-নবাব শীলবাড়ীর মেজকর্তা ঢুকবে, তাকে নিয়ে সিনেমায় রেসকোর্সে যাবে, এর প্রতিকার আদালত করে দেবার জন্য বসে থাকবে না কেউ। ওপাড়ার গুণ্ডামস্তানরাই যথেষ্ট। অবশ্য অপর পক্ষ ইচ্ছে করলে পাশের গলির কানা কানাইএর দল ভাড়া করতে পারে।

বলেছিলাম, বলকি চৌধুরী—এমন ?

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, এই সব মস্তানরা আবার মেয়েমানুষদের রক্ষক। বাড়ী হিসেবে এক বা একাধিক লোক পাহারাদার। 'পিতমদগার' বলতে পার।

—রক্ষক মানে ?

—কোন খদ্দের এসে হামলা করলে, মস্তানী করলে ; বেতাল বেচাল চললে তাদের হাত থেকে যথাসাধ্য রক্ষা করে এই মস্তানরা। মেয়েদের অনেকে, খাটের নীচে গুণ্ডা রাখে, আলমারীর পেছনে গুণ্ডা রাখে। খাটের চাদর এমন ভাবে ঢেকে দেয় বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। বিপদ দেখলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শুধু কি বিপদ থেকে ত্রাণই করে ! অনেক সময় শাঁসালো খদ্দের পেলে ছোরাছুরির ভয় দেখিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিতেও

এদের জুড়ি নেই। পুলিশের উপর নির্ভর করার চেয়ে এদের উপর নির্ভর করা বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করে বারবণিতারা। সহজে পুলিশ এরা ডাকেনা কারণ কে জানে কেঁচো খুঁড়তে যেয়ে সাপ বেরুবে কিনা! কে জানে কোন বাড়ীতে রয়েছে ফেরারী আসামী, কোন বাড়ীতে রয়েছে সদ্য চুরি-করে-আনা গৃহকন্যা, কোন ঘরে রয়েছে জাল নোটের ব্লক, পঙ্গু ভিখারী তৈরীর ডজন ডজন হাড়ি আরও কত কি, সেসব আমি এ পাড়ার দশবছরের ঘুঘু হয়েও জানিনে। এই অসীম রহস্যময় গুহার কতটুকুই বা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়! বাড়ীর বাসিন্দারাই কি জানে বাড়ীওয়ালীর ঘরে কী ঘটে! খদ্দের তো দূরের কথা, তার পাশের পুরানো মাগীটাই কি জানে! এজন্যেই এরা স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এদের প্রশ্রয় দেয়। তোয়াজ করে। এজন্য তাদের মাসোহারা দিতে হয়। অনেক সময় বাড়ীওয়ালীই এদের পোষে। তাদের মাহিনা ভাড়াটেদেরও অনেক সময় বহন করতে হয়। দেহদানও করতে হয়। বিপদে পড়লে, বিপদ ডেকে আনলে, থানা কোর্টে এদের মুক্তির জন্য পয়সা খরচ করতে হয়।

বলেছিলাম—এরা কারা, চৌধুরী?

—অধিকাংশ অপাংক্তেয় সন্তান। ডাষ্টবিন, নর্দমা কুড়ানো সন্তান। বস্তির বখা চ্যাংড়া। বারবনিতাদের অবাঞ্ছিত সন্তান। হ্যাঁ, বেশ্যাদেরও সন্তান হয় বৈকি। সে নিয়ম কানুন ওরাও জানে। মহাভারতের কুন্তী সূর্যকে দিয়ে সন্তান চেয়েছিলেন। পেয়েওছিলেন। আমাদের কমল রাণীদের বাড়ীতে যে মেয়েটি ম্যাসেজ বাথে চাকরী করে, সে সাহেব থেকে সন্তান কামনা করে এক সন্তান পেয়েছে দেখে থাকবে। তবে মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়েছিলো মেয়েটার। পুত্র সন্তান সাধারণত কামনা করে না ওরা। কন্যা সন্তানের আদর ওদের কাছে বেশী। তারা ওদের ভবিষ্যতে বুড়ো বয়সের সম্বল। অনেক সময় ভিক্ষে করা, বাসন মাজা ঝি, গিরি করার লজ্জা থেকে ঐ কন্যারা ওদের বাঁচায়। ছেলেদের ওপর ভরসা কম ওদের। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর আলো দেখার আগে পুত্র সন্তানকে চিরতরে সরিয়ে ফেলে ওরা। একান্ত মায়ায় পড়ে দু' পাঁচটা যা টিকে থাকে নেহাৎ বরাৎ জোরে, তাদের অনেকেই অনাদৃত অবহেলায় বড় হতে হতে চোর গুণ্ডা বদমাসে পরিণত হয়। না, সবাই হয় না। দৈত্য কুলেও প্রহ্লাদের জন্ম

হয়। গোবরেও পদ্ম ফুল ফোটে। দু চারটে মানুষও হয়। সমাজে-মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

—সমাজ স্বীকৃতি দেয় তাদের, চৌধুরী ?

—আমি সমাজ কর্তা নই রায়মশায়। তবে আমি নিজেই দু চার জনকে বড়-হতে দেখেছি। শিবতলার পাশের লাল বাড়ীর মুরলী বিবির ছেলেটা ডাক্তার হয়েছিলো। পানের দোকানের বুড়ীর বাড়ীর একটা ছেলে ল' পাশ করেছে। ইমামবক্স লেনের এক ছোকরা বি. এ. পাশ করে কোথায় যেন চাকুরী পেয়েছে। এ ছাড়া যুদ্ধের চাকরীতে যেয়েও অনেকে নাম করেছে। এমন কি যাত্রা থিয়েটারে বেশ ক'জন নাম কিনেছে। সিনেমা পোষ্টারে তাদের নামও বেরুয়। অপেক্ষাকৃত নিরীহ যারা তাদের কেউ কেউ দালালী করে। না, পাটের দালালী নয়। মাংসের দালালী। নারী মাংসের। সেণ্ট্রাল এভিনিউতে অনেক গাড়ী দেখতে পাবে সময় সময় রাস্তার পাশে। এ পাড়ায় মুখোমুখি। কমিশন থাকে, বখ্‌রা থাকে। লোক বুঝে, 'একেবারে আনকোরা বাবু,' 'একদম গেরস্থ মালবাবু' 'মেম সাহেব আছে বাবু' 'যা চাবেন তাই পাবেন বাবু গাড়ীতে আসুন'—ফিস ফিস করে পথ চলতি বাবুদের কানে কানে বলে। একেবারে সাড়াও যে পায়না তা নয়। তারপর কোথায় নিয়ে তুলবে সে সেই খদ্দেরেরভাগ্য। আন কোরা ছুকরী দেবার নাম করে বুড়ী মাগীর-ঘরে ঢুকাবে কি, কুষ্ঠ, সিফিলিস, গনোরিয়াওয়ালা মেয়ে মানুষের ঘরে তুলবে, সে ভাগ্যদেবতার বাবাও জানে না। পকেটে বেশী রেস্ত আছে বুঝতে পারলে মদ খাইয়ে খাইয়ে নর্দমায় নামিয়ে দিয়ে আসতে বাধা কি! ট্যাক্সির মধ্যেই ক্লোরফরম ভেজানো রুমাল চেপে ধরলেই বা কে দেখতে আসবে ? তবে হ্যাঁ, এ সব শুনে ঘাবড়ে যেও না ভায়া। রেলওয়ে প্লাটফরমে ছ্যাখোনা, পকেটমার হতে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, চোর, জুয়াচোর আপনার পাশেই আছে। অথচ তার মধ্যে যথেষ্ট ভদ্র-লোকও কিন্তু আছে! এখানেও তাই। তোমার বরাতে ভদ্র দালালও জুটে যেতে পারে! যাদের 'গুড উইল' আছে। মাল সাপ্লাইয়ে সুনাম আছে। কিন্তু সে তো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশনা ব্যতীত রামবাবু শ্যামবাবু চিনতে পারবেন না। যারা চিনবে না, তাদেরই ভালোর

ভাদোয় ডেরায় ফেরা বিপদ। তবে ঐ সব ন্যাড়ারা এক আধবার বেল তলায় গিয়ে ঠেকে শিখলে সহজে আর-এ পাড়ামুখো হয় না। পাঁচ টাকায় কবুল করে নিয়ে বাগে পেয়ে পঞ্চাশ টাকা বাগিয়েছে এমন ঘটনা এ পাড়ায় হামেশাই ঘটে। ঘাটে ঘাটে দক্ষিণা দিতে দিতে ঘড়ি আংটি জামা কাপড়ের মায়া মমতা ত্যাগ করে আণ্ডার-ওয়ার সম্বল করে বাড়ী ফিরেছে এমন ঘটনাও আকছার। কাজেই তোমাকে অ-দালাল সুলভ একটা কথা বলছি, তোমাদের সমাজের ছেলে ছোকরাদের বলো, নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া আর রাত্রির বেলা বে-পাড়ায় মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর ডাকে সাড়া দেওয়ায় খুব রকম ফের নেই। অতএব সাধু সাবধান। কোলকাতা সহরে দু একশ টাকায় চরিত্রহীন হওয়া যায় না। ছ্যাচড়ামো, ছিচকেমি করা চলে মাত্র। ছাখোনা তোমাদের শরৎচন্দ্র, এত কষ্ট করেও, তার চরিত্রহীন বইয়ের একটা নায়ক-উপনায়ককেও চরিত্রহীন করতে পারলেন না। বনেদী চরিত্রহীন আর বনেদী বড় লোক দুইই এ যুগে দুর্লভ। বুঝলে খোকা!

শেষ পর্যন্ত চৌধুরীর সম্প্রদায়ে গান গাইতে রাজী হয়ে ছিলো কমলরাণী। তার বাবুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই। কিন্তু রিহার্শেলের মধ্যেও দু জনের মধ্যে খিটমিটি লেগেই থাকতো। তবে আমাদের সামনে আর খুব বেশী বেচাল বেতাল বলতো না। এ সব ক্ষেত্রে চৌধুরী-সব সময়ই কমলরাণীকে তোয়াজ করে চলতো। আর বাইরে এসে আমার পয়সায় সিগারেট টানতে টানতে তড়পাতো, ভারী তো শালীর দেমাক। শালী ভাব দেখায় যেন কত 'ধর্মিষ্ঠি'। ইচ্ছে করে পাছায় লাথি মেরে শালীকে 'বিন্দাবন' পাঠিয়ে দেই। নেহাৎ সকাল বেলাটা মাগীর ওখানে ফাঁকা থাকে তাই না রিহার্শেলের ব্যবস্থাটা ওখানে করেছি। ওকে নিয়ে রিকর্ড করবো না কচু করবো।

আবার পর দিনই হয়তো আমাকে তোয়াজ করতো, তুমি একটু সুপারিশ করে দাও না ভাই। ওর উপরে রাগ করে অন্য ঘরে রাত কাটাই কিন্তু এই শালার মনটা পড়ে থাকে শালীর উপর। এর থেকে বউটাকে যদি না তাড়াতাম, শালা কতই তো ধোয়া তুলসী পাতা দেখলাম, তা হলে আর একটা বেবুশ্যের কাছে কুকুরের মতো পা চেটে থাকতে হতো না ভাই।

চৌধুরীর বিবাহিত জীবনের কাহিনী শুনেছিলাম। চৌধুরীর মুখেই শুনেছিলাম। চৌধুরীর একটা জিনিস ছিলো, লজ্জা নিয়ে তার লজ্জা ছিলো না। সব সময় না হলেও কোন কোন সময় চৌধুরী সত্য কতা বলতো। আর তখন তার নিজের সম্পর্কেই হোক, অপর কারো সম্পর্কেই হোক সত্যি কথা বলতে বাধতো না।

চৌধুরী ঘর বেঁধে ছিলো। যাত্রার দল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছিলো। একার রোজগারও এ সময়টা চৌধুরীর একেবারে খারাপ ছিলো না। প্রথম প্রথম ভালই লাগছিলো। বাউংটে গরু প্রথম বাঁধ পড়ে পাত্রে রাখা কচি ঘাস হামলে খাচ্ছিলেন। আঙুরও মন দিয়ে সংসার করছিলো। অল্প টাকায় যত খানি সম্ভব গোছানো সংসার। যত খানি সম্ভব মানিয়ে চলতো। স্বামী বাড়ীতে এলে হাত পাখা নিয়ে বাতাস করতো (প্রতি বারই চৌধুরী শোনাতো এবারকার গাওনাটা গেয়ে এসেই একটা ইলেকট্রিক ফ্যান কিনে আনবেই সে)। পা ধোবার জল এগিয়ে দিতো (যেন চৌধুরী-এক পা এগিয়ে বাথরুমে যেতে পারে না বা বাথরুম চৌবাচ্চায় ভালো জল না থাকলে, গঙ্গার জলে হাত পা ধুতে পারেনা)। ফর্সা কাপড় পরে, একটু সেজেগুজে এসে পাশে দাঁড়াতো। এদিক ওদিকে তাকিয়ে আদর করে গালটিপে একটা মধুর যাত্রার দলের খিস্তি করে দিতো চৌধুরী। আঙুরবালা সলজ্জ কণ্ঠে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে তা উপভোগ করতো। যে-গানটা যে—আসরে হাততালি কুড়িয়েছে, সেই গানটির কথা পাঁচ কাহন করে বলতো। সত্য মিথ্যে যা মুখে আসতো বলতো। কোন গাঁয়ের জমিদার বাবু গান শুনে জড়িয়ে ধরেছে, কোন বাবু একটা সোনার মেডেল দিতে চেয়েছে, হঠাৎ গান হলো বলে তৈরী করতে পারেনি, আগামী বছর দেবে বলেছে, এ সব কথা অঙ্গুরবালাকে শোনাত। আঙুরবালাও এ সব, সব সময় সত্যি কথা নয় জেনেও শুনতে ভালবাসতো। চৌধুরীর মুখ চেয়েই ভালবাসতো। আর চৌধুরীও পাশের ঘরের ভাড়াটেদের শুনিয়ে রাজা উজীর মারতো। শিগগিরই যে যাত্রার দল ছেড়ে রীতিমত থিয়েটারে ঢুকছে এবং ঢুকছে আরও বেশী মাইনেতে, এ সব কথা অন্য ভাড়াটেদের শোনা

হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম আঙ্গুরবালার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। থিয়েটারে ঢুকলে আঙ্গুরেরও ব্যবস্থা হবে এ আশায় বসে থেকে, থেকে, চৌধুরীর কথার অসারতা ধরা পড়তে শুরু করেছিল।

এর কিছুদিন পর থেকেই চৌধুরীর মতিগতি পাল্টাতে থাকে। কথায় বলে যাত্রার দলের অ্যাক্টর আর চরিত্তির দুই-ই নাকি এক ঘাটে বাঁধা থাকে না। একদিন গভীর রাতে মাতাল হয়ে, 'কবে তাহারি বুকে আমি বুক মিশায়ে রবো, বরষ বরষ কত চাহিয়া রবো'—তখনকার দিনের এক Burning song গাইতে গাইতে প্রবেশ করেছিলো চৌধুরী। মদ চৌধুরী কবে ধরেছিলো, চৌধুরীর নিজেরই তা মনে নেই। কিন্তু মাতাল হয়ে প্রবেশ এই প্রথম। আর প্রথম যখন, তার দ্বিতীয়, তৃতীয় রজনীতে পড়তে বাঁধা কোথায়। এর পর মাঝে মাঝে রাতে ডুব দেওয়া আরম্ভ করেছিলো চৌধুরী। মাঝে মাঝেই বাড়িতে হাড়ি চড়তো না। সয়ে সয়ে আঙ্গুর বালাও ঝগড়া স্বরু করেছিলো। পরিণতিতে পুস্তকবহির্ভূত ভাষায় গলাগাল থেকে আরম্ভ করে মারপিটে যেয়ে ঠেকতো। আর কোন কোন বাঙ্গালী পুরুষের বীরত্ব তো বউ ঠেঙ্গিয়ে প্রকাশ পায়ই। সে সব রাতে বাড়ীতে রান্নার আরও বালাই থাকতো না। চৌধুরী নিজেই এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে এসে একা খেতো। আঙ্গুর বালার খাওয়া হয়েছে কিনা শুনিয়ে নজর দেবার দরকার বোধ করতো না। আঙ্গুর বালা কাঁদতো। ফুলে ফুলে কাঁদতো।

এর কিছুদিন আগেই একদিন চৌধুরীর খোঁজে খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলো স্বধু ঘোষ। একদিন দুদিন তিনদিন; তারপর যখন তখন। অবশ্য চৌধুরীর চোখ বাঁচিয়ে।

চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আঙ্গুরের উপর এরূপ নির্যাতন সে করতো কেন? চৌধুরী বলেছিলো, দ্যাখো ভায়া, অপরাধপ্রবণ মন সব সময় অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায়। তখন আমি যাত্রার দলের আর এক ছুঁড়ির প্রেমে মশগুল। [আর বেটা স্বধু ঘোষ যতই চোখ এড়িয়ে আসুক, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। অথচ তাদের কোন খারাপ কিছু দেখিও নি তখন। বাড়ীউলি মাসিকে গোপনে নজর রাখতেও বলেছিলাম। (কিন্তু যতই শুনতাম, ওদের মধ্যে কিছুই ঘটছে না, ততই যেন বেশী সন্দেহ

করতাম।) যেন ওদের মধ্যে কিছু ঘটলে আমার বাইরে পিরীত করে বেড়ানোটার একটা জোর-দার সাফাই হয়। অথচ সুধু ঘোষ বা আঙুংকে কিছু সরাসরি বলতেও পারতাম না। নিজের চোখে তো আর কিছু দেখিনি। না কোন ফষ্টি নষ্টি করতে, না কোনদিন ত্বজনে পথ চলতে।]

কমলরাণী বলতো, যাই বলুন দাদা, আমরা যতখানি ঘৃণা পাই, অপর কোন নারী তা পায়না।

কমলরাণী কিছু লেখাপড়া করেছে, আমি বুঝতাম। শুনেওছিলাম। কিন্তু ও যে আত্মসম্মান সম্পর্কে এত সচেতন তা জানতাম না। ওর উপজীবিকা সম্পর্কে ওর ধারণা আছে। তার ভালমন্দ দিক সম্পর্কে ও ওয়াকিফহাল। আর পাঁচজন বারবনিতার মতো দোষ গুণ থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। ওর অতীত আমি জানিনে, জিজ্ঞেস করবো করবো করেও করিনি। কে জানে একটু সহানুভূতি, একটু ভালবাসা পেলে ঐ কমলরাণীই হয়তো আর পাঁচজন গৃহী মা বোনের মতো স্বামীপুত্র সংসার নিয়ে পরম শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। অনেক বারবনিতারই যা সাধ। কিন্তু এদেশে একবার পা পিছলালে ফেরা খুবই কষ্টকর। অবশ্য দেহবিক্রয়ের মাধ্যমে বিকৃত যৌনরুচি চরিতার্থ করার কামনা নিয়েও কেউ কেউ এপথে আসে, একথাও সত্যি। আবার এই পল্লীতে জন্ম নিয়ে মা ঠাকুরমার দেখানো পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াও আছে। সে এক অদ্ভুত নেশাগ্রস্তের মতো জীবনকে টেনে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা।

কমলরাণী বলতো, আমাদের ঘৃণা করেন না এমন লোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। অথচ আমাদের কাছে সমাজের অনেকেই আসেন। দিনের বেলা যাঁরা নিন্দে করেন, রাতের বেলা তাঁদেরই অনেকে সন্দেশ না হোক বোতল আনান। আর মদের মুখে, 'মাইরী কমলি বিবি আমি তোমার পদতলে নেউটা হয়ে পড়ে থাকবো মাইরী। একটুখানি কিপা করে এক চুমুক পেসাদ করে দাও ভাই।' আরো কত কি! আপনি হয়তো যাঁকে জানেন সমাজরক্ষক বলে, তাঁরও শুভ পদার্পন ঘটে এখানে। আবির্ভাব ঘটে অনেক দেশ নেতা, সমাজ সংস্কারক থেকে, আরম্ভ করে শিক্ষক ছাত্র,

বিবাহিত অবিবাহিত প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের লোকের। খুনে, ডাকাত, চোর, বাটপাড়, লম্পট, ব্ল্যাকমেলার সবার আনাগোনা রয়েছে এখানে। কেউ আমাদের সমাজের কুলীনদের ঘরে যায়, কেউ যায় অন্তজদের ঘরে। কিন্তু এই তীর্থে বিক্রমাদিত্য কালিদাস-সবাই আসেন। কেউ আসেন গর্বিত পদ বিক্ষেপে দশজনকে জানিয়ে, হৈ হুল্লোড় করে পয়সা ছড়াতে ছড়াতে। একটা কাচের গেলাস ভাঙার খেসারতে একশ টাকার নোট অম্লান বদনে ছুঁড়ে দেওয়ার হিম্মৎওয়ালা। আবার আসে মাছের দাম কষাকষি করে ফুর্তিও চাই, টাকারও উশুল হয় এমন দরকষা লোকও। আবার লুকিয়ে চুরিয়ে আসা বৈষ্ণব বাবাজীর আগমনের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয় আমাদের।

বলতাম, তা তোমরা কেমন ব্যবহার কর কমলরাণী?

কমলরাণী বললো, খদ্দের লক্ষ্মী। সবাই আমাদের কাছে অতিথি। আমাদের ব্যবসায়ের প্রথম কথাই হচ্ছে, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিনটিকে বিসর্জন দিতে হবে। ওকে বসাবো না, ওকে বসাবো, এটা খাবোনা, ওটা খাবোনা বললে, আমাদের চলেনা। ঐ যে একটা গল্প আছে না, বর যাত্রী গেছে একদল ছেলে। কন্যা পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করছে, মশায়দের কি মদ টদ এক আধটু চলে? বর যাত্রীরা উত্তর দিয়ে ছিলো, আমরা ভদ্র ঘরের ছেলে, এটা খাবোনা, ওটা খাবোনা, এ সব বলা আমাদের অভ্যেস নেই মশাই। বুঝলেন দাদা, আমাদেরও তাই।

বলতাম, তবু…… !

কমলরাণী বলতো, এর আর তবু টবু নেই। হাতখড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলে দেওয়া হয়, দ্যাখো বাপু জীবন উদ্যানে, যৌবন কুসুমভাতি চিরদিন থাকবে না। সুতরাং দুটো পয়সা বেশী কামাতে হলে, নিঘৃণ হতে হবে। প্রথম প্রথম ঘেন্নাকরতো। কেউ হয়তো উৎসাহের আবেগে মদো মুখে বেলাল্লা কাণ্ড করতো, বমি করে ঘর ভাসিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠতো। ইচ্ছে করতো লাথি মেরে বের করে দি। কিন্তু তা করতে পারতাম কই। করা উচিত নয় যে। কারণ ঐ খদ্দেরই হয়তো আর একদিন বকসিস্ দেবে দশ বিশ টাকা। তবে দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যার তার ঘরে ঢুকতে হয়না এই যা রক্ষে। তা ছাড়া সময়ই বা কই,

শরীরে যতখানি সয়, তার চেয়েও বেশী সয়াতে শিখি আমরা, আমাদের গুরুদের কাছে, অভিজ্ঞাদের কাছে। একই ভালবাসার কথা প্রতিজনকে বলতে হয়। একই উত্তপ্ত শয্যায় মনোরঞ্জন করতে হয় একের পর একক। কতজনের কত বদ খেয়াল চরিতার্থ করতে হয় টাকার দিকে তাকিয়ে। কত ন্যাকামী শুনতে শুনতে কান ঝালা পালা হয় দিনের পর দিন। এমনি করে করে হৃদয়ের কোমলবৃত্তি গুলো এক সময় হারিয়ে ফেলি আমরা। তখন আমরা হয়ে পড়ি যান্ত্রিক। সভ্য সমাজ সম্পর্কে আসে একটা প্রতিশোধস্পৃহা। বাঘ যেমন খাওয়ার জন্যই সব সময় মানুষ মারে না, প্রাণী মারেনা, আমরাও তেমনি নির্বিকার চিত্তে জয় করতে থাকি। আত্মপ্রসাদ লাভ করি। একটা খুন করলে তাকে খুনে বলা হয়, কিন্তু হাজার জনকে খুন করলে তাকে বলা হয় বীর। আমরাও সেই হাজার মেরে চিকিৎসক বনে যাই।

বললাম, আচ্ছা কমলরাণী, তোমাদের খদ্দেরদের ব্যবহার সম্পর্কে যদি আপত্তি না থাকে কিছু বলনা ?

কমলরাণী বলে, না আপত্তি কিসের বলুন, এতো বহু কথিত ব্যাপার। 'ওপন্ সিক্রেট'। তবে বাইরে থেকে যারা আমাদের সম্পর্কে জানে, তারা অনেকটা তিনতলার বারান্দা থেকে বস্তির সুখ দুঃখ জানার মতো। আমাদের পিশাচিনী রূপেই তাদের অনেকে দেখে। অবশ্য আমাদের মধ্যে অনেক পিশাচিনী আছে বৈকি? কিন্তু ভদ্র সমাজে কি নেই? সেখানে কি সম্পত্তির লোভে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরী বসায়না! দুধে বিষ মিশায়না! ভদ্রকুমারী, আত্মীয়স্বজন এমন কি কাকা মামা জ্যাঠার সঙ্গে পাপের পথে যায় না! গুরু কি শিষ্যাকে ব্যাভিচারিণী করেন না। সবই করেন, সবই ঘটে। উপর তলার যারা তারা ঢাকা দিতে পারেন, দেনও। যখন পারেন না, সমাজে আন্দোলন হয় পত্রিকায় ওঠে। দু দিন দশদিন বছর পর সব ধুয়ে মুছে যায়। আর আমাদের কলঙ্ক চিরকালের। এ ধুয়ে মুছে যাবার নয়।

বললাম, আমি কিন্তু খদ্দেরদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম কমলমণি। কমলমনি হাসলো। হেসে বললো, অনেকদিন বাদে একজন সমঝদার শ্রোতা পেয়েছি কিনা, তাই মনের আগলটা খুলে যায়। কিছু মনে করবেন না দাদা। হ্যাঁ, আমাদের কাছে একদল আসে যেন এখানে ঢোকার্ পূর্ব পর্যন্ত

তারা ধোয়া তুলসী পাতাটি। নেহাৎ অনুগ্রহ করে আমাদের সম্পর্কে একটা সামাজিক কর্তব্য করতে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেই আসচেন যেন। এসেই কৌতূহলী কণ্ঠে নাম ধাম বয়েস, কোথায় বাড়ী, কেন এ পথে এলাম (যেন এখানে না এলে আমাদের বাড়ীতেই যেতেন), এই সব শতেক জিজ্ঞাসা।

—তারপর !

—তারপর আর কি! আমরাও উত্তর দেই। তবে প্রায়ই সত্যকথা বলিনে। বলে লাভ নেই যে। এখান থেকে বেরিয়েই তাদের সহানুভূতি উপে যায় তো! আমরা আবোল-তাবোল বলি। নামকরা অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম জীবনের কাহিনী বলতে যেয়ে সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে বলে, জমিদার ঘরের মেয়ে ছিলো তারা, এও তেমনি। সবাই আমরা, উঁচুঘরের নেহাৎ পা ফস্কে এই নরকে এসে পড়েছি। বয়সের বেলায়ও সব সময় দু দশবছর হাতে রেখে বলি। তাই বলার নিয়ম। অবশ্য এমন মেক আপ্ আমাদের নিতে হয়, এমনিতেই দশ বছর কম দেখায় তাতে। তাছাড়া যাদের আবার কচি পাঁঠার মাংস ভালো লাগে, তাদের জন্য ফ্রক পরে খুকী সাজতে হয় অনেককে। তিরিশ বছর চল্লিশবছরের ধাড়ীও ষোল আঠার বলে পরিচয় দেয় এখানে। ফল্‌স্ ব্রেষ্টের কল্যাণে পতিত স্তনকে পিনোন্নত করে চালাতে আর কী কষ্ট?

বললাম, বাড়ী থেকে কেন বেরিয়েছ, একথার কী উত্তর দাও কমলরাণী!

—এক একজনের কাছে এক একরমক। কাউকে বলি ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম। কাউকে বলি ভুলিয়ে এনেছে জমিদারের ছেলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। হিন্দুস্তান পাকিস্তান হওয়াতে তো বলার কথা আরো বেড়ে গেছে। অনেক সহানুভূতি দেখায়। আহা-উহু করে। আসলে ব্যাটাদের মতলব হচ্ছে, বেশী হাত ফেরত হয়েছি কিনা, এটা জানা। অবশ্য কেউ কেউ আন্তরিক ভাবেই জিজ্ঞেস যে না করে তা নয়। উত্তেজনার মুহূর্তে কত আবোল-তাবোল বলে। এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তো আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতেই চেয়েছিলেন। না, রক্ষিতা হিসেবে নয়, একেবারে সিঁদুর পরিয়ে। স্ত্রীর চরিত্তির ভালো নয় বলে নাকি লাথি মেরে তাকে মেরেই ফেলেছিলেন তিনি। তা বউটির বা দোষ কি। শুনেছি সেই তৃতীয় পক্ষটি এই যৌবন-

ফুৎকুৎটিকে লুকিয়ে তাঁর কর্মচারীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতো। দুপুর বেলা ভদ্রলোক যখন দোকানে থাকতেন, তখন নাকি সেই ছোকরা ফাঁকে ফুকরে মনিবগিন্নির মনোরঞ্জন করতো।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য ক'রি দাদা,/অধিকাংশ পুরুষই নিজের স্ত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে একেবারে সতীসাধ্বী খোঁজেন। পূর্বজীবনে ছিটে ফোঁটা দোষ থাকলেই সর্বনাশ। অথচ ঐ সব পুরুষদেরই কারো কারো আবার পর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে বাধে না।) সে বেলায় কিন্তু দোষ নেই। তেমন তেমন প্রেম চাগিয়ে উঠলে সেই অসতীকে (?) নিয়ে ঘর বাঁধতেও দেরী করে না। পরের ঘর ভেঙ্গেই কিন্তু। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই স্ত্রীলোকটির এই সব পাড়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। আমি অবশ্য ব্যতিক্রমদের বাদ দিয়েই বলছি দাদা।

কমলরাণী বলতো, মাতাল চোর বদমাস এদের আমরা চিনি। এদের ধারা আমাদের অজ্ঞাত নয় দাদা। মারামারি, মাতলামি, মাথা ফাটাফাটি দেখে দেখে আমাদের ভিমরী লাগে না আর। বিছানা পত্রের উপর বমি করে দিলে গালাগাল করেও আমাদেরই তা পরিষ্কার করতে হয়, বা ঝি চাকর দিয়ে করাতে হয়। মদের গন্ধ, তীব্র চাটের ঝাঁজ, বমির গন্ধ, ঘামের গন্ধে ঘরের বাতাস যখন ভরে যায়, অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে প্রথম প্রথম, তাও আমাদের সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা আমাদের কাদের নিয়ে জানেন, ঐ তথাকথিত ভদ্দর লোকদের নিয়ে। ওদের আমরা বুঝতে পারিনে। নিজে-দেরও বুঝতে দিতে অসুবিধে হয় আমাদের। অথচ প্রতিদিনই হয়তো ভাবি, আশায় আশায় থাকি, আজ আমার ঘরে না জানি কে আসচে। কে জানে হয়তো বা সে কে-একজনের অনুগ্রহেই বাকী দিনগুলো সুখে ভরে উঠবে। লটারীর টিকিট ধরে তীব্র উত্তেজনায় দিন কাটানোর মতো দিন কাটাই আমরা। কিন্তু আশায় আশায় থেকে কত জনই না বুড়ো হয়ে যায়। রামচন্দ্র আর আসেন না। শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে লোলচর্ম হয়ে উঠি আমরা। মনের মানুষ রাজপুত্র এই বন্দী রাজপুরী থেকে উদ্ধার করে না আমাদের। রামচন্দ্ররাও আমাদের উদ্ধার করেন না। পাশের ঘরের মণ্টি বললো, ভদ্দর

লোকদের নিয়ে যে কথা বললো না কমলিদি, ওদের নিয়েই বিপদ বাধে অনেক সময়। কেউ হয়তো ফেরারী আসামী। কেউ হয়তো হঠাৎ কাউকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। কেউ হয়তো অফিসের ক্যাশ ভেঙে ধরা পড়ার সম্ভাবনা জেনেই পাগলের মতো টাকা খরচ করতে আসে। বিকার-গ্রস্ত রোগীর মতো সেই সব লোকদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। হঠাৎ হয়তো কোথাও কিছুনা, পুলিশ এসে হাজির হয় দলবল নিয়ে। আসামী নাগালে পেলে ধরে নিয়ে যায়। তেমন তেমন আসামী হলে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। দরজা ভাঙ্গে, জানালা ভাঙ্গে। আমাদের নিয়েও টানাটানি পড়ে। তাল সামলাতে, ব্যবসার ক্ষতি হয় আমাদের। দুদিন হাজতে থাকলে, দুদিনের রোজগার বন্ধ। আমাদের তো আবার 'ওয়ার্ক অ্যাণ্ড পে' সিস্টেম কিনা, সেই নিয়ম। অবশ্য কমলিদিদের কথা স্বতন্ত্র।

কমলি মন্টির পিঠে এক আদুরে কীল বসিয়ে বলে, সেবার সাবিত্রীর ঘরে এক ক্যাশ সর্ট করা বাবু এসেছিলো। একটা নতুন কেনা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে। বলে কিনা দিল্লী থেকে এসেছে। কোম্পানীর কাজে। দুচারদিন মজা লুটে যাবে বলে হোটেলে ওঠেনি। ভালো কথা। এমন দু'পাঁচজন যে আসেনা তাও নয়। এবাবু একে দশটাকা বকশিস্ দেয়, ওকে সিনেমার পয়সা দেয়। নিজে যায় না। সাবিত্রীকেও যেতে দেয় না। বলে, মুখোমুখী বসে থাকো। সিনেমা থিয়েটারেই যদি যাবো, তাহলে তোমার ঘরে আসবো কেন ? বরং আরও দু'পাঁচজন সঙ্গী সাথী ডাকো, ফুর্তি করো, চাই কি ঘরেই সিনেমা কারা। আর যদি ব্লু ফিল্ম্ থাকে তো বলো, আশ্ মিটিয়ে দেখে যাই।

বললাম, সে আবার কি ফিল্ম।

কমলরাণী মন্টি চোখ টেপাটিপি করে হাসে।

দ্বিজু চৌধুরী পরে জ্ঞান দান করেছিলো। বলেছিলো, আরে ভায়া সে সব বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ডকারখানার ছবি। ফিল্ম তোলা। নায়ক নায়িকা এসব পাড়ারই। একটা কাহিনীর চিত্ররূপ। দ্বিজু চৌধুরী নাকি একবার দেখেছিলো, কী করে এক গুরুপত্নী তার শিষ্যের সঙ্গে পদস্খলন করলো তারই চিত্ররূপ। চৌধুরী বলেছিলো, আমার এক ফ্রান্স ফেরৎ মক্কেলের কাছে শুনেছি, ওখানে নাকি এমন সব জায়গা আছে, যেখানে আধা প্রকাশ্য ভাবে আরও রংদার ছবি

দেখানো হয়। একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ভাড়া করা সঙ্গিনী নিয়েও নাকি দেখা যায়। প্রতি ঘণ্টা বিশমিনিট পর নাকি ঘরের আলো কয়েক মিনিটের জন্য নিভিয়ে দেওয়া হয়। সে আর এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। চৌধুরীর কাছে ব্লু বুক, প্যারিস পিকচারের কথাও শুনেছিলাম। চৌধুরী বলতো, মাঝে মাঝে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, এখানে সেখানে ধরা পড়ে অমন নাকি ঐসব বই, ঐ সব প্যারিস পিকচার। পিকচার নাকি নামে প্যারিসের হলেও এখানেই ফোটো তোলা।

কমলরাণী বলে, সেই ক্যাশ সর্ট করা বাবুকে নিয়ে আমরা পর্যন্ত জমে গেছি। দিনরাত্তির গান বাজনা। হৈ হুল্লোড়। রৈ রৈ কাণ্ড। একা সাবিত্রীকে নিয়ে স্ফূর্তি জমেনা। বাড়ীর অবসর থাকা পাঁচজনকে নিয়ে নাচ চাই স্ফূর্তি চাই। আমরা তখন সাবিত্রীর ভাগ্যকে ঈর্ষা করছি। ওর নতুন কেনা শাড়ী দেখে জিভের জল ফেলচি।

আহা, আমাদের কপালে অমন একজন জোটেনা গো! এরকম না হলে কি আর বেশ্যাগিরি করে সুখ।

মণ্টি বলে, আহা গো দিদি, ও মালটাতো আমার কপালেই ছিলো গো। আমি যে কেন মরতে একটু আগে বকুলের মাড়ওয়ারী বাবুকে নিয়ে ঘরে বসিয়েছিলাম গো। বকুলটা আবার মরতে অন্যজনকে ঘরে বসিয়েছিলো। ভাবলাম, আহা ভুড়িওয়ালাটা কতক্ষণই বা বসে থাকবে গো। হাজার হলেও বকুল আর আমি কতদিন একবিছানায় শুয়েছি। যেই মাড়োয়ারীটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছি অমনি ঐ মিনসে হাজির।

কমলি বলে, আরও পরের জিনিসে মুখ দে ইয়ে—! তোর তো আর সবুর সয়না। তা ভালই করেছিলি। তা নইলে সাবির অবস্থা হতো!

বললাম, কেন কী হয়েছিলো!

কমলরাণী বললো, সেই যে ক্যাশসর্ট করা বাবু, তখনও অবশ্য আমরা জানি দিল্লীর কোন কোম্পানীর এজেণ্ট। সাবিকে নাকি বলেছে, তাকে খুশী করতে পারলে দিল্লী নিয়ে যাবে। কিন্তু মজার কথা এই, বাবু সারাদিনে ঘরের বার হননা। সাবির যারা বাঁধা খদ্দের তারা এসে ফিরে যায়। কেউ কেউ গালাগালি দিতে দিতেও যায়।

এদিকে হয়েছে কি, সারির এক খদ্দের ছিলো এক দারোগা বাবু। লুকিয়ে চুরিয়ে আসতো। এপথে যেতে আসতে পান খেয়ে যেতো। সাবিও সময় সুযোগ মতো দারোগাবাবুর বাসায় যেতো। সেদিন বুঝি বৃষ্টি ছিলো। সকাল বেলা এদিকে কোথায় যাবার পথে সাবির ঘরে এসে হাজির। একটু চা পান খেয়ে গল্প গুজব করে যাবে। বৃষ্টি ধরলেই চলে যাবে। সঙ্গী সাথীরা চলে গেছে। এদিকে সাবির নতুন বাবু তো সারারাত হৈ চৈ করে তখনও অর্ধউলঙ্গ হয়ে বালিশ জাপটে শুয়ে আছে। সাবি দারোগাবাবুকে আর ফেরাতে পারেনি। ঘরে নিয়ে বিছানার একপাশে বসতে দিয়ে চা আনাতে ঝিকে ডাকতে গেছে। ওদিকে দু শেয়ানায় সাক্ষাৎ।

ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে নতুন বাবু তো ঘুমের চোখে দারোগা বাবুকেই সাবিত্রী ভেবে জড়িয়ে ধরার উপক্রম। সেই যে মহাভারতের বিরাট রাজার শালা কীচক ভীমকে দ্রৌপদী ভেবে সোহাগ করতে গিয়েছিলো না, তেমনি।

এদিকে কী আশ্চর্য যোগাযোগ ছাখো। ঐ দারোগাবাবুর উপর এই মাল ধরারই তদন্ত। শেষ পর্যন্ত অনেক ঝাপটা ঝাপটির পর সাবিত্রীর সাহায্যেই তো হাতকড়ার অভাবে দড়ি দিয়ে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধলেন দারোগাবাবু। সাবিত্রী রাণী তো থ একেবারে। দিল্লীর এজেন্ট না কচু, ব্যাটা দিন দশেক আগে পঞ্চাশ হাজার টাকা ভেঙে আসানসোল না বর্ধমান থেকে এখানে এসে ঘাপটি মেরে বসেছিলো। স্যুটকেশের জামাকাপড়ের নিচে রাশি রাশি একশ' টাকা দশটাকা, পাঁচটাকার নতুন বাণ্ডেল।

বললাম, সাবিত্রীর ফাঁড়া কাটলো কিভাবে কমলরাণী, তাকে ধরেনি ?

কমলরাণী বললো, না, সাবিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো দারোগাবাবু নিজেই। এমন করে কেস সাজিয়ে দিয়েছিলো, সাবির গায়ে আঁচড়টি লাগে নি। আসলে, হাজার হলেও পিরিতের মেয়েমানুষ তো! সেই থেকে স্যুটকেশ বা চামড়ার ব্যাগওয়ালা বাবু ঘরে বসায়না সাবিত্রী। এমন কি তার নাম সত্যবান হলেও নয়।

বললাম—তাজ্জব তো!

কমলরাণী বললো, শুনুন তাহলে। ময়নার ঘরে সেবার এক ঘটনা ঘটলো। আমি তখন প্রায় নতুন এসেচি এবাড়ীতে। রাত দশটার সময় দুই

বাবু এলো ময়নার ঘরে। একজন বড়, বছর চল্লিশেক বয়স, আর একজন ছোট, বছর সতেরো আঠারো। বড়টি নাকি ছোটটির মাসতুত দাদা। হাতে খড়ি দিতে এনেছিলো। বিপুল টাকার মালিক। বাপঠাকুর্দার মরচে পড়া টাকার সদ্ব্যবহার করতে হবে তো। তা ছোকরা সেই যে ঘরে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে রইলো আর সহজে মাথা তোলে না। মদের গেলাসও ধরে না। মাসতুত দাদা বুঝুচ্ছে, আরে এ যুগের ছেলে হয়ে তুই মদ খেতে ভয় পাস্! আরে তোদের বয়সে আমরা তো মদ দিয়ে মুখ ধুতাম রে। তুই যদি দুদিন বাদ বিলেত যাস্ সেখানে কি করবি, অ্যাঁ। তোকে তো সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে মদ খাস্না বলে। তুই বি, এ, পড়ছিস্ তুইতো নিশ্চয়ই জানিস দেবতারা যে সুধা পান করেন আসলে তা মদ ছাড়া আর কিছু নয়। আর মর্তে প্রাচীনকালে যে সোমরস পানের রেওয়াজ ছিলো তাও আসলে সুরা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে তোকে সোসাইটিতে মিশতে হলে গেঁয়ো সাজলে তো লোকে হাসবে রে মাণিক।

তারপর মাণিককে পাঁচ রকম বুঝিয়ে তো মদ খাওয়ানো হলো। মাসতুত দাদা ময়নাকে ইসারা করে বললে ছোকরাকে একটু তৈরী করে দিতে। তৈরী করে দিতে ময়না তো ওস্তাদ। শুনেছিলাম, ময়নাকে ওর স্বামীর কাছ থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ছিলো ময়না। নতুন বিয়ে হয়েছে। অবস্থাপন্ন ঘর। একদিন ডাকাত পড়লো। ডাকাতেরা ওর স্বামী শ্বশুরকে বেঁধে রেখে দেরাজ সিন্দুক ভেঙ্গে সব টাকা পয়সা নিলো। ময়নার গায়ে এক গা গয়না। ময়না সব খুলে দিলো। নতুন ডিজাইনের কানপাশা জোড়া খুলতে দেরী হয়েছিলো বলে এক পাষণ্ড টান মেরে ছিঁড়ে নিলো। রক্তে সারা কাঁধ, কাঁধের জামা কাপড় ভিজে গেলো। একটু কাঁদে নি। কিন্তু পাষণ্ডেরা তাতেও খুশী হয় নি। মুখে কাপড় গুঁজে ওকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে পালালো। পরদিন পাশের বাঁশ বাগানে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া গেলো। কিন্তু ঠাঁই হলোনা সমাজে। যে মেয়েকে ওর সমাজ রক্ষা করতে পারলোনা, তাকে আস্তাকুঁড়ে ঠেলে ফেলতে বাঁধলো না ওর শ্বশুরের, সমাজ কর্তাদের। স্বামীও তাতে সায় দিলো। কত কান্নাকাটি করেছিলো ময়না, কিন্তু কারও দয়া হয়নি। সেই থেকে ওর

ধারণা যে সমাজ ওর উপর এত অত্যাচার করেছে, ঘরে ঠাঁই দেয়নি সে সমাজের উপর ওর ভালবাসা কিসের! যেমন এক শ্রেণীর টি. বি. রোগী বা খারাপ রোগের রোগী থাকে তারা জেনে শুনেই পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। মনে ভাবে, আমার মতো ওদেরও সর্বনাশ হোক্। এও সেইরকম একটা প্রতিশোধ স্পৃহা।

কাজেই ময়না যে মাসখুত ছোটভাইকে তৈরী করতে স্বীকার করবে এতে আর আশ্চর্য কি। বিশেষ করে বড় মাসতুত দাদা ইঙ্গিতে মোটা বকসিসের লোভ দেখিয়ে দিয়েছিলো।

ময়না নিজের হাতে গেলাসে মদ ঢেলে কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে মদের গেলাস মুখে ধরেছিলো।

না, না করে উঠেছিলো ছোট ভাই।

কিন্তু ময়নার বিলোল কটাক্ষ ও দেহের উত্তাপ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে জয় করে ফেলেছিলো। একটু পরেই নেশা ধরেছিলো। এরপর আর বাকী পথে চলতে একটুও কষ্ট হয় নি ছোকরার। বড় মাসতুত ভাই আরও একজন সঙ্গিনী নিজের জন্য আনতে বলেছিলো। হাজার হলেও ছোট মাসতুত ভাই যার গলা জড়িয়ে ধরেছে তার সঙ্গে তো আর ফষ্টি-নষ্টি চলে না! সঙ্গিনী আনতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলো ময়না। পাশের ঘরের বুলবুলকে ডাকতে যেয়ে দেখে তার ঘরে মানুষ। তার পাশের ঘরেও তাই। অবশেষে কোণের ঘরের রুক্মিণীকে নিয়ে এসেছিলো। একটু দেরীও যে না হয়েছিলো তা নয়। ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখে বড় মাসতুত ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত ছোরা। ছোট ভাই হুমড়ি খেয়ে বিছানায় পড়ে। আর ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত তখনও সারা ঘর ভাসিয়ে চলেছে। আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলো দুজনে। কিন্তু বুদ্ধি হারায়নি ময়না। চট করে শেকল তুলে দিয়ে, চেঁচিয়ে উঠেছিলো। বাড়ীর সবাই আমরা ছুটে গিয়েছিলাম। পুলিশও এসেছিলো একটু পর। কিন্তু আসামীকে পাওয়া যায় নি। পেছনের দিকের জানালার শিক বাঁকিয়ে জলের পাইপ বেয়ে পালিয়ে গেছে বড় মাসতুত ভাই।

ময়নাকেও আটকে ছিলো পুলিশ। খুনের ব্যাপারে ময়নার যোগসাজশ

ল্যাছে এই সন্দেহে। জানালা ভাঙ্গা ব্যাপারটা না থাকলে ময়নার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না।

অনেক দিন পর আসামী ধরা পড়ে। ছোট মাসীমাই কেমন করে ডিটেকটিভ্ লাগিয়ে ধরিয়ে দেয়। সেশন কোর্টে বিচার চলে দেড় বছর ধরে। তারপর ময়না খালাশ পায়। তারপর থেকেই ময়না যেন কেমন হয়ে গেলো। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো ময়না নেই। অনেক পরে শুনেছি কাশী না বৃন্দাবনে ভগবানের নাম নিয়ে ভিক্ষে করে খায়।

দ্বিজপদ বলতো, যাই বলো ভায়া, এই হতভাগীদের মতো এমন সর্বংসহা দেখবে না তুমি। এরা ধরিত্রীর মতো। সম্বল মাত্র যৌবনের কয়েকটি বছর। সেই কটা বছর ভাঙিয়েই এদের খেতে হয়। এরা ভালোই জানে যৌবন ফুরুলে এদের কদর গেলো। সেই যে, 'ভিক্ষে দাও গো ব্রজবাসী, রাধা কৃষ্ণ বল মন, আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী এসেছি বৃন্দাবন'—সেই আর কি। বুড়ো বয়সে ভিক্ষে নতুবা পরের বাড়ীর ঝি-গিরি করে খেতে হবে। মেয়ে-টেয়ে থাকলে অবশ্য একেবারে জলে পড়ে না। তা এত মদ ভাঙ খেলে তো আর সহজে মেয়ে হয় না। অনেকে কুড়ানো মেয়ে পোষে বটে, কিন্তু তা আর ক'জন। অবশ্য দু-চার জন থাকে ভাগ্য ভালো থাকলে সময় কালে দু পয়সা জমাতে পারলে শেষ জীবনে কষ্ট হয় না। কেউ কেউ বাড়ীওয়ালী হয়েও বসে।

কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এদের জন্য আইন অবশ্য হয়েছে কিন্তু আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নি। অথচ এই কলকাতা সহরে এদের সংখ্যা কম নয়। শ্রীপান্থের বর্ণনা অনুসারে ১৮৫৩ সালে এদের সংখ্যা বারো হাজার চার শ' বারো জন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুলীন ঘরের মেয়ে। একশ' বছর আগেও তিরিশ হাজার। এই বিংশ শতাব্দীতে এদের সংখ্যা নির্ণয় দুঃসাধ্য। এদের সম্পর্কে যে কেউ ভাবেন না, তা নয়। সরকারও ভাবেন। ভাবছেনও। এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কথাও শুনেছি কিন্তু ঐ কাগজে কলমে।

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব বোধই এদের আরও অপরাধ প্রবণ করে তোলে। আইনকে ফাঁকী দেওয়া শেখায়।

তাই এরা যৌবনের সদ্ব্যবহার করতে চায় যেন তেন প্রকারে। এখানে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেহদান করা হয়। যে যতটা পারে রোজগার করার চেষ্টা করে। তা সে ভালবাসার ভান করেই হোক, চোখ ধাঁধানো সাজ সজ্জা করেই হোক। ফাঁক পেলে খদ্দেরের গলায় ছুরী চালাতেও এদের বাঁধে না। তোমাদের কালিদাস সম্পর্কে তো এই রকমই একটা কিংবদন্তি আছে, না হে!

এটা সত্যি, এখানে সত্যিকারের ভালবাসা দুর্লভ। ভাল মানুষীও দুর্লভ। তবে একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। যদি কোন সময় এদের হৃদয়ে কারও প্রতি প্রেম জাগে, সে প্রেমের গলা টিপে মারারই রেওয়াজ। তোমাদের শরৎ চাটুজ্যে মশাইয়ের 'আঁধারের আলোয়' বিজলী, 'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী এ সম্পর্কে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বারবণিতারা জানে ওই ফাঁদে পা দিলে তাদের রোজিরোজগারে ভাঁটা পড়বে। ভালবাসা দেহের ব্যবসায়ে ক্ষতির পরিমাপক। তবে ঐ যে বললাম, এ ভালবাসা দুর্লভ হতে পারে কিন্তু দুষ্প্রাপ্য নয়। উর্বশীরাও পুরূরবার প্রেমে পড়ে। কোন কোন সময় বারবনিতাদের কেউ কেউ ভালবাসার নাগরের হাত ধরে এখান থেকে বেরিয়েও যায়। কিন্তু আবার ফিরেও আসে। যেমনটা জেলঘুঘুরা জেলে গেলেই ভালো থাকে, বাইরের সমাজে চলতে তাদের কষ্ট হয় স্বাভাবিক ভাবে। এরাও তেমনি।

হেসে বলেছিলাম, ত্যাখো চৌধুরী তোমাদের ঐ সর্বংসহাদের কীর্তিও আছে। কিছুদিন আগে কী একটা পত্রিকায় যেন দেখেছিলাম, কলিকাতায় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর বারবণিতা ব্ল্যাকমেলিং শুরু করেছে। তারা কৌশলে ঐ সব সজ্জন ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করে তাঁদের নামে মিথ্যা অভিযোগ আনতে থাকে, ঐ সব ব্যক্তি নাকি তাদের ঘরে যায়, এবং প্রাপ্য টাকা না মিটিয়ে বিবিধ প্রকার লাঞ্চনা করে। সম্মান রক্ষার খাতিরে ঐ সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অর্থ দিয়ে ঐ সব বারবণিতার মুখ বন্ধ করার প্রয়াস পেতে থাকেন। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা উপরে আবেদন করেন। ফলে ঐ শ্রেণীর বারবণিতাদের চাতুরী ধরা পড়ে। এমনকি একটা আইনও নাকি পাশ হয় যাতে করে কোন বারবণিতা কোন সজ্জন ধনী ব্যক্তির

নামে ঐ ধরণের নালিশ করলে তদন্ত না করে তা আদালতে উত্থাপিত হবে না। ঘটনাটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঘটেছিলো।

চৌধুরী বললো, সে তো সত্যি কথা ভায়া। ভালো মন্দ তো আছেই। এই যে আমরা যারা দালালী করি, আমরা কি আর মাঝে মাঝে সোনা বলে পেতল চালাইনে! চালাই। ধরাও পড়ি। প্যাদানিও খাই।

এই তো কিছুদিন আগে এক বিয়ে পাগলা বুড়োকে এক বারবণিতা কনে দেখিয়ে দু'পয়সা কামালাম। এমন কি বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলাম হে। বুড়ো তো মামলা মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে কত হম্বিতম্বি। তবে নিজের সম্মানের ভয়ে শেষ পর্যন্ত আর এগোয় নি।

বললাম, তা দালালী না করলেই পারো চৌধুরী!

চৌধুরী বলেছিলো, অভাব থেকে স্থরু করেছিলাম ভায়া এখন স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। আগে যদিও এপাড়া চেষ্টা করলে ছাড়তেও বা পারতাম, এখন আর পারিনে। কেন পারিনে কমলরাণীকে জিজ্ঞেস করো। নিজ মুখে আর নিজের কেচ্ছা কত বলবো ভায়া যদি কিছু শুনতেই চাও তবে এক পাত্তর মদের দাম বের কর, বেশ্যাবাড়ীর উল্ট পুরাণ শুনিয়ে দোব'খন। না, হুইস্কি, রাম দরকার নেই। মা-কালী মার্কা ধেনো হলেই চলবে। হবে নাকি বাওয়া!

কমলরাণীর ঘরে সেদিন এসেছিল নতুনদি। কমলরাণীর নতুন দি। কমলরাণীই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। কমলরাণী যদি আমার কিছু উপকার করে থাকে তবে একদিন সাতটাকা ধার দিয়ে নয় (টাকাটা আজও আমি শোধ করিনি), তার এই নতুনদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে।

বেশ্যাবৃত্তিটাকে এমন করে ভালবাসতে আমি আর কোন বেশ্যাকে দেখিনি। আমরা অনেকেই নিজ নিজ প্রোফেশনকে শ্রদ্ধা করিনে, ভালবাসিনে। এমনকি বাংলা দেশে জন্মেছি বলেও আমাদের নিজেদের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা। ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পর্যন্ত আমাদের অনেকের লজ্জা।

সুন্দর ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। একটু ভারিক্কা চেহারা। আর তাতেই যেন তাকে আরও অধিক মানিয়েছে। এখানকার নাম স্বর্ণ। স্বর্ণাই বটে। ক'দিনই বা সে এখানে এসেচে। এরই মধ্যে সে সবদিকে মানিয়ে নিয়েছে। আচারে ব্যবহারে মার্জিত। ওর ঘরেও আমি গেছি সারা ঘরটাতে একটা লক্ষ্মী শ্রী। লক্ষ্মী শ্রী স্বর্ণের দেহে, তার পোশাক আশাকে। কোথাও উগ্রতার লেশমাত্র নেই। বাৎসায়নের কামসূত্রে যে চিত্রানী নারীর বর্ণনা আছে, স্বর্ণা সেই চিত্রানী। না শঙ্খিনী আর চিত্রানীর সংমিশ্রণ।

নিজের বৃত্তি সম্পর্কে ও পূর্ণ সচেতন। এ সম্পর্কে ওর পড়াশোনাও যথেষ্ট। অন্য একদিন কমলরাণীর ঘরে দ্বিজু চৌধুরী, আমি আর কমলরাণী নাট্যশালা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম তার সূত্র ধরেই বললো স্বর্ণ, আপনাদের উনবিংশ শতকের নাট্যশালাকে তো আমরাও বাঁচিয়ে রেখেছি রায়মশাই। এজন্যে আমরা কবি মাইকেল মধুসূদনের কাছে কৃতজ্ঞ। ১৮৭৩ সালে তিনি প্রস্তাব করেন রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকদের এখন থেকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হোক। প্রস্তাব থেকেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চ পেয়েছে চৈতন্যলীলার বিনোদিনীকে, রিজিয়ারূপিনী তারাসুন্দরীকে, পেয়েছে কুসুমকুমারীকে, সুকুমারী, ক্ষেত্রমণি, সরোজিনী, তিন-কড়িকে। অবশ্য এর আগেও স্ত্রীলোকদের নিয়ে যে অভিনয় হয় নি তা নয়। গিরিশবাবুর নিজের হাতে তৈরী ছিলেন বিনোদিনী। এমন অভিনেত্রী যে কোন দেশের রঙ্গমঞ্চের পক্ষে গৌরবের। চৈতন্যলীলা দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর পরমহংসদেব। অভিনয় দেখে সমাধিস্থ হয়েছিলেন ধন্য হয়েছিলো বাংলার রঙ্গমঞ্চ। বিনোদিনীর 'মনোরমা' যিনি দেখেছেন তিনি ভুলতে পারবেন না। অপরেশবাবু লিখেছেন সেই 'আমি পুকুরে হাঁস দেখিগে গো'র তুলনা হয় না।

আর তারাসুন্দরী। তাঁকে বাদ দিয়ে কোলকাতার কোন্ বড় নাট্যশালা নাম করেছে সে যুগে! অমৃতলাল মিত্র মশাই নতুন ষ্টার কিনলেন চারজনে মিলে। এই অমৃতলালের ছাত্রী তারাসুন্দরী। ওদিকে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর মন্ত্রশিষ্যা। 'ইউনিক' থিয়েটারে ডি. এল. রায়ের 'তারাবাই' নাটক তখন জমজমাট। পৃথ্বীরাজ সেজেচেন দানীবাবু। আর তারাবাই?

বললাম, কে?

গর্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলো স্বর্ণ, কে আবার, তারাসুন্দরী। তমদার ভূমিকায় প্রকাশমণি !

অরোরা থিয়েটারে 'রিজিয়া'। নাম ভূমিকায় তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীর শ্রেষ্ঠ অভিনয় রিজিয়া। একসময় রিজিয়া বলতে এদেশী দর্শক নাট্য-সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীকেই বুঝতো। বলেছিলাম না, বিপিন পাল মশাই, এই অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে, মিনার্ভা থিয়েটারের এক সভায় নাকি বলেছিলেন, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে 'তারা'র রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই।

স্বর্ণ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো, শুধু কি তাই, মিনার্ভাতে প্রতাপাদিত্য খোলা হলো। বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় স্বয়ং অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী। শঙ্করের ভূমিকায় অপরেশ মুখার্জি। আর কল্যাণী সাজলেন তারাসুন্দরী। স্টারে প্রতাপাদিত্য চলা সত্ত্বেও এই বইয়ের বিক্রী তখনকার দিনে হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিলো এক রাত্রিতে। যেখানে জটিল পার্ট, ডাকো তারাসুন্দরীকে। নায়িকার পার্ট তাও তারাসুন্দরীর। মিনার্ভায় গিরিশ ঘোষের হরগৌরীর গৌরী তারাসুন্দরী। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র মহাদেব।

বলিদান নাটকে সরস্বতী তারাসুন্দরী। যশোমতী সরোজিনী। রাজলক্ষ্মী নগেন্দ্রবালা। কিরণময়ী কিরণবালা। হিরণ্ময়ী চারুবালা। ঝি চপলা সুন্দরী। জোবীর ভূমিকায় সুশীলা সুন্দরী।

একবার তো বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছাড়াই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে বিপরীতধর্মী দুই ভূমিকায় তাজ্জব খেল দেখিয়ে দিলেন তারাসুন্দরী।

বললাম, তাই নাকি। বলে ফেলুন দেখি। আপনি তো বেশ পড়াশোনা করেছেন দেখছি এবিষয়ে !

নতুনদি বললো, জানেনই তো পণ্ডিতেরই বউ ছিলাম। বিরাট লাইব্রেরী ছিলো বাড়ীতে। যাক্ সেকথা, চলুন আমার বইয়ের কালেকশন দেখাবো।

কমলরাণী হেসে বললো, তাই ভালো। এবার পণ্ডিতে পণ্ডিতে জমবে গো নতুনদি !

স্বর্ণের ঘরে এসে নতুন কেনা সোফায় বসে কফি খেতে খেতে বললাম, হ্যাঁ, তারাসুন্দরীর কথা বলুন এবার।

স্বর্ণ বললো, বলুন নয়, বল। বয়সে আপনার থেকে আমি ছোটই হবো। কিন্তু আজ থাক। আজ এই বইপত্তর গুলো দেখুন, গল্প গুজব করুন। ভালো কথা, বলুন, আর কী খাবেন!

বললাম, আচ্ছা স্বর্ণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। তোমার পুরানো দিনগুলো তোমার মনে হানা দেয় না?

স্বর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, দেয়না বললে মিথ্যে বলা হবে। ছেলেটার কথা মনে পড়ে। অবৈধ সন্তান হলে কি হবে, আমার তো নাড়ী ছেঁড়া ধন, সতুবাবু। আর অবৈধদের প্রতি মায়ের স্নেহের কি অন্ত আছে! কুন্তী কুমারী অবস্থায় সূর্যের ভজনা করে কর্ণকে পেলেন। লোকলজ্জার ভয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই ছেলে বসুদেব কর্ণ অধিরথের পুত্র হিসেবে যখন কুরুপাণ্ডবের অস্ত্র পরীক্ষার দিন হাজির হলো, কুন্তী দেবী তাকে চিনতে পেরে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। রক্তের টান যাবে কোথায় বলুন!

বললাম, তোমার সে ছেলে কোথায় স্বর্ণ।

স্বর্ণ ম্লানমুখে বলল, বাঁচাতে পারিনি আমি। ও চলে যাবার পর খোকাকে নিয়ে আমি এখানে সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগলাম! দু'এক জায়গায় চাকরীও হলো কিন্তু বড় সাহেব ছোট সাহেবের মন রেখে চলতে হবে যে। তাতেও আপত্তি ছিলোনা আমার। আর তা ছাড়া উপায়ও ছিলো না। কিন্তু তিলত্তমাকে নিয়ে সুন্দ উপসুন্দের লড়াই আরম্ভ হয়ে গেলো। ছোট সাহেবের ঘরে যদি পাঁচবার ডাক পড়ে, বড় সাহেবের ঘরে দশবার। তা ছোট সাহেব সাহেব হিসাবেও ছোট, বয়সেও ছোট। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বুড়োর সঙ্গে ছোকরা পারবে কেন? হাজার হলেও বড় সাহেব। ছোট সাহেবকে আন্দামান না শিলচর কোথায় যেন বদলী করে দেওয়া হলো। এবার বুড়ো তো দিনে দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করলো। সারাদিন প্রায় বুড়োর কামরায় থাকতে হয়। বেয়ারাটাকে বলে দেওয়া ছিলো, ঐ সময় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তা করতোও না। ঢিঢি যা পড়েছিলো সে সারা অফিসময়। কান পাতার উপায় ছিলো না। বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে ছোকরা কেরাণী পর্যন্ত, থানকী ছাড়া কথা বলতো না। প্রথম প্রথম বুঝতাম না। পরে শুনলাম, আমার পূর্ব জীবনের ইতিহাস কী করে সংগ্রহ করা

হয়েছে। আগেই বলেছি, ঐ বুড়োর ঘরে থাকলে কেউ বিরক্ত করতো না। শত কাজ ভেসে গেলেও না। কিন্তু একদিন বিরক্ত করলো। বিরক্ত করলো বুড়োর স্ত্রী। সোজা ঘরে ঢুকে নাকি আমাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছিলো। তা আশ্চর্য কি। বুড়ো তো আর আগ ঢাক রেখে কাজ করতো না শেষ দিকে। তার পরের অবস্থার সবটা আমার মনে নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে, বেয়ারাটা যখন জলের ছিট দিয়ে দিয়ে জ্ঞান ফেরাচ্ছিলো তখন অফিসে আর কোন জনপ্রাণী ছিলো না।

হাতে যা পয়সা ছিলো তাতে মাস খানেক চলেছিলো। এমনি সময় খোকা অসুখে পড়লো। ঔষধ পথ্য যোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। একটা বস্তিতে থাকি। কাজে গেলে খোকাকে দেখবে কে? আর কাজই বা কোথায়! দু একজন হিতৈষী খোঁজ খবর নিতে আসতে লাগলো বটে, কিন্তু তারা আসলে যা চাইতো তা বুঝতে বাকী ছিল না আমার। কিছু কিছু লুকিয়ে চুরিয়ে রোজগার হতো, কিন্তু বাদ সাধলো পাড়ার লোক। একদিন এক খদ্দেরের সঙ্গে হাতাহাতি চুলোচুলি রাস্তায় গড়ালো। পুলিশ এলো। সোজা চালান। কেউ শুনতে চাইলে না, ঘরে আমার অসুস্থ ছেলে। কোর্টের হাকিম নন্‌রেজিষ্টার্ড বলে সাজা দিলেন এক মাসের জেল। ফিরে এসে আর খোকাকে দেখতে পাই নি। সারা বস্তি খুঁজেও তার হদিশ পাই নি। আমার ঘরে নতুন ভাড়াটে বসেছে।

পাশের ঘরের ভাড়াটেরা সোজা বলে দিলে তারা কিছুই জানে না। আর এক ভাড়াটে বউ তো নাকের ডগার উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেই ফেললে, একটা বেশ্যার ছেলের কোন খবর তারা রাখে না।

তার পরের কাহিনী গতানুগতিক কাহিনী! এ ডাল থেকে ও-ডালে বসার কাহিনী। তারপর কোনদিন যে এখানে এসে দাঁড়ালাম তা যেন স্বপ্ন। না, এবার আর নন্‌রেজিষ্টার্ড নয়, রীতিমত নাম লেখানো, ডাক্তারী পরীক্ষা করানো সুবর্ণলতা। সুবি।

সুবর্ণের আলমারী থেকে যে বইটে এনেছিলাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত তা পড়লাম। প্রাচীন ভারতের বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কে লেখা। আশ্চর্য, প্রাচীন ভারতেও

তাহলে গনিকা-বৃত্তি ছিলো! অবশ্য অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে মাতৃ কেন্দ্রিক শাসন ছিলো। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের ভল্গা থেকে গঙ্গা বইতেও দেখেছি, নরনারীর যৌন লীলায় কোন বিধি নিষেধ ছিলো না। তাদের সম্পর্ক পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী হিসেবে গণ্য করার চেয়ে নর ও নারী এই পরিচয়ই বড় ছিলো। তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য জনসংখ্যা হ্রাস পেতো। হিংস্র প্রাণীর হাতে আকছার মানুষ নিহত হতো। ফলে যেন তেন প্রকারে বংশবৃদ্ধিই ছিলো একমাত্র কাম্য। ফলে যে যাকে ইচ্ছা তার সঙ্গেই যৌন সংযোগ করতো।

তখন সমাজ ব্যবস্থা দানা বেঁধে ওঠে নি। বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলো। মনীষী রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতো সে যুগ নিশার যুগ। আগুনের ব্যবহার তখন জানা ছিলো না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে, ব্রহ্মা (প্রজাপতি) সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বীয় কন্যাকে বিয়ে করলেন।

বিষ্ণু পুরাণে এ কথার স্বীকৃতি আছে।

মৎস্য পুরাণেও প্রজাপতি ব্রহ্মার এবংবিধ মহান উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত আছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিবংশ থেকে উল্লেখ করেছেন, বিশিষ্ট প্রজাপতির কন্যা ছিলেন শতরূপা; বয়ঃ প্রাপ্তির পর শতরূপা হলেন বিশিষ্ট প্রজাপতির পত্নী। মহর্ষি মনু বিয়ে করলেন নিজের মেয়ে ইলাকে, জহ্নুর সঙ্গে বিয়ে হলো জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী গঙ্গার।

দেবীপ্রসাদবাবু হরি বংশ থেকে এর চেয়ে জটিলতর কাহিনী উল্লেখ করেছেন, দশ ভাই প্রচেতা (প্রজাপতি বিশেষ) মিলে এক পুত্রের জন্ম দিলেন।

সেই পুত্রের নাম হল সোম। এই সোমের কন্যার নাম মরীশা। 'মরীশার গর্ভে এবং দশ ভাই প্রচেতা ও সোমের ঔরশে যে পুত্র জন্মালো তার নাম দক্ষ প্রজাপতি।'

এই দক্ষ প্রজাপতির সাতাশটি কন্যা। 'সন্তান উৎপাদনের জন্য সাতাশ জনকেই উপহার দিলেন পিতা সোমের কাছে।'

ব্যাসদেব কৃত মহাভারতে একটি কাহিনী পাওয়া যায়, তাতে, ব্রহ্মার

প্রজা সৃষ্টির উল্লেখে আছে, ব্রহ্মার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধ আঙ্গুলী থেকে জন্ম হলো দক্ষের। ব্রহ্মার বাম পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলী থেকে জন্ম হলো কন্যার। 'দুজনের মিলনে যাটটি মেয়ে জন্মালো। দক্ষের দুই ভাই ছিলেন। মরীচ ও ধর্ম। যাটটি মেয়ের মধ্যে দশটিকে বিয়ে করলেন ধর্ম, মরীচির ছেলে কশ্যপ বিয়ে করলেন সতেরোটিকে।'

যৌনমনস্তত্ত্বে ইলেকট্রা কম্প্লেক্স ও ইডিপাশ কম্প্লেক্স বলে দুটো কথা আছে। পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্রের কাহিনী থেকে এর সৃষ্টি। গ্রীস দেশীয় এই কাহিনীতে কন্যার প্রতি পিতার, মাতার প্রতি পুত্রের আসক্তির কথার উল্লেখ আছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে এক উদাহরণ তুলে দেবীপ্রসাদ বলেছেন, প্রজাপতির এক কন্যার নাম সীতাসাবিত্রী আর এক কন্যার নাম শ্রদ্ধা এবং প্রজাপতির পুত্রের নাম ছিল সোম।

মজার কথা শ্রীমতী সীতাসাবিত্রী সোমকে পেতে চাইলেন। কিন্তু ওদিকে সোমের আকর্ষণ শ্রদ্ধার দিকে।

'পরশুরাম' মশাইর গল্পটা মনে পড়লো। ইণ্টারনাল ট্রাংগ্ল নয়, হেক্সাগন। হারিত, লারিত, জারিত, সমিতা, জমিতা, তমিতা। যে যাকে চায়, সে অপর জনের অনুরাগী। যেমন জমিতা চায় লারিতকে, লারিত চায় তমিতাকে, তমিতা চায় হারিতকে, হারিত চায় সমিতাকে, সমিতা চায় জারিতকে জারিত চায় জমিতাকে।

বুঝুন এবার অবস্থাটি। যাহোক পিতা প্রজাপতির অনুগ্রহে বশীকরণ মাদুলির সাহায্যে (জলন্ধরের কি ?) সীতা-সাবিত্রী সোমকে পতিরূপে লাভ করলেন। অন্য দেবতাদের ফাঁকি দিয়ে যৌন মিলন ঘটাবার জন্য প্রজাপতি হরিণ ও কন্যা হরিণীর ছদ্মবেশ ধারণ করেও পার পেলেন না।

ঋগ বেদের যৌন জীবনে যম ও ভগ্নী যমীর কাহিনী আছে। যমী ভ্রাতাকে পুরাতন নজীর উল্লেখ করিয়ে তাকে পতি হিসেবে পেতে চাইল।

মহাভারতের কালে কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ, বেদব্যাস কর্তৃক ভ্রাতৃবধূর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম বৃত্তান্ত সে যুগের অবাধ যৌনাচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদের দেশে মনুই সর্বপ্রথম ধর্মপ্রথা প্রবর্তনের জন্য নানারূপ নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে পুরোহিতেরা প্রয়োজন বোধে, নিজেদের সুবিধে মতো নিয়মকানুন পাল্টান। সংশোধন করেন। সংযোজন করেন। পরিবর্ধন পরিবর্জনও করেন।

যৌন মিলনের অখণ্ড সুযোগ ছিলো সে যুগে। তবু সমাজে বারবণিতা ছিলো। গণিকাবৃত্তি ছিলো। গণিকার স্থানও স্বীকৃত ছিলো।

যুগ এগিয়ে গেলো। সমাজ বন্ধনযুক্ত হলো। নানারকম বিধিনিষেধ সৃষ্টি হলো। মনু স্মৃতিতে দেখি যৌন স্বেচ্ছাচারীদের জন্য নানারকম শাস্তি ব্যবস্থার প্রচলন। বিয়ের পর বিবাহিতা রমণী পরপুরুষে গমন করলে সাজার ব্যবস্থা ছিলো। সে যুগের পুরুষ ব্যাভিচারিতার মামলা আদালতে আনতো না। নালিশ আসতো সমাজ কর্তাদের দরবারে। শাস্তি ছিলো কুকুর দিয়ে কামড়ানো। মাটিতে পুঁতে কিনা কে জানে। পরবর্তীকালে রাজারা, নবাবেরা এমন সুন্দর শাস্তিপদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিলো। রাজা বিক্রমাদিত্য লক্ষহীরাকে ব্যাভিচারিণী হতে দেখে এই ভয়ই দেখিয়েছিলেন। মোগল যুগেও এ শাস্তির কথা শোনা যায় এমন কি অনেক জমিদার বাবুও এই ধরণের শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন।

তবে সমাজে সাতখুন মাপ করার ব্যবস্থা ছিলো। যদি উচ্চবর্ণের নারী শূদ্রের সঙ্গে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করতেন তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হতো না। এ ব্যাপারে সেই রমণীর সানন্দ স্বীকৃতি থাকা চাই।

এর পরে বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে সমাজ কর্তারা নতুন দণ্ডবিধি প্রণয়ন করলেন। যৌন ব্যাভিচার জনিত অপরাধ সম্পর্কে শাস্তি লঘু করার ব্যবস্থা হলো। কোন নারী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অত্যাচারিতা হলে, অপহৃতা হলে তাকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করার ব্যবস্থা অনুমোদন করা হলো। (হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে বা পূর্ববঙ্গে পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত হিন্দু নারী পাষণ্ডদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলো পণ্ডিতগণ তাদের সমাজে গ্রহণ করার নির্দেশ সম্ভবতঃ এই নিয়ম বলেই দিয়ে থাকবেন)। কারণ নারী এ সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু সমাজের স্বীকৃতি পেলেও এই সব নারীদের অনেকে মনের দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়তো। তাদের সেই

পূর্ব প্রতিষ্ঠার বদলে তাদের করুণার পাত্র হয়েই বাস করতে হয়। স্বামী শ্বশুররাও সর্বক্ষেত্রে তাদের গৃহবধূকে সসম্মানে গৃহে প্রতিষ্ঠা করতো কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তা যদি না হবে, তাহলে পতিতালয়ে এই সব নারীদের ভিড় কিছু পরিমাণে কমতো।

এ ছাড়া নারীর দিক থেকে আত্মগ্লানির প্রশ্নও আছে। জরাসন্ধের 'মল্লিকা' পাঞ্জাবী ড্রাইভার দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলো। উদার স্বামী তাকে গ্রহণও করেছিলো। কিছুটা স্বাভাবিক নিরাপত্তার ভাবও ফিরে এসেছিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে ঐ ধর্ষণের ফল ফললো, আত্মীয়রা কটাক্ষ করতে লাগলো, তখনই তার মানসিক স্থৈর্য হারালো। বাচ্চাটাকে খুন করলো।

আর একটি কাহিনী শুনেছিলাম। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক কোলকাতায় চাকরী করতেন। দেশের বাড়ীতে নতুন বিয়ে করা বউ, বাপ-মা থাকতেন।

· পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একদিন রাত্রে বাড়ীতে দস্যুরা আক্রমণ করে। বৃদ্ধ শ্বশুরকে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখে তাঁর চোখের সামনে বধূর উপর পর পর অত্যাচার করে। বধূটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরদিন শ্বশুর বউকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্বামী কোলকাতাতে সংবাদ পেয়ে দেশে যায়। স্ত্রীকে খুঁজে বের করে তাকে সংসারে ফিরে আনে কিন্তু বাপ সমাজের দোহাই দিয়ে পুত্রকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। উদার স্বভাব পুত্র বলে, যে সমাজ তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি, সে সমাজের কোন অধিকার নেই সেই স্ত্রীকে সমাজচ্যুত করার। এ নিয়ে বাপের সঙ্গে পুত্রের কথা কাটাকাটি হয়। পুত্র স্ত্রীকে নিয়ে কোলকাতা চলে আসে। নতুন বাসা করে। স্ত্রীকে বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বধূটির আচ্ছন্নভাব কিছুতেই যায়না। স্বামীর আদরে আগের মতো সাড়াও দিতে পারে না। কেমন যেন একটা পাপবোধ তাকে পীড়ন করতে থাকে। কী করে যেন অন্য ভাড়াটেরা ব্যাপারটা টের পায়। কে জানে এ নিয়ে কোন আকার ইঙ্গিত, কটাক্ষ তারা করেছিলো কিনা। একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে যথা-রীতি স্ত্রীকে দরজা খুলতে বলে। কিন্তু বিস্তর ডাকাডাকিতেও ভিতর থেকে কোন সাড়া আসে না। অবশেষে বাড়ীওয়ালার অনুমতি নিয়ে দরজা ভাঙা

হলো। দরজার এক পাশে পরণের কাপড়ে ফাঁস আটকিয়ে ঝুলছে বউটা। না, হতভাগিনী স্নায়ু যুদ্ধে পরাজিত হয়েই একাজ করেছে। একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে, এই অপবিত্র দেহ নিয়ে স্বামীর পুজো করতে তার সমস্ত বিবেক বুদ্ধি প্রতিনিয়ত তাকে বিছের কামড়ের মতো জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয়।

প্রাচীন ভারতে অসহায়া নারী ধর্ষিতা হলে সমাজে ফিরিয়ে নেবার অনুমোদন ছিলো। তবে পরের মাসিকের দিন পর্যন্ত এজন্য অপেক্ষা করতে হতো। সম্ভবত, এই ধারণা বশেই এটা করা হতো, নারীর পক্ষে অনিচ্ছাকৃত রমণের ফলে সন্তান ধারণ ঘটে না। [আধুনিক যৌন বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে না। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ঋতুপর্বের উর্বর সময়ে বিশেষ করে, যৌন-মিলন ঘটলে গর্ভ হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।] অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিলো। উদারতাও ছিলো। কোন নারী স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের দ্বারা রমিতা হয়ে সন্তান ধারণ করলে, প্রসবের পর ঋতুস্নান করলে স্বামী তাকে গৃহে ফিরিয়ে নিতো। তবে সব সমাজে এর প্রচলন ছিলো কিনা এ সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

অষ্টাদশ শতক উনবিংশ শতকে কোন কোন সমাজে 'গুরুপ্রসাদী' বলে একটা প্রথা ছিলো আমাদের দেশে। কুমারী কন্যা বিয়ের যোগ্যা হলে, অভিভাবক নানা উপঢৌকন দিয়ে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। গুরুদেব যথাবিহিত গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরের সঙ্গে ঐ কুমারীর সঙ্গে যৌনমিলন ঘটিয়ে তাকে 'প্রসাদ' করে দিতেন। ফেরৎ আনার সময়ও অবস্থানুসারে উপঢৌকন দিতে হতো, গুরুদেবের এবংবিধ উপকারের জন্য। যারা এই উপঢৌকন দিতে পারত না, তাদের কন্যাদের অপেক্ষা করতে হতো। কন্যা ফেরৎনেবার সময় দেনাপাওনা না মিটলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কন্যা গুরুদেবের গৃহে আটক থাকতো। ঐ সময় আরও প্রসাদী হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ হতো কিনা কে জানে।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পুর্বে পিতৃগৃহেই অনুষ্ঠান সহকারে গুরুপ্রসাদী হবার ব্যবস্থা হতো। অবশ্য এতে 'রিস্‌ক' যে একেবারে

ছিলো না তা নয়। কোন কোন দুর্বিনীত স্বামী (বেরসিক ত বটেই) এই মহৎ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে গুরুদেবকে লগুড়াঘাতে ঘায়েল করে নরকের পথ প্রশস্ত করতো। গুরুরাও ক্রমশঃ এই ধর্মজ্ঞানহীনদের আচরণে বিরক্ত হয়ে এই মহাপরোপকার ব্রত থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। এখনও মাঝে মাঝে যে গুরুশিষ্যা সংবাদ দু'চারটে নজরে পড়ে, সেও নেহাৎ যে সব গুরু পরোপকার করা জীবনের ধর্ম বলে মনে করেন তাদের! কারণ পরোপকার করা যাদের স্বভাব তারাতো অধম হতে পারেন না!

এ যুগের সমাজ ব্যবস্থা অনেক এগিয়েছে। অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুরমণী মুসলমানকে বিয়ে করেছে। হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করতে করতে বিলেত চলে গেছে, এমন একটা কাহিনীও আমার জানাশোনা পরিবারে ঘটেছে। অন্যদেরও প্রতিদিনকার জানা বহু কাহিনী আছে নিশ্চয়ই। শেষ পর্বে কী হয় জানিনে, প্রথম পর্বে, চাঁদ ফুলের মাসে যে এরা কপোত কপোতির মতো উচ্চবৃক্ষচূড়ে না হোক্‌, একতলা, দুতলা পাঁচতলায় সুখেই কাটায় এ সম্পর্কে অনুমান করার কারণ আছে। রক্ষণশীল পরিবারে দু'দশদিন এ নিয়ে একটু হৈ চৈ হয় বটে, (তেমন তেমন ক্ষেত্রে, 'রইলো তোমার বাড়ী চললুম আমরা আলাদা হয়ে' ছাড়া) পরে সে উত্তাল তরঙ্গ শান্ত হয়।

প্রাচীনকালে সমাজের উঁচু বংশে বিয়ে হয়েছে এমন শূদ্রজাতীয়া নারীকে ভাল চোখে দেখা হতো না। তাদের ব্যবহার করা হতো কেবল দেহের লালসা পরিতৃপ্তির জন্য।

বিষ্ণু সংহিতায় আছে :

দ্বিজস্য ভার্যা শূদ্রা তু ভবেৎ ক্বচিৎ
রত্যার্থমেব সা তস্য বারানৃষ্য প্রকীর্ত্তিতা।

কখন কখন কামনা ও লালসার সামগ্রীরূপে নীচ জাতীয়া শূদ্রাও বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভার্যা রূপে পরিগণিত হয়েছেন।

ফলে উচ্চবর্ণের মহাশয়দের পোয়া বারো ছিলো। লালসা পরিতৃপ্তির জন্য

অঢেল ব্যবস্থা ছিলো। প্রচুর সুযোগও ছিলো। ফলে প্রকৃত গণিকালয়ে যাবার দরকার বড় বেশী পড়তো না। যদি যেতো, সে সন্দেশ খেয়ে অরুচি হলে তেলেভাজা খেতে কেষ্ট বসুর দোকানে যাওয়ার মতো। অবশ্য উচ্চবর্ণের সব শ্রেণীই যে এ সুবিধে ষোল আনা, আজকালকার হিসেবে একশ' পয়সা পেতো তা নয়। ব্রাহ্মণ কুলতিলকগণ বেশী পেতেন। তাদের বেলায় অবারিত দ্বার। নৈবেদ্যর কলাটি সব সময় তাদের ভোগে। ক্ষত্রিয় বাবাজীরা কম কিসে। অর্থে, কৌলিন্যে, ক্ষমতায় এ বলে আমায় ছাখো, ও বলে আমায় ছাখো। সুতরাং তাদের চটানোও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং লায়নস শেয়ার না পেলেও সুবিধের টাইগার্স শেয়ারটা ক্ষত্রিয়দের বরাতে জুটতো। পরবর্তী বৈশ্যরা তো ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই থাকতো। সাধু মানুষইতো অনেকে, সুতরাং ভেট দিতে যতখানি পটু ছিলেন তারা, ভোগের ব্যাপারে অতখানি সুবিধে তাদের কপালে ঘটতো না।

না ঘটুক, গণিকালয় উন্মুক্ত ছিলো সকলের জন্য। রাজা মহারাজাদের রক্ষিতা রাখার প্রচলন ছিলো। এমন কি তাদের সম্মান রাণীদের মতো এতখানি না হলেও একেবারে হেলা ফেলা ছিলো না। বিশেষত ঘরের গৃহিণীকে অবহেলা করা চলে—বারবণিতাকে স্বয়ং বিক্রমাদিত্য পর্যন্ত চটাতে সাহস পেতেন না।

হ্যাঁ, আমি কালিদাস-বিক্রমাদিত্যর কথাই বলছি। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কি পুষ্যমিত্রশুঙ্গ সে বিচার পণ্ডিতেরা করুন গে। আমি বলছি বিক্রমাদিত্য ও তাঁর রক্ষিতা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা লক্ষহীরার কথা।

একদিন লক্ষহীরার কুঞ্জে বিক্রমাদিত্য হাজির হয়েছেন। দেখেন লক্ষহীরার মুখচন্দ্র রাহু গ্রাস করে বসে আছেন। না, শ্রাবণের মেঘ ঢেকে রয়েছে। বিক্রমাদিত্য প্রমাদ গণলেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন :

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নব পল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ?

হে কান্তে, সৃষ্টিকর্তা তোমার নয়ন যুগল ইন্দিবর (নীলপদ্ম) দিয়ে সৃষ্টি

করেছেন। কোমল আনন পদ্ম দিয়ে সৃজন করেছেন। কুন্দফুল দিয়ে দাঁত এবং নবপল্লব দিয়ে অধর নির্মাণ করেছেন। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চম্পকদল দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তোমার হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়লেন কেন?

লক্ষহীরার তবু অভিমান যায় না। তিনি ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য যিনি ত্রিলোক সম্মানিত, তালবেতাল যাঁর ইঙ্গিতে ওঠবোস করে (হলেই বা কিংবদন্তি), সেই তিনি নাকি বলে বসলেন,

> দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূণাং
> পাদ প্রহার ইতি সুন্দরি নাত্র দূয়ে।
> উদ্যৎ কঠোর পুলকাঙ্কুর কণ্টকাগ্রে
> যদ্ভিদ্যতে মৃদুপদং ন নু সা ব্যথা মে।

'সুন্দরি, প্রভুর কাছে এ দাস অপরাধী হলে, প্রভু সেই দাসকে পাদপ্রহার করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার যে পুলক রোমাঞ্চিত হবে, সেই রোমাঞ্চরূপ কণ্টাগ্রে তোমার কোমলপদ বিদ্ধ হলে আমি বড় ব্যথা পাবো।'

বুঝুন তাহলে ব্যাপারখানা। তা স্বয়ং শকারি বিক্রমাদিত্যেরই যদি এ হেন হেনস্তা তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রামবাবু, শ্যামবাবুর অবস্থা কী বলুন।

তাহলে এক রামবাবুর গল্পই বলা যাক। এক রামবাবু এক অফিসের বড়বাবু। বহাল বরখাস্তের মালিক। এক শ্যামবাবু তাঁর কাছে চাকুরী প্রার্থী হয়ে এলেন। একদিন ঘুরছেন। দুদিন ঘুরছেন। একমাস ধরে ঘুরছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নেই। বড়বাবু আজ ঘুরোচ্ছেন, কাল ঘুরোচ্ছেন। কলাটা মুলোটা উপহার নিচ্ছেন। একদিন বড়বাবু অফিসে আসেন নি। শ্যামবাবু উমেদারীতে এসেছেন। শ্যামবাবুর এই হয়রানি বুড়ো অ্যাকাউট্যাণ্ট বাবুর সহানুভূতি উদ্রেক করেছিলো। আজ সুযোগ পেয়ে শ্যামবাবুকে ডেকে বললেন, বলি ওমশাই, মাসখানেকের উপর ধরে তো বড়বাবুর পায়ে তেল মাখছেন, কিছু হলো?

আজ্ঞে না।

সে তো আমি আগেই জানতুম। ওকে তেল মাখিয়ে কিছু হবে না। বলি গোলাপীকে চেনেন ?

আজ্ঞে গোলাপী কে ?

ও হরি। একেবারে ধোয়া তুলসী পাতাটি। গোলাপী বড়বাবুর পিরীতের ইয়ে। তা তাকে যখন চেনন না তাহলে আর উপায় কি ?

শ্যামবাবু অ্যাকাউট্যান্ট বাবুর হাত দুটি ধরে বললেন, আপনি দয়া করে ঠিকানাটা দিন, আমি তাকেই ধরবো।

সে কিন্তু ভদ্দর পাড়ায় নয় মশাই।

তা হোক, আমার আবার ভদ্দর অভদ্দর। দু'পাঁচদিনের মধ্যে চাকুরী না পেলে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে।

ঠিকানা নিয়ে শ্যামবাবু তো গোলাপীর বাড়ী হাজির। কী কথা হয়েছিলো অ্যাকাউট্যান্ট নিরঞ্জনবাবু আমাকে বলেন নি। কিন্তু তার দুদিন পরে স্বয়ং বড়বাবু শ্যামবাবুকে নিয়ে একেবারে বড় সাহেবের দরবারে। এমন একজন করিৎকর্মা লোককে নিলে কোম্পানী খুবই লাভবান হবে। বড় সাহেব বড়বাবুর আবেদন উপেক্ষা করতে পারেন না। কে জানে তার কোন বেদানাসুন্দরীর রিকম্যাণ্ড করা লোক বড়বাবু কিনা।

শ্যামবাবুর চাকরী হতে দেরী হলো না।

যাকগে সেকথা. প্রাচীন ভারতের বারবণিতাদের মধ্যে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে 'বসন্তসেনা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারুদত্তের মত কৃতবিদ্য পুরুষও তাঁর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বসন্তসেনার অনুরাগ, উপস্থিতবুদ্ধি, তাঁকে অতি উচ্চাসনে বসিয়েছে।

পরবর্তীকালে বাসবদত্তার খ্যাতিও কিছু কম ছিলোনা। রাজধানীতে তিনি যাঁদের কৃপা বিতরণ করতেন তাঁরা সবাই উচ্চবংশীয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং রাজা পর্যন্ত বাসবদত্তার কৃপা ভিখারী ছিলেন বলে জানা যায়। রাজনটী শ্যামাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অমর করে গেছেন। বৌদ্ধযুগে এই রমণী নটী সমাজে শিরোমণি সদৃশা। নগর কোতোয়াল (এ যুগের কমিশনার) —

......শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে

, উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে

রোমাঞ্চিত ;'

শুধু তাই নয়, ইনি আর এক ছোটখাটো মহারাজ বিক্রমাদিত্য। উৎফুল্ল হাস্যে বললেন,

'অতিশয় অসময়ে অভাজন—' পরে

অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি

রাজকার্যে ; সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'

বুঝুন তাহলে, কী হৃদয় বিদারক কাণ্ডকারখানা। এর পরও কি ভাবার অবকাশ আছে, সে যুগের বারবণিতা হেলাফেলার বস্তু ছিলেন!

সমাজ কর্তারা সমাজের মঙ্গলের জন্য অনেককিছু করেছেন সে যুগে। সমাজকে কলুষ মুক্ত করার জন্য দণ্ডবিধান করেছেন কিন্তু পতিতাদের ঘাঁটান নি। অথবা তাদের কথা সমাজ রক্ষকদের মনেই হয়নি। এ সামাজিক ক্রটিকে অনিবার্য ক্রটি হিসেবে গণ্য করেছেন!

আলেকজান্দার কুপারিন সাহেবের কথায়, কৃষক এবং বারবণিতা, মানুষের মতই প্রাচীন।

অনেকের মতে সমাজে এদের ভূমিকা কাকের মতো। কুৎসিৎ এদের আচরণ, কিন্তু ময়লা খেয়ে, নোংরা খেয়ে এরা সমাজকে পবিত্র রাখায়ও সাহায্য করে। সর্বযুগে বারবণিতার এই ভূমিকা। তাই এরা অনস্বীকার্য। কিন্তু অনেকদেশেই এদের উন্নতির জন্য তেমন কিছু করা হয়নি। এদের পরিবেশ উন্নত করা হয়নি। প্রয়োজন বোধও করেনি। এদের অনেক বাড়ীতেই সারাদিনে একফোঁটা আলো আসে না। অনেক বাড়ীর সামনের ডাষ্টবিন সপ্তাহে একবার পরিস্কার হয় না। কোন সি. আই. টি. বিল্ডিংস্‌ও এদের জন্য তৈরী হয় না। অথচ এই কোলকাতা সহরে কোন কোন পাড়ায় এদের সংখ্যা যে কোন এম. এল. এ., কে বিধান সভায় পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। জানিনে এতবছর পর এদের কতখানি উপকার হয়েছে। উন্নতি হয়েছে।

সকালবেলার রিহার্শেল সবদিন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছিলো না। গান অবশ্য

মোটামুটি সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো। দ্বিজপদ চৌধুরী অনেক খেটে প্রতিটি গানের সুর করছিলো। সঙ্গীতে আমি আনাড়ী হলেও লেখক বলে চৌধুরী আমাকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করতো। সুরে না মিললে একটু আধটু পাল্টে দিতে হতো।

বিষয়বস্তু ছিলো শারদীয়া। আগমনী। শরৎকাল বর্ণনাসূচক গানটি চৌধুরী আর কমলরাণী দ্বৈতকণ্ঠে তুলছিলো! উমার পিতৃগৃহে আসার জন্য আকুলতার গানটি গাইছিলো ব্যানার্জিদার ছাত্রীটি। চৌধুরী, ব্যানার্জিদাও আমাকে নিয়ে ছাত্রী বাড়ী যেতো। ডিমটা অমলেটটা জুটতো। মিষ্টিটিষ্টিও জুটতো। না, মেয়েটার গলাও ভাল। আজকাল নাকি রেডিওতে রয়েল প্রোগ্রাম করে! শিবের গানটা গাইছিলো অনিল সাহা। মুস্কিল হচ্ছিল কোরাস্ গানগুলো নিয়ে। মোট কোরাস্‌গান চারটি। মেয়ের সংখ্যা তিনজন। তিনটিই এবাড়ী সে বাড়ীর মেয়ে। দ্বিজু চৌধুরীর তথাকথিত ছাত্রী। তারা বড় জোর একক কণ্ঠে 'জিয়ারা মুছল মুছল যায়ে' গাইতে পারে, কিন্তু কোরাসে তিনকণ্ঠ তিন সুরের।

দ্বিজু চৌধুরী খিস্তি যোগ করে বলতো, মাগীদের গলা না কাঁসর। কত শালীদের যে উদ্ধার করতে হয় ভায়া। শালীরা আবার বলে কিনা, রয়েল প্রোগ্রাম পাইয়ে দাও। মারে শালার জলবিছুটি পাছায়, তবে শালার রাগ যায়।

বলতাম, কার শালার রাগ যায় চৌধুরী? আজকাল কি নিজেই নিজের শালা বনছো নাকি?

চৌধুরী বলতো, আর বলনা শালার কথা। এদিকে মাগীরা যেন কত পিরীতের ইয়ে। বলে কিনা, একটা লেমোনেড খাওয়াও না চৌধুরী সাহেব। একটা পান খাওয়াও না মাষ্টার মশায়!

—তাই নাকি! খুব শালুক চিনেছে তো গোপাল ঠাকুরাণীরা।

—আবার বলে কিনা, এক পাত্তর না টেনে নিলে কি গলার আড় ভাঙে!

তা আড় ভাঙাবি, নাগর নিয়ে ভাঙাগে না। আমি শ্যালক ফোরটুয়েন্টি, আমার বলে 'ওয়ান পাইস ফাদার মাদার'! এদিকে হ্যাথোগে ফুলুরী দিয়ে

মাগীরা পান্তাভাত সাটায়, ওদিকে বলে খাস্তা লুচি ছাড়া বেটিদের ব্রেকফাস্ট হয়না।

আসলে চৌধুরীর রাগের কারণ ছিলো, কদিন ধরেই দু তিনজন পালা করে রিহার্সেল দিতে আসছিলো না! দ্বিজপদ চেষ্টা চরিত্র করে দু একজনকে ডেকে আনছিলো বটে, কিন্তু দুই একজনের ঘুম ভাঙানো বড় দায় হয়ে পড়ছিলো। এদিকে প্রোগ্রামের দিন যতই এগিয়ে আসছিলো, চৌধুরীর গালাগালের মাত্রা ক্রমশই বাড়ছিলো। আর সে সব গালাগাল খাস সোনাগাছি পাড়ার গালাগাল। কেতাব বহির্ভূত গালাগাল।

এমন সময় একদিন গোটা দশেক নাগাদ কমলরাণীর ওখানে যেয়ে দেখি বাড়ী ভর্তি পুলিশ। আর পড়তো পড় একেবারে পুলিশ ইনস্পেক্টরের মুখোমুখি। ভারিক্কী চেহারার তুমবো গাল ইনস্পেক্টর বাবু তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে আমার মত একজন রবাহুত ব্যক্তির দিকে সন্দেহজনক চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, কাকে চাই?

সত্যিই তো কাকে চাই! কমলরাণীর কথা বলবো, না, দ্বিজপদ চৌধুরীর কথা বলবো! দ্বিজপদ তো এ বাড়ীতে ঠিক থাকে না। আর কমলরাণী! তার কাছেই বা আমার কি দরকার। বিশেষ করে কার ঘরে কি ফ্যাসাদ হয়ে বসে আছে কে জানে! কী বলতে যেয়ে কী বলে ফেলবোরে মশাই, তারপর বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

জবাব তৈরী করার আগেই, ইনস্পেক্টর বাবু নাম ধাম পরিচয় জানতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, হাতের নোটবুকে টুকে নিতে লাগলেন।

—কী নাম, সত্যেন রায়। বাড়ী নবকৃষ্ণ স্ট্রীট।

—নম্বর!

—নম্বর বললাম।

—পেশা।

—একটু আধটু লিখি।

—কোথায়?

—আজ্ঞে খাতায়।

তারপর কতদিন এ লাইনে যাতায়াত! দিনের না রাতের খদ্দের।

অফেশনাল না প্রোফেশনাল। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইত্যাদি ইত্যাদি শেষ করে গম্ভীর ভাবে বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন, পালাবার চেষ্টা করবেন না। থানায় যেতে হবে।

নাও পিতৃদেব, ঠ্যালা বোঝ। আরও বোহেমিয়ান হয়ে বে-পাড়ায় আসো। আরও কথাগান দিয়ে প্রোগ্রাম লিখো!

মনে মনে পাঁচবার কানমলা খেলাম।

ভগবানের কাছে পৌছুতে যেমন পুরোহিত ধরতে হয়। ঐতিহাসিক স্থান দেখতে গেলে যেমন গাইডের দরকার হয়, তেমনি এই নরকে ঢুকতে দালালের সাহায্য নেওয়াই ভাল। না. চৌধুরীকে না নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। ওদের রাজ্যে আমি তো সত্যই এক বিদেশী পথিক। এর ঘাটে ঘাটে চোরা স্রোত, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে চোরাবালি। যত মধু, তত বিষ। যত হাসি, তত ছলনা। যত চিন্তামনি, তত লক্ষ্যহীরা।

এ হীরের ব্যবসায়ে আমি তো অনধিকার প্রবেশকারী। রাতের বা দিনের খদ্দের কোনটাই নই। গরীব লেখক। এক বাড়ীতে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে আহার জোটে। এদিক সেদিকে লিখে দু-চার পয়সা পাই। তাই দিয়ে কোঁচার পত্তন। কয়েকদিন আগে শ্রীমতী কমলরাণীই তো নগদ সাতটি টাকা ধার দিয়েছে। বলেছে, ও নাকি আর ফেরৎ দিতে হবে না। হাত পেতে গতর খাটানো টাকা সাতটি নিতে গা শিরশির করছিলো।

কিন্তু তাই বলে বেশ্যাবাড়ীকে সত্য সত্যই নরক বলেও ভাবিনি (সেই মাথা ঝিম ঝিম করা সোঁদা গন্ধটা যেন কখন সয়ে গেছে)। আবার সমাজ সংস্কারক হয়ে এদের উদ্ধার করার কথাও চিন্তা করিনে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকেই বেশ্যা ও ভূমি বহুভোগ্যা। প্রথম পর্বে নারীও বহুভোগ্যা ছিলো। শ্বেতকেতু উদ্দালক সে প্রথার বিলোপ ঘটালেন। মায়ের কোলে বসে স্তনপান করছিলেন। পিতাও বসেছিলেন কাছে। এমন সময় এক পুরুষ এসে রমণীকে বাঞ্ছা করলো। রমণী পুরুষের অনুসরণ করলো। উদ্দালক বিস্মিত কণ্ঠে পিতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

পিতা বললেন, এটাই লোকাচার। নারী যে কোন পুরুষের কাম্য হলে তার ভোগ্যা হয়।

বড় হয়ে উদ্দালক এই জঘন্য প্রথার বিলোপ ঘটালেন। নারীকে এক-নিষ্ঠ হতে হবে। এ প্রথা সমাজে প্রচলিত হলো।

কিন্তু গণিকাবৃত্তির বিলোপ ঘটেনি। আইন আছে, আইনের ফাঁক আছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বেলায় খাটেনি। যুধিষ্ঠির খুড়ো আইনের নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ডিভোর্স প্রথার মাধ্যমে একই নারী নিত্য নতুন স্বামীর ঘর করছে। এক বিলেত ফেরৎ বন্ধু বলেছিলেন, আজ যাকে 'হ্যারীর' বউ হিসেবে জানো, ছ মাস পরে 'জনের' বউ হিসেবে তার বিয়ের বৌভাত (বিলেতে 'বউভাত' আছে নাকি মশায় !) খেতে যেয়ে চমকে ওঠোনা। সেই নিমন্ত্রণে হ্যারীকেও নিমন্ত্রিত দেখলে হুঁচোট খেয়োনা ভায়া। আমাদের দেশটা এই বিংশ শতাব্দীতেও এতটা এগুতে পারলোনা মশায় ! কে এক পাগল বলেছিলেন (এদেশে জিনিয়াসদেরই নাকি পাগল বলা হয়ে থাকে), আরে মশাই সেই জন্যেই তো আমাদের দেশে জিনিয়াস্ তৈরী হচ্ছে না। রাশিয়ায় ত্যাখোগে, তারা বলে 'হেরিডিটি' ইচ্ছে মতো তৈরী করা যায়। ইউরোপে টিউব বেবীর ছড়াছড়ি। আমরা গরুতে কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু এতসব তত্ত্বকথা ভাবার সময় ছিলো না আমার। তখনকার মতো যে কথাটা মনে পড়ছিলো আমার তা হচ্ছে. কমলরাণীর কিছু ঘটেনি তো ! তাদের কাউকে তো দেখছিনে। বুড়ী বাড়ীওয়ালী এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো। বাড়ীর রক্ষাকারীদের মধ্যে পাড়ার মস্তান শ্রেণীর একজন গন্যমান্য বক্তি (?) ইন্স্পেক্টর বাবুকে যেন কী বুঝাচ্ছিলো।

এই লোকটাকে আমি এক আধদিন কমলরাণীর ঘরেও দেখেছি।

দু হাতে গোটা আটেক আংটি। কোনটা সোনার। কোনটা নিকেলের। গলায় সোনার চেন। গোটা দুই দাঁত সোনার বাঁধানো। হাতে সোনার পাটা বিছে। মোম দিয়ে চুনটকরা ছুঁচালো গোঁফ। হাতে বিরাট পানের কৌটা। এই খাচ্ছে তো আবার খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে লাগা পানের গুঁড়ো এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে দিয়ে সেই আঙ্গুল অন্য হাত দিয়ে মুছে ফেলছে। (ঐ ফাঁকেই আমি সোনা বাঁধান দাঁত দেখেছিলাম। আর দাঁত দেখেই আমার অশিক্ষিতপটু মন এঁকে মস্তান

বলে চিনতে পেরেছিলো)। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীর বুকে বেশ একটা বাহার দেওয়া নিম্নরুচির রুমালও থাকতো। একদিন তার মুখ মোছার ফাঁকে তার মধ্যে আমি উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি আঁকা দেখেছিলাম।

এই মস্তানটি এলে কমলরাণীর সেকী গদগদ ভাব। সে কী সেবিকা রূপ। যেন মস্তানটি এক বিরাট সামন্ত রাজা বা সুলতান, আর কমলরাণী তাঁর অতি বংশবদা এক বাঁদী। এঁর জন্যে অতি গোপনে আলমারীর প্রত্যন্ত প্রদেশে সংরক্ষিত হুইস্কীর বোতল বেরুতো। নতুন মদের গ্লাস বেরুত। আর এই লোকটা, এই আপ্যায়ন অতি নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করে, কৃপার দৃষ্টিতে (একটা সিংহ যেমন, একটা নেংটী ইঁদুরের দিকে তাকায় তেমনি ভাবে) আমার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কমলরাণীকে কী বলতে বলতে গোটা বোতল ফাঁক করে কমলরাণীকে কৃতার্থ করতো। তারপর অভয় দেবার ভঙ্গীতে হস্তে মুদ্রা অঙ্কন করে চল্লিশ টাকা দামের নাগরাই জুতোতে পা গলিয়ে সুলতানের মতোই এর তার খোঁজ খবর নিতে নিতে নিষ্ক্রান্ত হতেন।

না, এই মস্তানটি নাকি আমারও উপকার করেছিলেন একদিন। কমল-রাণীর এখানে রিহার্শেল শেষ করে বেরুবার সময় খাতার মধ্যে রাখা ফাউন্টেন পেনটা কী করে পড়ে গিয়েছিলো। পড়ে গিয়েছিলো, কি লোপাট হয়েছিলো আজও আমি বুঝিনি। বিকেলে খোঁজ পড়তেই দেখি আমার শ্রীকলম বাবাজী উধাও। বুকটা ধক্ করে উঠলো। কদিন আগেই রক্তজল করা টাকায় কলমটা কিনেছিলাম। হ্যাঁ, কমলরাণীর দেওয়া সেই সাতটি টাকা দিয়েই। কমলরাণী বলেছিলো, ধার নয় ঐ সাতটি ধাকা আমি কলম কিনতে দিলাম দাদা। সেই দিনই কমলরাণী আমাকে দাদা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলো।

পরদিন অনেক ভেবে চিন্তে কমলরাণীকে কাহিনীটি বিবৃত করেছিলাম।

কমলরাণী বললো, কোথায় হারিয়েছে ঠিক বলতে পারেন!

—তা কী করে বলবো। তা বলতে পারলে তো খুঁজে দেখতেই পারতাম।

কমলরাণী আপন মনেই বিড় বিড় করে বললো, বারোটা সাড়ে বারোটা। বাইরের লোকের হাতে পড়লে কি আর পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তবু একবার খোঁজ নোব দাদা।

আর খোঁজ! গঙ্গার ঘাটে আংটি হারিয়ে সারা বাড়ী খুঁজেও একবার তা পাইনি। শ্যামবাবুর দোকানে ছাতা ফেলে এসে পরমুহূর্তে যেয়ে তার হদিস পাইনি। আর প্রকাশ্য কোলকাতার রাস্তায় হারানো দ্রব্যির কিনা খোঁজ হবে! কমলরাণী কি আজকাল দ্রব্যগণনাও শিখছে নাকি?

যথারীতি সাতটাকা দামের পাইলট কলমখানা খরচের খাতায় তুলে রেখে সে রাতে ঘুমুতে গিয়েছিলাম।

রাতে তিনচারবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কোনবার কলমখানি বিচিত্র বেশে সেজেগুজে চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছিলো। ধরতে যেয়ে দেখি, ওরে বাবা এযে দেখছি কমলরাণীর বাবুর সিগারেটের লম্বা পাইপটা। সেটা আমার ঘরে কী করে এলো, কালই এটা ফেরৎ দেওয়া উচিত। ফেরৎ দেবার সময় কমলরাণীকে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে ভাবতে ভাবতে দেখি দ্বিজু চৌধুরী—দিব্যি পকেটে আমার কলমখানি (কমলরাণীর বলাই ভালো) গুঁজে হাসিমুখে আমার দিকে এগুচ্ছে। পরক্ষণেই দেখি, দ্বিজু চৌধুরী কলমখানা দু টাকায় বেচে দিয়ে এক বোতল ধেনো কিনছে বলে, আমার সঙ্গে এক হাত হচ্ছে। আমার ছাত্রী শ্রীমতী কল্যাণী একটা হাণ্টার কোত্থেকে যোগাড় করে আমার হাতে দিয়ে গেলো। দ্বিজু চৌধুরী যদিও ধেনো কিনতে পারে, কিন্তু আমার ছাত্রী শ্রীমতী কল্যাণী যে কী করে এ পাড়ায় আসতে পারে তা কিছুতেই মিল দিতে পারলাম না।

পরের দিন আর কমলরাণীর ওদিকে যাই নি। বিকেল বেলা দ্বিজুচৌধুরী এসে বলেগিয়েছিলো, পরদিন যেন অতি অবশ্যই রিহার্শেলে যাই। এক সিনেমা প্রডিউসারের পদার্পনের সম্ভাবনা আছে। আর চৌধুরী যদি মিউজিকটা পায়, আমাকে দিয়েই নাকি গান লেখাবে। ঐ সঙ্গে বলেছিলো, বুঝলে ভায়া, এবার তোমার কপাল ফাটার সময়। বেশ্যা বাড়ী সুলক্ষণা। জানোনা, শুভ কাজে বেশ্যাবাড়ীর মাটী লাগে। দুগ্‌গো পুজোয়, বেশ্যা বাড়ীর মাটী না হলে চলে না শোননি!

সুসজ্জিতা বেশ্যা শুভ কার্যে প্রয়োজন হয়।

রামায়ণ পড়েছো তো। রামচন্দ্রের অভিষেক উপলক্ষে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল হতে ঘটপূর্ণ জল, সমুদ্রের মুক্তা, ঔডুম্বর পীঠ, চতুর্দন্ত সিংহ, পাণ্ডুর

বৃষ, নানা তীর্থের জল, বিবিধ মৃগ পক্ষী, ব্যাঘ্রতনুর সঙ্গে অলঙ্কৃতা বেশ্যাও আনা হয়েছিলো। রামচন্দ্র কৈকেয়ীর গৃহে রাজাজ্ঞায় যেতে যেতে নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকি রামজন্মের ষাট হাজার বছর আগে তা লিখে রেখে গেছেন।

সুতরাং যেও যেও, ভায়া। বেশ্যা বাড়ীতেই তোমার প্রথম কন্ট্রাক্ট করিয়ে দেবো। গিয়েছিলাম। না, প্রডিউসার আসে নি। দ্বিজুচৌধুরীও না। কে জানে কোন কুঞ্জে প্রডিউসারের অর্থের সদ্ব্যয় করছে। আলুওয়ালা, পটলওয়ালা প্রডিউসার হলে যা হয়।

কিন্তু তা না আসুক। টেবিলের উপর আমার জন্য যিনি অপেক্ষা করছিলেন, তাকে পেয়েই আমি বিশ্ব সংসার ভুলে গিয়েছিলাম। হাঁা, আমারই সেই ফিকে লাল রঙের জাপানী পাইলট। নিখুঁত, নিটোল ভাবে অবস্থিত। কমলরাণী হেসে বললে, জগদীশ লালজীর পাড়ায় সুঁচ হারালে পাওয়া যায় দাদা। আর এতো কলম। বলেই শ্রীযুক্ত জগদীশ লালজীর উদ্দেশ্যে (কী জানি মনের আনন্দে ভুল দেখলাম কিনা) চোখ বুজে যেন নমস্কারটা-সেরে নিলো।

তারপর উদ্ভাসিত মুখে বলেছিলো, ভাগ্যি ভালো ঐ দিনই জগদীশ লালজী পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন। পান টান খাইয়ে নিবেদন করতেই কী ভাবলেন। তারপর বললেন, দুপুরে তো হরিয়া শালার ডিউটি ছিলো। আর ছিলো ছিচকে দু' আঙ্গুলে মহিন্দর।

বললাম, ও হরিয়া, মহীন্দর বুঝিনে লালজী, এ আমার দাদার কলম, আপনাকে বের করে দিতেই হবে। আপনার রাজ্যি থেকে নাকি একটা কলমের খোঁজ পাওয়া যাবে না!

লালজী হাসলেন। হেসে বললেন, সে সব দিন কি আর আছে রে কমলি! হরিদাস পুরের বড় বাবুর এগার হাজার টাকার হীরের আংটি খোয়া গেলো গড়ের মাঠে। গাড়ী নিয়ে ফুর্তি করতে যেয়ে। আশা বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর কোকিলা বাবুর পেয়ারের মাগী। তারে নিয়েই বেরিয়েছিলো। আমার কানে গেলো তিন দিন পর। বাবু বললেন, জগদীশ লাল, আমার পৈতের সময় উপহার পাওয়া আংটি, তোমাকে এর

খোঁজ করে দিতে হবে। খুশী করে দেবো তোমায়। এদিকে শালার গড়ের মাঠের পুব পাশে থাকে শালা নামকু মস্তানের দল। তার দলের সঙ্গে আবার আমার রেষারেষি। কী করি, মুলো ফটকে কে হুইস্কী গিলিয়ে ওদের হাঁড়ির খবর বের করে, তিন দিনের মধ্যে বড় বাবুর হাতে হীরের আংটি তুলে দিলাম। কিন্তু আজকাল যত শালা ছিচকে ঢুকেছে এ লাইনে। ফাঁকী মারতে কোন শালা কম যায় না। সেবার তো কান কাটা মদনাকে এ জন্যেই লাথি মেরে পেট ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। শালা হার চুরি করে গিলে ফেলেছিলো।

জগদীশ-পুরাণ অফুরন্ত। কমলরাণী লালজীর কথায় পঞ্চমুখ। সেই মহারথী শ্রীযুক্ত জগদীশ লালজীকে আজ আবার দেখলাম। ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কী সব বাৎচিৎ করছেন।

সব টুকরা কথা থেকে যেটুকু সারমর্ম এতক্ষণে গ্রহণ করতে পারলাম, তা হচ্ছে, কমলরাণী, সবিতারাণী, ময়না এরা কেউ নয়, দুতলার কোণের ঘরের যে যৌবনবতী মেয়েটা ছিলো, তার ব্যাপার। মেয়েটা এর আগে এক ধণী মহাজনের রক্ষিতা ছিলো। ক্যানিং স্ট্রিটে বেশ বড় সড় দোকান। মোটা রোজগার। মোটা লেনদেন।

হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার, না করোনারী থ্রম্বসিসে কিছুদিন আগে মারা গেছেন। না, মেয়েটিকে ভাসিয়ে যান নি। হাজার বিশেক টাকার গয়না পত্র, ঘর সাজানো ফার্নিচারপত্র, সব কিছুই দিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি শহর-তলীতে একটা বাড়ী করে দেবারও নাকি মতলব ছিলো ভদ্রলোকের (আহা, ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে আমি নির্ঘাৎ একটা প্রণাম করে বসতামগো। পাড়া ফুলুরী খেকো মেয়েটা যে এমন রাজরাণীর হালে থাকবে, তা তার চৌদ্দপুরুষ কি কল্পনা করতে পারতো দাদা)।

না, ভদ্রলোকের সেই কুঞ্জ নির্মাণ সমাপ্ত হয় নাই। এখানেই আগেকার দিনের জমিদার বাবুদের সঙ্গে এযুগের ধনীদের পার্থক্য মশাই। এযুগে আর বাগান বাড়ী দেখলাম না মশাই। এ যুগে আর মুঠো মুঠো আশরফী প্যালা পড়ার কাহিনী আর শুনলাম না। উনবিংশ শতকের নিকি বাইজীর মতো বাইজীর গপ্পোও আর শুনলাম না।

এযুগ, পা টিপে টিপে চলার যুগ। ষোল বেহারার পাল্কী মোটর আসায় বাদ পড়লো বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আসলে ষোল জন বেহারা, ঐ সঙ্গে বরকন্দাজ, খিতমদগার পোষার বুকের পাটা যেন শুকিয়ে গেছে এযুগে। গায়ে তেল মাখার নাপিতকে রোজ তেল মাখাবার সের খানেকের জামবাটী, তেলধুতি দেবার হিম্মৎ আর দেখছিনে।

তা না থাকুক আমাদের ক্যানিং ষ্ট্রীটের সেই কারোনারী থ্রম্বসিসের সেই ভদ্রলোকের তবু হিম্মৎ আছে বলতে হবে। বাড়ী ঘর দোর পুত্র কন্যা সামলে ষাট বছরের বুড়ো যে কুঞ্জ ভবন তৈরী করতে গিয়েছিলো এটাই কি কম। আর বয়স! পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থের' এক জায়গায় উপনায়িকা বলেছেন যেন, প্রেমের ব্যাপারে বৃদ্ধেরাই নির্ভরশীল।

তা হবে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা যে স্বামীর চোখের মনি হয়ে ওঠে এতো আমরা আকছারই দেখছি এখানে সেখানে। আমাদের মহাভারতের অর্জুন চুয়ান্ন বছর বয়সে সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন বলে শোনা যায়। এ যুগে তিরানব্বুই বছরের কোন কোন অর্জুনআলী আঠারো বছরের সুভদ্রাবেগমকে না হোক রাবেয়া বিবিকে বিয়ে করছে পত্রিকেয়ও নাকি এমন খবর ছাপা হয়। আমি অবশ্য অর্জুন বা অর্জুন আলী কারও বিয়ে প্রত্যক্ষ করিনি। না, পত্রিকেয়ও নয়।

যাক সে কথা, যা বলছিলাম। সেই যে ক্যানিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ, তিনি তো সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করলেন। শ্রীমতী সুশীলা এই বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। দুদশ দিন একটু আধটু চোখের জলও ফেললেন।

কিন্তু ভ্রমরের স্বভাবই এই, ফুল থাকলেই আসবে। রাজসিংহাসন আর হৃদয় সিংহাসন শূন্য থাকার উপায় নেই। অবশ্য বারবণিতার হৃদয় সিংহাসনের কথাই বলছি আমি। শ্রীমতী সুশীলার (কে এমন সার্থক নামটি রেখেছিলো কে জানে।) মেহগনি কাঠের সিংহাসনের মতো চেয়ারখানাও ফাঁকা রইলো না।

কোন বোম্বাগড়ের এক রাজকুমারের যাতায়াত সুরু হলো। ঐ সিংহাসনেই উপবেশন করলেন তিনি। তাঁর নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা। কোলকাতায়ই নাকি বিশ পঁচিশখানা পেল্লাই বাড়ী। মোটর গাড়ী নাকি

তিন চার খানা। অবশ্য গাড়ী চড়ে কোনদিনই আসতো না। লোকজানাজানি করে আসা নাকি তাঁর ইচ্ছে নয়। তা কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। পরে তো কর্ত্রীর ইচ্ছেয়। আসতো। দেদার খরচপত্তর করতো। শোনা যাচ্ছিলো আর দু দশদিন বাজিয়ে নাকি শ্রীমতীকে হাজার টাকায় বাঁধা রাখবে।

এ বাড়ীর বাড়ীওয়ালী থেকে অন্য ভাড়াটেরা, ঝিমাগীগুলো, খিতমদগাররা সবাই নাকি ভদ্রলোকটি এলে খুসী হতো। এমন মদ খেতে ও মদ খাওয়াতে ওস্তাদ নাকি অনেকদিন এ পাড়ায় দেখা যায়নি। কথায় বলে, পরের পয়সায় নাইট্রিক এসিড খাওয়া যায়, আর এতো দেববাঞ্ছিত বিলিতি মদ।

শুধু কি মদ। নাচ গান হৈ হুল্লোড। মাছ মাংসের ছড়াছড়ি। পশু-পাখালির জড়াজড়ি। বারান্দায় রাখা টিয়াপাখীটা পর্যন্ত,রাজাবাবু আ গিয়া, রাজা বাবু আ গিয়া বলতো। কে জানে সব খদ্দেরকেই বলতো কিনা!

সেই যে বোম্বাগড়ের মহারাজকুমার, যার লাখ লাখ টাকা, তিন চার খানা মোটর গাড়ী, তিনি নাকি গতকালও ইয়ার বক্সী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যথারীতি পাঞ্জাবী হোটেলের কষা মাংস এসেছিলো (চাট নাকি কী [illegible] সেই দ্রব্যি। ও দ্রব্যি না হলে নাকি জুৎকরে নেশা করা যায়না)। [illegible] দোকানের দামী সরাব তো সঙ্গেই ছিলো বেশ কয়েক বোতল। [illegible] হৈ হুল্লোড। গেলাসে গেলাসে স্বাস্থ্যপান। এই স্বাস্থ্য [illegible] করা থেকে নাকি অনেকের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়। লিভারেই নাকি হয়। [illegible] হয়। লিভারে পচন ধরে। ঐ দ্রব্যি ফেটে স্থায়ী স্বাস্থ্যোদ্ধারে [illegible] হয়। তবে যারা সাগর, দু এক চৌব্বাচ্চায় তাদের কিস্সু হ[illegible] স্বাস্থ্যপানে নাকি বাচ্চা হওয়ার পথ্ রুদ্ধ হয় এইমাত্র।

সবই ব্যবস্থা ছিলো। এঘর ওঘর থেকে আরও নায়িকা[illegible] বরফরে, রাবড়ীরে, মালাইরে (কেউ কেউ বলেন, মদের সঙ্গে মিষ্টির [illegible] ভাসুর ভাদ্রবউ সম্পর্ক। তা সে যারা বলে বলুক। পরের পয়সায় সব চলে। খাবনা, খাবনা করেও দেদার কুলপী বরফ, সন্দেশ বরফ উজার হয়)। তারপর হুইস্কীরে, শ্যাম্পেন শেরীরে। কী নয়। নাচনা, গাওনা সবই চলেছিলো।

তারপর একসময় রাত বেড়ে চলেছিলো। খিস্তি খেউড়, হাফআখরাই, তরজা, টুইস্ট নৃত্য শেষ হয়েছিলো।

যে যার ঘর সামলাতে, নাগর সামলাতে চলে গিয়েছিলো।

তারপর এক সময় রাজকুমারের এক সংগ নাকি এও বলেছিলো, মাইরী চুছিলা বিবি, একটু পায়ের ধুলো দাও বাবা। তুমি আমার ছিরি বিরিন্দাবন। ঐ যে হুইস্কী টানচে উনি কলির কেষ্ট। আমি তোমার ছুবল ছখা। মাইরী বলচি, একটু কিরপা কর বাবা।

তারপর শ্রীরাধা ও মাকালীর পার্থক্য ভুলে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলো, তুমি বাবা আমার ফরসা মা কালী। আমি পরের জন্মে যেন হনুমান হয়ে জন্মাই এই আশীর্ব্বাদ করো মাইরী।

রাজপুত্তুর, তিন চারখানা মোটর গাড়ীর মালিকও আরও হৃদয় বিদারক কথা বলেছিলেন। কোন সময় ক্যানিং স্ট্রীটকে টেক্কা দিয়ে বলেছে, ওর দশ হাজার বিশহাজার টাকার গয়না তুমি ভিখিরীদের বিলিয়ে দিও সুশী। ও নিয়ে তুমি আমার ডেরায় আই মীন আমার প্রাসাদে উঠবে না ডারলিং। তোমার জন্য লক্ষ টাকার জড়োয়াগয়নার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আর কোন গাড়ীটা তোমার পছন্দ তাই শুধু বলবে। মার্সিডিস্, শেভ্রলে, ক্রাইসলার, ডজ, হীলম্যান যা খুশী। আমার অ্যামেরিক্যান এজেন্টকে শুধু বলে দেবার অপেক্ষা। ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি আরও সব খাদ্য অখাদ্য কথা।

আর এই উচ্ছল স্রোতে সুশীলাবিবির মতো মেয়ে ভেসে গিয়েছিলো। হয়তো মনে মনে ভেবেও থাকবে, কোথায় ক্যানিং এর ইলিশ আর কোথায় মুর্শিদাবাদী গোলাপ খাস। তারপর আনন্দে টগবগ হয়ে স্খলিত পদে রাজপুত্তরের কণ্ঠ লগ্ন হয়েছিলো। তারপরের দৃশ্য দেখার নয়। শোনার নয়।

দেখেও নি কেউ। তবে কেউ কেউ নাকি ওদের বেরিয়ে যেতে দেখেছে। যেমন আর পাঁচজনকে ঘর থেকে বেরুতে দ্যাখে। কেউ অস্বাভাবিক কিছু ভাবেনি। বিশেষ করে সুশীলার ঘর থেকে সুশীলার বাবু আর তার দলবল নিয়ে বেরুতে দেখলে। হাতে একটা ব্যাগ ছিলো। তা আর আশ্চয্যি কী! আজকাল আবার ব্যাগছাড়া বাবু, বিবি দেখা যায় নাকি কোলকাতায়। ঐ ব্যাগেই তো বাবুদের তৈজসপত্র, এটা সেটা। ঐ ব্যাগেই তো বিবিদের পাউডার পাফ, হাত আয়না। টুকিটাকি এটা সেটা। যুগ পাল্টায়, ব্যাগের রূপ পাল্টায়। কখনও কটকি থলি,

কখনো মাদুর-ব্যাগ। কখনও চেন, কখনও পোর্টফোলিও! মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ইনস্যুরেন্সের দালাল, অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে দাঁতের মাজনওয়ালা সবার। সিনেমা অভিনেত্রী থেকে আরম্ভ করে বিন্দি ঝি পর্যন্ত

তাই কেউ অস্বাভাবিক ভাবেনি। পা টলছিলো, কেমন একটা পালান পালান ভাব। তার মধ্যেই বা অস্বাভাবিকত্ব কিসের! পা না টলিয়ে কে বেশ্যাবাড়ী থেকে বেরুয়। আর পালন পালন ব্যাপার! সেও তো স্বাভাবিক!

এ রাজ্যে অনেকেই তো সিংহ হয়ে ঢোকে, বেড়াল হয়ে বেরুয়। তারপর রাস্তায় যেয়ে কে নর্দামায় পড়বে, কে খেউর গাইবে সে তাদের ব্যাপার। সেজন্যে পুলিশ আছে, বাটপাড় আছে। সে আবার অন্য ব্যাপার, অন্য কাণ্ডকারখানা।

তবে, আমাদের সেই রাজপুত্তুর কীভাবে এখান থেকে গিয়েছে তাও অবশ্য কেউ লক্ষ্য করেছে। এখানকার খদ্দেরদের দিকে হাজার না হোক, শতচক্ষু অপলক থাকে। সেই যে শ্যাটিওনয়ের-এর লর্ড, তাঁর দলবল যেমন করে জার্মান ক্যাপ্টেন বোমগার্টেন ও তার দলবলের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলো! এখানকার চায়ের দোকানের বয়, মোড়ের পানওয়ালী লক্ষ্য করেছিলো, রাজপুত্তুর আর তার ইয়ার বক্সীরা একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়েছিলো। জড়িত কণ্ঠে বলেছিলো, একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এসো তো বাপ। কোলকাতার বাতাসের বড় ভ্যাপসা গন্ধ। তার চেয়ে একটু বাইরে চল।

ওদিকে অনেকক্ষণ পর পাশের ঘরের ঝি মাগী তার কর্ত্রীর বাবুর জন্য কী কিনতে যাবার পথে হঠাৎ শুনতে পায় কী একটা গোঙ্গানীর শব্দ। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যেয়ে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে যেয়ে আবার কী ভেবে ফিরে আসে। কী জানি বাবা, বেলাল্লা কিছু ঘটছে নাকি ভিতরে। বেবুশ্যে মাগীদের তো হায়া বলতে কিছু নেই। জিনিস কিনে ফেরার পথেও সেইশব্দ। তবে এবার খুব অস্পষ্ট।

কী ভেবে দরজাটা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গিয়েছিলো। ঐ সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলো শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী কাৎ হয়ে পড়ে আছে। আর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে। এ যে মদের গাঁজলা নয়, অভিজ্ঞা ঝি (এই পাড়ায় থেকে, এত বয়সেতো আর কম কীর্তি দ্যাখেনি ঝি মাগী। আজই না হয় গতরের

যৌবন গেছে, চামড়ার যৌবন গেছে, কিন্তু কান—চোখের মাথা তো আর খেয়ে বসেনি একেবারে!) বুঝতে পেরেই চিৎকার করে উঠেছিলো।

না, সে চিৎকারেও সুশীলাবিবির ঘুম ভাঙনি। নেশা ছোটে নি। পোষ্টমর্টম পরীক্ষায় নাকি পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ শ্রীমান বোম্বাগড়ের মহারাজকুমার ও তার ইয়ারবক্সীরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই কর্ম ফতে করেছে। পূর্ব পরিকল্পনা মতই দীর্ঘ দিন ধরে জাল পেতেছে। আসর জমিয়েছে। রাজরাণী করার সুখচিত্র ধরেছে। হুইস্কী স্যাম্পেনের বন্যায় সবাইকে ডুবিয়ে নিজেরা মজাসে ভেসেছে। আর এজন্য টাকা খরচ করেছে, তা সুদে আসলে তুলে নিয়ে সটকে পড়েছে। হ্যাঁ, ৺ক্যানিং স্ট্রীট যে সব গয়নাপত্তর, হীরে জহরৎ দিয়েছিলো, ফুলুরী পান্তা খেয়ে নিজে যা জমিয়েছিলো, সব চেটেপুটে লোপাট করে শ্রীমান বোম্বাগড় বোম্বাই পাড়ি দিয়েছে। (ইস্ সেই ব্যাটা ৺ক্যানিং স্ট্রীট বৃদ্ধকে আমার পেটাতে ইচ্ছে করছেগো। ব্যাটা দুদিনেই যদি টেসে যাবি তবে সোহাগ করে অত দামী দামী মালপত্তর দেবার কি দরকার ছিলোরে বাপু। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার আর বুঝি কায়দা পাওনি ব্যাটা হরতুকী! কেন মাড়য়ারীদের মধ্যে যে চিরকুট-কায়দা নাকি আছে—দাদু সেটা জানতোনা কালোটাকা ফাঁকী দেবার! তাহলে তো অমন যৌবনবতী মেয়েটা এমন অকালে মরতো না। অবশ্য তিলে তিলে তো ওরা প্রতিদিনই মরে। ব্যাটা বোম্বাগড় তো এক অর্থে বাঁচিয়েই দিয়েছে। কিন্তু এমন 'রঙ' হয়ে মরতো না)।

'রঙ করা' শব্দটা আমি অনেক পরে শুনেছিলাম। আমার হ্যারিসন রোডের মেসে থাওয়াকালীন এক এই-লাইনের-অথরিটি কম্পাউণ্ডার বাবুর মুখে। তার কাছে আমি অনেকখানি কৃতজ্ঞ। তিনি জ্ঞান শলাকা দিয়ে আমার চোখ ফুটিয়েছিলেন। আমার এই 'ট্র্যাজেডী' শুনে তিনি আমার কথা লুফে নিয়ে বলেছিলেন, আরে ভায়া একেই তো রঙ্ করা বলে।

তা বলুক, কিন্তু এদিকে আমার আরও ধোলাই-এর ব্যাপার।

ঘণ্টা খানেক ভ্যাবাচেকা খেয়ে (কিছুতেই আমি খুনী বাড়ীতে স্মার্ট হতে পারিনে) খেয়ে ইনস্পেক্টার বাবুর গুরুগম্ভীর তদন্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করে, একে

তাকে দেওয়া ধমক ধামক, শালা বানচোৎ শুনে, পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়ে এক সময় থানায় পৌছেছিলাম।

কমলরাণী সহ বাড়ীর আরও অনেককে আগেই থানায় আনা হয়েছিলো সাক্ষ্য দেবার জন্য। সেই বুড়ী ঝিটাও ছিলো।

থানার মেজবাবু না বড়বাবু তাদের স্টেটমেণ্ট নিচ্ছিলেন। সে হাজার প্রশ্ন, হাজার জেরা।

শেষ কখন সুশীলাকে দেখেছ। কে কে তার ঘরে ফুর্তি লুটতে গিয়েছিলো। কতদিন ধরে জান ঐ কাপ্তানকে ইত্যাদি। আমার কথাও জিজ্ঞেস করছিলো।

কমলরাণীরা দারোগা বাবু, ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও করছিলো।

—তা বাবু, অনেক্ষণ বসে আছি পান খাওয়াবেন না? চা!

দারোগাবাধু হেঁকে বলচেন, কিছুদিন হাজতে থাক মাগীরা, পান সিগারেট চা আপনিই আসবে'খন।

কমলরাণীরা বলেছিলো, তা লেপ তোষক বালিশ মশারী দেবেন তো। না হয় তো বলেন, বৌদির খাটে যেয়েই শুয়ে পড়ি বাবা। নাকি বাসায় আপনারা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। একেবারে সতী-সাবিত্রীর পুরুষ সংস্করণ!

চুপ করে ছিলো কেবল সুবর্ণ। কী যেন ভাবছিলো। আমাকে দেখে ম্লান হাসি হেসেছিলো।

দারোগাবাবু তাকেও জেরা করছিলেন। এবারের আগ্রহটা যেন আরও বেশী। রসিয়ে রসিয়ে আগের জীবনের কথা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন।

না, সুশীলার সঙ্গে বেশী দিনের আলাপ নেই সুবর্ণর। তবে ঘটনার দিন, সে গিয়েছিলো বটে সুশীলার ঘরে। একবার ফিরিয়ে দিয়েছিলো, ঘরে অন্য বাবু ছিলো বলে। দ্বিতীয় বারে আর 'না' করেনি।

না, টাকা কুড়িটা পাবে সেজন্যই নয়, অনেকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে।

দারোগাবাবু খিস্তি করে বললেন, আহা মাগী যেন মহাপুরুষ। মাটী আর টাকাতে তফাৎ দেখে না গো! তবু ভাগ্যিস বলেনি, দেশের কাজে টাকা

সংগ্রহ করার জন্য এই লাইনে এসেচে। কোন পার্টির লোক নয়তো আবার! নাকি গুপ্তচর সংস্থার এজেন্ট। মক্কেলদের নাড়ী নক্ষত্র খুঁজে বেড়াচ্ছ!

সুবর্ণ অল্প কথায় জবাব দিলো, তা যা মনে করেন বাবু!

দারোগাবাবু দাঁত মুখ খিঁচে বললেন, যা মনে করেন বাবু! আহা আমার ধোয়া তুলসী পাতারে। শ্রীবৃন্দাবন এসেছে। আহা, যেন, 'ভিক্ষে দাও গো ব্রজবাসী, রাধে কৃষ্ণ বল মন, আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী এসেচি বৃন্দাবন।' দাঁড়া, সব মাগীকে আগে চালান দি, তারপর রস বুঝবি মাগীরা।

দারোগাবাবু পাশে-বসা এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, বুঝলেন ডক্টর পাল, কবে যে গভর্ণমেণ্ট পুরোপুরি ইম্মোর‍্যাল ট্রাফিক অ্যাক্ট করছেন, তদ্দিন এই সব ড্রেনগুলোর সংস্কার হবে না। এদের জন্যে সমাজ দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে। এক একটা বেশ্যাপল্লী এক একটা নরক।

ডাক্তার পাল নামে ভদ্রলোক বললেন, তা ভাল মন্দ তো থাকবেই সমাজে। সব ভালোর উল্টো পিঠই তো মন্দ। চাঁদের একপিঠে আলো আর একপিঠে অন্ধকার। ভাল কথা, সেদিনের সেই কেসটির কি হলো তারপর।

দারোগাবাবু বললেন, ও সেই এ্যাবডাকশনের কেসটা তো! আর বলবেন না। মেয়েটা ভদ্রঘরের। কলেজ যাবে বলে বেরিয়েছে। এমন সময় শয়তানটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, আপনিই তো আমাদের অফিসের কর্মকার বাবুর মেয়ে!

মেয়েটা বলে, হ্যাঁ।

—আপনার, মানে তোমার বাবা হঠাৎ ষ্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে গেছে। তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

কলেজে পড়া বুদ্ধিমতী মেয়ে। তবু ভুল করে বসলো। হয়তো ভাবতে পারে নি এই দিনে দুপুরে কোন বিপদ আসবে।

তাড়াতাড়ি হবে বলে কাছে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সি ডেকে ঐ লোকটার সঙ্গে গাড়ীতে উঠেছে। ব্যস্ একটু এগুবার পরই নাকের ডগায় ক্লোরফর্মের রুমাল চেপে ধরে অজ্ঞান করে একেবারে এদের পল্লীতে এক বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে।

কর্ম শেষ হয়েছিলো আর কি? সব আয়োজনই সমাপ্ত হয়েছিলো। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদ থেকেই পাঁচ কান হয়ে যায়।

ডাক্তার পাল বললেন, কি রকম!

—আর রকম। একটু পোষ মানিয়ে, কোলকাতার বাইরে পাচার করার মতলব ছিলো তো! বাড়ীওয়ালীকে দিতে হবে প্রতিদিনের জন্যে দশটাকা। বাড়ীওয়ালী আরেক শাহেন শা। তার মতলব বাইরে না বেচে, ওকে দিয়ে এখানেই কাজ করাবে।

—পোষ মানাতে পেরেছিলো?

—তা পারে কখনো। কলেজে পড়া মেয়ে। বাঘিনী বিশেষ।

দিন দুই পরে মক্কেলটি ঢুকেছিলো ঘরে। আদর করে বুঝিয়ে সুজিয়ে বোধ করি হাত ধরতে গিয়েছিলো। হাতের কাছে ছিলো গেলাস, তা দিয়ে একেবারে মাথা ছাতু করে দিয়েছে। এখন ব্যাটা হাসপাতালে মরবার দিন গুনছে। আর এদিকে বাড়ীওয়ালীর গুণ্ডার হাতে মেয়েটার সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। সেও হাসপাতালে। বাড়ীওয়ালীসুদ্ধো সব কটাকে চালান দেওয়া হয়েছে। সেশন কেস।

এমন সময় ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে সেই জগদীশ লালজী ঢুকছিলো। আমরাও ছাড়া পেয়েছিলাম। তবে তার আগে ইনস্পেক্টর বাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার পরিচিত দু চারজন ভদ্রলোকের নাম ধামও টুকে নিলেন। তাঁদের সঙ্গে কখন কোন সূত্রে পরিচয় তাও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এমন কি তাঁরা যে সত্য সত্যই আমাকে জানেন এ সত্য যাচাই করার হুমকিও দিলেন।

অবশেষে একটু আধটু সাহিত্য করি বলে একটু নরম হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সাহিত্য করেন তা নর্দমা ঘাঁটতে যাওয়া কেন? ও পাড়ায় না গেলে বুঝি সাহিত্য হয় না। ঐ তো আপনাদের দোষ মশাই। দিব্যি গানের গলা। দু পাঁচখানা রেকর্ড বেরুলো, অমনি ধরবেন মদ। সাহিত্য করবেন, দু পাঁচখানা বই বেরুলো কি না বেরুলো অমনি বোহেমিয়ান

হয়ে উঠবেন। বেপাড়ায় ছুটবেন। যেন মদ আর মেয়েমানুষ না হলে কথাশিল্পী হওয়া যায় না।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা যা বলেছেন মশাই। আমাদের খড়্গেশ্বর মুখুজ্যের ভাইপোটি সোনার চাঁদ ছেলে। সিগারেটটি পর্যন্ত খেতো না। ভালো গলা। ভালো গলার কাজ। সিনেমায় মিউজিক ডিরেকটার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন। আজ এ অভিনেত্রী কাল অমুক গায়িকা নিয়ে একাণ্ড সেকাণ্ড। এখন তো শুনছি ফাংশন করতে গেলে পিপে খানেক মদ ছাড়া চলেনা।

ইনস্পেক্টরবাবু বললেন, আজকালকার বাংলা সাহিত্যগুলো পড়ে দেখেছেন, যে যত ভালগার বিষয় নিয়ে ডীল করবে, তার বইয়ের তত কাটতি। আরে মশাই, পায়খানায় কীভাবে যেতে হয় সবাই জানে। মল নিঃসরণ কিভাবে হয় তাও কারও অজানা নয়। কিন্তু কেউ যদি সাহিত্যে তার হুবহু বর্ণনা দিতে চায় তাকে আপনি সাহিত্য বলবেন! আমাদের বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন পাবেন। বলতে যান, উত্তর পাবেন, পূর্বসূরীরা কী করেছেন? আরে স্বীকার করি সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীল বলে কিছু নেই, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী, আঙ্গিক তাও কি কিছু নেই? শরৎ চাটুয্যে চরিত্রহীন লিখেছেন, কিন্তু বের করুন দেখি কে তার মধ্যে চরিত্রহীন!

ডাক্তার বললেন, রাশিয়ার লেখক আলেকজাণ্ডার কুপরীন বেশ্যাদের নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টি, মানবতা বোধ, সহানুভূতি কোথায় পাবেন? রাশিয়ায় গণিকাবৃত্তি নিরোধের জন্য যাদের দান রয়েছে, কুপরীন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ইনস্পেক্টরবাবু বললেন, ভদ্রঘরের ছেলে আপনারা, আপনাদের মতো লোক ঐ সব পাড়ায় বেশী যাতায়াত করাটা কি ঠিক? কোনদিন কোন ফ্যাসাদে পড়বেন তার ঠিক আছে?

কী কারণে ওখানে যাই, বললাম।

ইনস্পেক্টরবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, প্রথম প্রথম ঐ সব কারণেই যাবেন। এরপর যাবেন অন্য কারণে।

ডাক্তার বলেন, দেখেন না প্রথম প্রথম লোকে মদ খায় অষুধ হিসেবে। সি.সি.র মাপে। পরে পেগে পেগে। তারপর আর সীমা পরিসীমা থাকেনা।

ইনস্পেক্টর বললেন, বহু দেখা আছে মশাই। কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়। বিন্দু বিন্দু করেই সিন্ধু প্রমাণ আবর্জনা জমে ওঠে।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনাদের রুচিরও বলিহারী যাই মশায়। কী করে যে ঐ সব জঘন্য রোগওয়ালা মেয়ে মানুষদের বিছানাপত্তরে বসেন! আমি তো ভাই চেয়ারে বসতে হলে হাতের খবরের কাগজ বিছিয়ে বসি।

সাবাস এক সাধুবাবার পাল্লায়ই পড়ে গেছি দেখলাম! এতক্ষণকার কাণ্ড-কারখানা দেখে কেমন যেন থ' মেরে গেছি। এই সব মনু পরাশর মথিরা সব থাকতে আমাদের সমাজের ভয়টা কি? এঁরা দেখছি শুচিবাইগ্রস্তা বিধবাদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। এরা দিন রাত্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম করেন নাকি! চেয়ারে বসলে এদের সিফিলিস্, গনোরিয়া হবার ভয়। কোন দিন বলে বসবে, ওদের সঙ্গে কথা বললে পর্যন্ত খারাপ রোগ হয়! আর দেখেছো কেমন ঘুঘুর মতো কথাবার্তা। অবশ্য ঘুঘুরা কথা বলতে পারে কিনা আমি জানিনে। তবে বাস্তু ঘুঘুরা পারে। কেমন একহাত কথা-শিল্পী স্বরশিল্পীদের নিলেন দুই বাছাধন। যেন ইনস্পেক্টর বাবুরা তুলসীপাতা ধোয়া জলখান। কিছুদিন আগেও না কে বলছিলো, এক ইনস্পেক্টর বাবুকে ব্ল্যাকে মদ সাপ্লাই করেন নিউমার্কেটের তার আত্মীয়। এক থানার বড়বাবুর ঘরে নাকি সন্ধ্যের পর মেয়ে মানুষের অনোগোনা ছিলো বলে প্রবাদ। আর তুমি তো তুমি ইনস্পেকটর বাবু, তোমার চেয়ে 'কত হামবা হামবা' লোক ওদের চরণামৃত খেয়ে খেয়ে উদ্ধার হয়েছে কে তার খবর রাখে। বারবণিতা বিনোদিনী। গিরিশ ঘোষের ছাত্রী বিনোদিনী। চৈতন্য লীলা শেষ করে বেরিয়ে এসেছেন, তাকে প্রণাম করতে হাত বাড়িয়ে ছিলেন এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। স্বর্ণ বলেছিল, বিনোদিনী থিয়েটার ছেড়েছিলো তার তখনকার অভিভাবক এক রাজা বাহাদুরের ইচ্ছেয়।

এবার উত্তর দিলেন ডাক্তার, সেজন্যে কি ওরাই একমাত্র দোষী ইনস্পে-ক্টরবাবু! অন্যান্য স্বাধীন দেশে সরকার থেকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট 'স্টেপ্' নেওয়া হয়ে থাকে শুনেছি। প্রতি সপ্তাহে সরকারী ডাক্তার আসে। প্রত্যেকটি বারবনিতাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে। রোগাক্রান্ত হলে সরকারী খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় হাসপাতালে। আমাদের দেশে কাগজে

কলমে কিছু আছে বটে, কিন্তু এসম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব নেই বললেই চলে।

ডাক্তারী পরীক্ষার তো বালাই নেই। রোগ হলে ওরা চেপে যায়, পাছে খদ্দের জানতে পেরে না বসতে চায়। তাহলে তো রোজগারই বন্ধ। ভবিষ্যৎ জীবনের এমন কিছু প্রতিশ্রুতি নেই যে বুড়ো বয়সে কোন সংস্থান হবে। ফলে অসুখ বিসুখ হলেও, একেবারে শয্যাগত না হওয়া পর্যন্ত লোক বসানো থামায় না।

ইনস্পেক্টর বাবু বললেন, আহা-হা, আইন বাঁচিয়ে লোক বসানো কে আর বন্ধ করতে পারছে। করছে করুকগে। তাদের সতী-সাবিত্রী ভাবতে হয় আপনারা ভাবুন গে। আমাদের দ্রষ্টব্য রাস্তা ঘাটে বেতাল বেচাল কিছু না করে। শান্তিভঙ্গ না করে। ভদ্র পল্লীতে, ইস্কুল কলেজ, হাসপাতালের কাছে বেশ্যালয় না খুলে বসে। কিন্তু শুধু তো দেহের ব্যবসায় এরা করে না, এক একটা বেশ্যাবাড়ী, জীবন্ত নরক। অগুন্তি পাপ সেখানে কেন্নোর মতো কিলবিল করছে। সমাজের এমন পাপ নেই যা ওখানে ঘটতে না পারে। আজকের কেসটাই দেখুন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভালো কথা, বলুন দেখি আজকের ব্যাপারটা ?

ইনস্পেক্টর বললেন, আর কি, নারী নিয়ে, নারীর জন্য সর্বদেশে যা হয়ে থাকে। আর বিশেষ করে ঐ সব নোংরা পল্লীর যা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘটনা হচ্ছে একটা মেয়ে খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, ওর ঘরে যে লোক আসতো এ কাজ তারই। অতি সত্যি কথা বেশ্যাবৃত্তিতে দেহদান ক্ষমতাটাই সব নয়। অন্য পাঁচ রকমের রিস্ক আছে। কিন্তু আজ যেখানে একটা মেয়ে মানুষ খুন হয়েছে, অন্য ক্ষেত্রে ঐ দেহের খদ্দেরটিই খুন হতে পারতো। নিদেন পক্ষে ঘড়ি আংটি টাকা পয়সা ছিনতাই ঘটতে পারতো। এরকম কেস আমাদের হাতে কম আসেনা। যা আমাদের কান পর্যন্ত আসেনা, তার সংখ্যা আরও বিপুল,। আরও অসংখ্য।

বললাম, কেন আপনাদের কানে আসে না কেন ?

ইনস্পেক্টরবাবু বললেন, আপনার যে কলম হারিয়েছিলো তা কি আমাদের

কানে দিয়েছিলেন ? কেন কেননি মশাই ? ঠিক তেমনি অনেক মক্কেল ও পাড়ায় যাওয়া আসা করে লুকিয়ে চুরিয়ে। লোক লজ্জায় ভয় আছে তো ! ও পাড়ার গুণ্ডা বদমাসরা মুখ দেখেই চিনতে পারে, কে কোন দলের। কে নবীশ, কে সবজান্তা। সুতরাং খদ্দেরদের অনেকেই কীলখেয়ে কীলচুরি করে তেমন কিছু না ঘটলে। বাড়ীতে পর্যন্ত জানায়না মশাই।

বললাম, বলেন কি ?

ইনস্পেক্টর বললেন, এই কিছুদিন আগে এক অভিভাবক এসে নালিশ করলো, তার ঘর থেকে সোনার ঘড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ করছে, নতুন যোগ দেওয়া চাকরটিকে। সন্দেহ আরও বাড়ে চাকরটি ঐ দিনই কাউকে না জানিয়ে একদিন কোথায় যেন কাটিয়ে এসেচে। সুতরাং সন্দেহ জোরদার হবার কারণ ছিলো। বিশেষ করে বাড়ীতে ভদ্রলোকের এক ভাই ছাড়া কেউ নেই। একটা বুড়ো রাঁধুনী আছে। তাকেও অবশ্য জেরা করা হলো। চাকরটাকেও ধরা হলো পরদিন। দু চার ঘা লাগান হলো। এমন সময় একদিন ঐ ব্যাপারেই ভদ্রলোকের বাড়ী গেছি। ভদ্রলোকের ভাইটিকে দেখলাম। টিপিক্যাল রক ক্লাব বয়। খোঁজ করতেই জানলাম, দাদার ঘড়ি পরে মাঝে সাঁঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দিতে যায়। কী ভেবে বলে উঠলাম, তোমার হাতে যে আংটিটা ছিলো, সেটা কোথায় ?

দাদারও টনক নড়লো। তাই তো, ভাইয়ের হাতের আংটি ! সেটাও কি চাকরে নিয়েছে। যদি তা নিয়েই থাকবে, ঘড়ি নিয়ে থানা পুলিশ হচ্ছে, আংটির কথা এলোনা কেন ?

একটু চেপে ধরতেই, সব রহস্য-উদ্ঘাটন। হ্যাঁ, লগনচাঁদ ভাইটিই সর্ব কর্মের কাঁঠাল বিচি। পেকেছেন এঁচড়েই। নভচর হচ্ছেন বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে, ঘড়ি আংটি খুইয়ে এসে ঘড়িরদায় চাকরের উপর চালিয়েছে। আর আংটি তো নিজেরই। দু চার দিন বাদে বললেই চলবে, হারিয়ে ফেলেচি।

দাদা বললেন, আংটি হারানোটা কীকরে বুঝলেন ইনস্পেক্টরবাবু। হেসে বললাম, কিছুটা ইনটুইশন, কিছুটা বাস্তবতা। ছোকরার হাতে আংটি পরার দাগ ছিলো যে। সদ্য সদ্য কাণ্ড তো, দাগ তখনও মিলোয় নি।

ডাক্তারবাবু বললেন, এযে বিছানায় মুড়িপড়া দেখে রোগী মুড়ি খেয়েছে ঠিক করে বলার মতো।

ইনস্পেক্টর বললেন, এসব খাটাতে হয়। কিন্তু যাক সে কথা, যা বলছিলাম, ঐ সব ডেনের কথা। ওখানে পাবেন না কি? চোলাই মদের কারখানা খুঁজুন, পাবেন। আফিম কোকেনের ব্যবসা নির্বিবাদে চলছে। জালটাকার কারখানা, তাও মিলবে। ইণ্টার ন্যাশনাল স্মাগলিং তার সন্ধান ওখানেও পেতে পারেন। স্পাইং বা গুপ্তচর বৃত্তির আড্ডার সন্ধানও পেতে পারেন। বিদেশের অনেক সহরে তো রাষ্ট্র বিরোধীদের আড্ডাস্থান এই সব পল্লীতেও অনেক আছে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে জ্ঞানী গুণীরাও নাকি তাঁদের আড্ডাস্থান হিসেবে এই বেশ্যাপল্লী গুলোই বুঝতেন। প্রাচীন ভারতে যে 'বিষকন্যা' বলে এক শ্রেণীর মেয়েকে কূটনৈতিক বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হতো তাও নাকি অনেক সময় এইসব পল্লীথেকে সংগ্রহ করা হতো। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে শত্রুভাবে যখন ঘায়েল করা যেতোনা, বন্ধুভাবে তখন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। আনন্দ ফুর্তির পর কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষার্থে তাঁদের সেবা করার জন্য যে সব সেবাদাসী তাদের কাছে পাঠান হতো, তাদের মধ্যে এই সব বিষকন্যাও পাঠান হতো। আর এই সব বিষকন্যাদের সঙ্গে যৌন সংযোগের ফলে নাকি শত্রুর মৃত্যু ঘনিয়ে আসতো। শুনেছি ছোটবেলা থেকে নাকি খুব সুন্দরী দেখে বেছে নিয়ে তাদের আফিম জাতীয় বিষ খাইয়ে খাইয়ে তাদের বিষকন্যা তৈরী করা হতো। শোনা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে গুপ্তচর শাখায় যেমন বহুবিধ গুপ্তচর ছিলো, তেমনি বিষকন্যাও ছিলো প্রচুর। আর এযুগেও তো শুনে থাকবেন আন্তর্জাতিক নারী গুপ্তচরদের বেশ মোটা অংশই এই সব পল্লী থেকে সংগ্রহ করা। মাতাহারীদের কথা তো শুনেই থাকবেন। যৌন আকর্ষণে শত্রু দেশের রাজপুরুষ বা সামরিক কর্মচারীদের আকর্ষণ করে' কৌশলে তাদের কাছ থেকে শত্রুদেশের সামরিক শক্তি, পরিকল্পনা, কলাকৌশল সংগ্রহ করতে এদের জুড়ি নেই। বলাবাহুল্য যথেষ্ট গুণের অধিকারী না হলে ভাল গুপ্তচর হওয়া যায় না।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমেরিকার এফ. বি. আই মানে ওখানকার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এক নারী গুপ্তচরকে

অনেক কষ্টে ধরেছিলো। দীর্ঘ দিন জাল পেতেও তাকে ঘায়েল করা যায় নি। অথচ সন্দেহ করা হয়েছিলো আগেই। এফ. বি. আই এর লোকেরা মেয়েটা যে ঘরে থাকতো তার পাশের ঘর ভাড়া নিয়েছিলো। এক্সরে ক্যামেরা দিয়ে দেয়াল ভেদ করে ফোটো তুলে ছিলো। কিন্তু সে ফোটোতে কিছু যৌন মিলনের দৃশ্য ছাড়া অন্য কিছু ধরা পড়েনি। আর যাই হোক তা থেকে গুপ্তচর বৃত্তির প্রমাণ হয় না। শেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জালে ধরে ছিলো পাখীকে।

ইনস্পেক্টর বাবু বললেন, তাইতো বলছিলাম, ওরা পারেনা হেন কাণ্ড-কারখানা ভূ-ভারতে নেই। অবশ্য দু'পাঁচজন যে ভাল না আছে তা নয়। দু পাঁচজন যে কোন কোন ক্ষেত্রে বড় হয়নি তাও নয়। সৎ সংসর্গে এসে সন্ন্যাসিনী হয়েছে এমন প্রমাণও আছে। ডাক্তার বললেন, থিয়েটারের বিনোদিনী শ্রীচৈতন্য সেজেছিলো। পরমহংসদেবকে গিরিশ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন।

পরমহংসদেব বললেন, আসল নকল এক দেখলাম।

রামকৃষ্ণ চৈতন্যবেশী ছেলেটাকে দেখতে চাইলেন। পরে শুনলেন সে মেয়ে। আর সে মেয়েও বারবণিতা পল্লীর। কিন্তু পরমহংস তাকে পাদস্পর্শ করতে দিলেন। পরমপিতার পাদস্পর্শ করে বিনোদিনীর যেন কেমন পরিবর্তন এসে গেলো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির লেখক অক্ষয়কুমারসেন মশায় লিখেছেন, বিনোদিনী ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য পুরুষ বেশে দক্ষিণেশ্বরেও গিয়েছিলো। অন্যেরা চিনতে না পারলেও ঠাকুর যাকে চিনতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, আশীর্বাদ করে তাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

অক্ষয়বাবু লিখেছেন,—

প্রভুর কঠিন পীড়া লোকমুখে শুনি
অন্তরে দুঃখিতা বড় বেশ্যা বিনোদিনী ॥

* * * *

নিরুপায়ে উপায় ভাবিয়া কৈলা মনে।
ধরিয়া পুরুষ-বেশ যাব দরশনে ॥

একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে।
চারি পাঁচ দণ্ড রাত্তি ইহার ভিতরে॥
যুবকের পরিচ্ছদে হাজির হেথায়।
বিরাজে যেথানে বাঞ্ছাকল্পতরু রায়॥

ইনস্পেক্টারবাবু বললেন, তাইতো বললাম, ব্যতিক্রম যত উঁচুদরেরই হোক তা তো স্বাভাবিকতার চেয়ে ভারী হতে পারে না। এ ছাড়া চোর, বদমাস, খুনেদের তো আশ্রয়স্থলই অনেক সময় ঐ সব পল্লী। বলতে পারেন, আমরা আছি কি করতে! কিন্তু আইনের হাত কতটুকু লম্বা। আইন থাকলে ফাঁকীও থাকবে। আমাদের মধ্যেও যে দুর্নীতি নেই তা নয়। তবে এ সম্পর্কে জনসাধারণেরও সহযোগিতা চাই। কারণ লাঠি দিয়ে চোর ঠ্যাঙ্গানো চলে, সমাজের দুষ্ট ক্ষত সারানো চলে না। সেজন্যে দরকার সামাজিক পরিবর্তন। দুর্নীতি সর্ব যুগে। কালিদাসের বইয়েও দেখবেন, শকুন্তলার হাত থেকে যে আংটি পড়ে গিয়েছিলো, তা জেলে পেলো মাছের পেটে। কোতোয়াল রাজসমীপে গেলো, জেলেকে দুজন অনুচরের হাতে রেখে। ফিরে এলো জেলের পুরস্কার নিয়ে। ঐ সঙ্গে ভাগাভাগির ব্যবস্থা করতেও বিলম্ব হলো না পুরস্কারের টাকার। আচ্ছা, এবার আপনারা আসুন। ভালো কথা, ডাক্তারবাবু আপনার রোগীর রিপোর্ট কালই পেয়ে যাবেন।

থানা থেকে বেরিয়ে এলাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই। পথেই আলাপ হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি। সম্প্রতি এম. ডি'র জন্য থিসিস্ জমা দিয়েছেন। কাছেই বাসা।

বললেন, আপত্তি না থাকে তো চলুন না একটু চা খেয়ে যাবেন।

না, আপত্তি আর কিসের। আর সত্যি বলতে কি, একটু চায়ের তেষ্টা যে না পেয়েছে তা নয়।

তা হলে আসুন। দোকানের চা বিচ্ছিরী লাগে।

চা খেতে খেতে বললাম, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, এটা কি সত্য নয় ওরা আছে বলে আমাদের সমাজের ভদ্র পরিবারগুলো দেহকামী পাষণ্ডদের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাচ্ছে?

ডাক্তারবাবু কি ভাবলেন, তারপর বললেন, আপনার কি ধারণা বারবণিতা আছে বলে কোন দেশে ব্যাভিচার দূর হয়! ব্যাভিচারিতা শুধু একটা মাত্র ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করেনা। সমাজে ধনতন্ত্র থাকলে তার সঙ্গে বারবণিতা থাকবেই। সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ অভিব্যক্তিই মানুষকে কু-প্রবৃত্তিতে আত্ম-নিয়োগ করতে বাধ্য করে।

ডাক্তারবাবু একটু থেমে বললেন, ধনতন্ত্রে ধন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী দরিদ্র। ধন থাকলেও ধনের বিলাসিতা আসে। অপব্যয়ের প্রবৃত্তি আসে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দারিদ্র্যের সুযোগ তাদের বিলাস আর অপব্যয়ের সুযোগ এনে দেয়। দুর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন অঙ্গাঙ্গী ভাবেই এসে পড়ে।

বললাম, এজন্য আর কিছু কি দায়ী নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, আগেই বলেছি সমাজ ব্যবস্থা ও যুগধর্ম কম দায়ী নয়। আগেই বলেছি, ব্যাভিচার আগেও ছিলো এখনও আছে। বরং বেড়েছে। একটা অর্থনৈতিক কারণ আরটি মানসিক কারণ। আগেকার দিনে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। শিক্ষাজীবনে ব্রহ্মচর্য অবশ্য পালনীয় ছিলো।

বললাম, সর্বক্ষেত্রে নৈতিক মান উচ্চ ছিলো এটা মানতে বাধছে ডাক্তার বাবু। পৌরাণিক যুগে সূর্যবংশীয় রাজকুমার দণ্ড মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে এসেছিলো। বিশ্বামিত্র কন্যা অজার রূপে মুগ্ধ হয়ে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে দণ্ডকে শাস্তি দেন। তার রাজ্য ধ্বংস করেন। সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই দণ্ডকবন বা দণ্ডকারণ্য। আর হরণ করে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন বলে অজার পুত্রের নাম হয় হারিত। কচ দেবযানীর কাহিনীও আপনি ধরতে পারেন।

ডাক্তার বললেন, আপনি গৌতম মুনির আশ্রমে পাঠগ্রহণাগত দেবরাজ ইন্দ্রকেই বা বাদ দিচ্ছেন কেন। গৌতমপত্নী অহল্যার রূপ ইন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। কী উপায়ে মনোবাসনা পূর্ণ করা যায়! ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার ধর্মনাশ করেন।

বললাম, গৌতমের তাই বলে অহল্যাকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি ডাক্তারবাবু! অহল্যা তো আপন ইচ্ছেয় ইন্দ্রের অঙ্কশায়িনী হয়নি। আর সে যুগে তো অনিচ্ছায় ধর্মনাশ হলে সমাজ তাকে গ্রহণ করতো।

ডাক্তারবাবু হাসলেন। বললেন, যদিও আমার কথা শেষ হয়নি, বলতে গেলে প্রসঙ্গান্তরেই চলে গেছি আমরা, তবু আপনার অবগতির জন্যই বলছি, শ্রীমতী অহল্যা দেবরাজকে চিনতে পারেন নি একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গৌতমও বলেছেন, পত্নী আপন স্বামীর যৌনরীতি বুঝতে পারে না এটা অবিশ্বাস্য। আসলে প্রাচীন কালের পঞ্চসতীর কাণ্ডকারখানাই আলাদা, বুঝলেন মশাই। তবে প্রত্যেকেই বড় গাছে নৌকো বেঁধেছিলেন, সারটিফিকেট পেয়ে গেছেন।

তবে এ সবই ব্যতিক্রম। সাধারণ ভাবে প্রাচীন ভারতে নৈতিক শিক্ষার মান উচ্চ ছিলো। আর গুরুগৃহে পাঠ শেষ করার পরই তারা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতো। বিয়ে-থা করে ঘর সংসার করতো। আমাদের মতো, 'বিয়ে করবো বৌকে খাওয়াবো কি' এ চিন্তা তাদের ছিলো না। পৃথিবী শস্যশালিনী ছিলো। জনসংখ্যা কম ছিলো। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ছিলো না। মিতাহার, মিতাচার ছিলো। সমস্ত ব্যাপারে একটা সংম-বোধ ছিলো। সামাজিক বন্ধন ছিলো। গুরুজনে শ্রদ্ধা ছিলো। গ্রামস্থ উচ্চ বংশের সন্তানও নিম্নবর্ণের বয়স্ক ব্যক্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতো।

বললাম, সমাজের এই পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক কারণটাই অন্যতম। তাই নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, নিশ্চয়ই। অর্থ থেকেই অনর্থ। অর্থের জন্যই অনর্থ। আগেকার দিনে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিলো। এ প্রথা ভাল কি মন্দ এটা বলার আগে বলবো এর ফলে সামাজিক ব্যাভিচার ছিলো সীমাবদ্ধ। অবশ্য বারবণিতা বৃত্তি ছিলো না একথা আমি বলছি না। আমি বলছি, উরু উরু দুরু দুরু কাণ্ডকারখানাটা ছিলো কম। মদন দেব পঞ্চশর নিয়ে এখনকার দিনের মতো কফিহাউস, লেকের ধার, আউটরামঘাট, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াত না। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন, 'শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনত না,

এই জন্যই তাহার মর্মস্থল অরক্ষিত ছিল।' এখন অর্থ নৈতিক টানাপোড়েনে পড়ে ছেলেমেয়েরা সময় মত বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে সরকারী সর্দা আইন, প্রাপ্ত বয়স্কা বয়স্ক হয়ে বিয়ে করার নিয়ম ভঙ্গ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। (এদিকে বিয়ের ফুল দেরীতে ফুটলেও যৌবন পুষ্প আগেই প্রস্ফুটিত হয়। আর একে যদি ক্ষুধা বলেন, তাহলে সময় মতোই ক্ষুধা লাগছে।) ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়ে সে ক্ষিদেকে দীর্ঘকাল চেপে রাখা সহজসাধ্য নয়। যারা পারেন তাঁরা আদর্শ পুরুষ। তাঁরা মহাপুরুষ। অথবা কাপুরুষ। নইলে যথা সময়েই কোকিল ডাকে, বসন্ত আসে। আর সে ডাকে সাড়া দেয়না এমন পুরুষ সর্বদেশেই কম। ফলে এই অতৃপ্ত কামনা পথ খোঁজে বহিঃপ্রকাশের। সুপথ কুপথ বেছে নেবার ক্ষমতা সবার সমান নয়। বংশানুবর্তন, পরিবেশ এ ব্যাপারে সুপথ গ্রহণে সহায়ক হয় বটে। কিন্তু অবৈধ পথ বেছে নেয় এমনদের সংখ্যা সমাজে কম নয়। এদিকে এই দলের সবাই কিছু কামনাতৃপ্তির উপায় হিসেবে গণিকালয়ই বেছে নেয় না। এটা স্বাস্থ্যপ্রদও নয়, সমাজের পক্ষে কল্যাণকরও নয়। উৎসাহপ্রদানযোগ্যও নয়।

বললাম, তাছাড়া লোক লজ্জা আছে, অর্থব্যয়ক্ষমতার প্রশ্ন আছে, ডাক্তার বাবু। অবশ্য একথা বলছিনে সমাজে অবৈধ কার্যের বেলায়ই পয়সা লাগেনা। কারণ তথাকথিত প্রেমের জন্যও যে অর্থব্যয় হয় না তা নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত ব্যয়ও করে বসার রেওয়াজ আছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নও আছে।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, সেতো বটেই। এ ছাড়া বারবণিতালয়ে যেয়ে পুরুষ তার যৌনক্ষুধা মেটাতে পারে বটে, মেয়েদের বেলায় সেরূপ করা সম্ভব নয়। অবশ্য শোনা যায়, পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে পুরুষ গণিকালয় রয়েছে। তথা কথিত অনেক স্যোসাইটি গার্ল নাকি সেখানে যাতায়াত করে থাকে। না, আমাদের দেশকে ধন্যবাদ, আমাদের দেশ এত এগোয়নি মশাই। ঐ যে বললেন, ইচ্ছে থাকুক বা নাই থাকুক, গণিকালয়ে যেয়ে অতৃপ্ত কামনা তৃপ্তির পথ খুঁজে নেবার প্রচেষ্টা অনেকেই করে না। অথচ বয়োবৃদ্ধি জনিত যৌবনের উপদ্রব থেকে যারা মুক্ত নয়, তারা সমাজের বুকেই তৃপ্তির পথ খুঁজে বেড়ায়।

বললাম, বৈধভাবে বিবাহোত্তর জীবন যাপনকারীরাও কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য নয় ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন, সেকথাতো আগেই বলেছি ভাই। যৌনবিলাসীদের কথায় আমি পরেই আসচি। যা বলছিলাম—সমাজে অতৃপ্ত চিত্তদের জন্য সামাজিক ব্যাভিচার সমাজ দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। গণিকালয় থাকা সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর এ ব্যাপারে সম্পর্ক বিগর্হিত কাণ্ডও বাদ যাচ্ছেনা। লোক জানাজানিও কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে। নর্দামা, ডাষ্টবিন, এখানে সেখানে তাদের পাপের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সব অবাঞ্ছিতদের মধ্যে যারা ঈশ্বর কৃপায় বেঁচে যাচ্ছে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্যই সম্ভবত তারা করে যাচ্ছে, পকেটমার জুয়ারীদের দেলে, বেশ্যালয়ের খিতমদগিরি কাজের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ক'টা অঘটনের সংবাদ পুলিশের কানে যায়, আদালতে ওঠে। কটি শকুন্তলাকে ফেলে রেখে যাওয়া মেনকার হদিশ পাওয়া যায়? কটি কুন্তী কানীন পুত্র জলে ভাসিয়ে পরবর্তী কালে খোঁজ খবর নেয়? খোঁজ খবর নেবার সুযোগ ও সাহসও কি আমাদের সমাজে আছে। ক্ষণিক আনন্দের জন্য ব্যাভিচারের পঙ্কে যে পদ্ম ফুটলো পাপ বলেই তাকে বিদেয় দেওয়া হয়। সেই বিদায় করার সময়ই যা ঝামেলা। ঋতু বন্ধে অব্যর্থ ঔষধও সব সময় কাজ দেয়না। কাজ দেয়না হাজার ডাইলিউশনের হোমোপ্যাথী ওষুধে। কড়া এ্যালোপেথীতে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আকন্দ, মনসা চিতের গাছে। অবশ্য কোন কোন হেতুড়ে নার্সিং হোমে সিঁদুর পরিয়ে গর্ভপাত ঘটানোর ঘটনা বিরল নয়। বিরল নয় হাতুড়ে ডাক্তার, অশিক্ষিতা দাই দিয়ে পাপ বিদায়ের প্রচেষ্টায় মূল স্কন্ধ গাছ উপড়ে ফেলার চেষ্টায়। খবরের কাগজে এ সব কাহিনী ফলাও করেই বেরোয়। কচি কচি খবরের কাগজ পড়ুয়া ছেলেদের অবসর সময়ের মুখরোচক আলোচনার পথ সুগম করে দিয়ে। বললাম, আইন আদালত কোলাম গুলো আরও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয় আমাদের দেশে। কিন্তু একশ্রেণীর পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়না বোধ হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, এর স্বপক্ষে যুক্তি রয়েছে। তবে ঐ হাতুড়ে নার্সিং হোমে সিঁদুর পরিয়ে গর্ভপাত ঘটানোর কথায় একট আমেরিকান গল্প মনে

পড়লো। ওখানে বান্ধবী সংগ্রহ প্রথা আমাদের দেশ থেকে অনেক উদার। তথাকথিত বান্ধবীদের সঙ্গে মেলামেশার হাজার সুবিধে। আর কে বিবাহিতা কে যে নয় তা তো বোঝার উপায় নেই। একবার এক থিয়েটারে একটা খুব রোমহর্ষক বই চলছে। জোড়ায় জোড়ায় নরনারী বসে বই দেখছে। ইন্টার ভেলের সময় থিয়েটারের ম্যানেজার ঘোষণা করলেন, এক স্বামী ভদ্রলোক তার স্ত্রীর জন্য ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন এই মাত্র এসে।'

ড্রপ তুলে বই আবার আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে ড্রপ উঠে, অডিটারিয়মের আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেলো ঘরে একটিও মহিলা নেই। প্রত্যেকই ভেবেছেন তার স্বামী নিশ্চয়ই খোঁজ করতে এসেচেন। আমাদের দেশেও কাণ্ড মাণ্ড দেখে এক এক সময় মনে হয়, এদেশের হঠাৎ গজিয়ে উঠা তথাকথিত নার্সিং হোম গুলোতে খোঁজ নিলে, অনেক ভূয়ো স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু খুঁজবে কে? সিঁদুর পরিয়ে এনে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্যের কারণে গর্ভপাত ঘটালে নার্সিং হোম, সরকারী হাসপাতালের সাধ্য আছে কি সব সময় আসল নকল বেছে বের করা! বিশেষ করে এই ধরণের অধিকাংশ কেসই আসে কোন না কোন প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ ওয়ালা কোন না কোন অর্থলিপ্সু তথাকথিত ডাক্তারের হাত দিয়ে যারা নিজেরা দায় উদ্ধার করার রিক্স নিতে সাহস পায়না, আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া কেসগুলো।

বললাম, গর্ভপাত ঘটায় না এমন ঘটনাও তো দুর্লভ নয় ডাক্তারবাবু। আর সব সময় প্রেমিক প্রেমিকারা বিয়ের আগে এতখানি এগোয় না। ডাক্তার বললেন, সে তো বটেই! অনেক সময় নিজের ভালবাসার ফলকে মেনে নিয়ে পুরুষ দায়িতাকে বিয়ে করে। চাপে পড়েও করে। আর এগুনো পিছুনোর ব্যাপার বলছেন। হ্যাঁ, ভীতি একটা আছে বৈকি! কিন্তু আদিম বন্যতা বলে একটা কথা আছে তো! আগে তবু ভয় ভীতি ছিলো মশাই, এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের শত পথ সামনে। এই যে ধরুন 'লুপ' প্রথা চালু হয়েছে, এতে আমাদের মতো দেশের চরম উপকার সংঘটিত হবে। কিন্তু এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধীদের কাছে এটা আশীর্বাদ রূপে যদি দেখা দেয়, কী দিয়ে ঠেকাবেন বলুন!

বললাম, কিন্তু আপনাদের মুখেই শুনেছি, বিবাহিত, অবিবাহিত কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম, আপনি আবার সেই ভুয়ো স্বামী স্ত্রীর কথা তুলবেন, কিন্তু এক বা একাধিক সন্তান না হলে নাকি 'লুপ' ব্যবহারের উৎসাহ দেওয়া হয় না!

ডাক্তারবাবু বললেন, কার কাছে শুনেছেন ?

—এক ফেমিলী প্লানিং এর কর্মচারীর মুখে।

—ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আইন ফাঁকী দিতে যারা পারে, তাদের অসুবিধা আছে কি ? আইনকে যারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় তাদের সংখ্যা কি আমাদের দেশে কম নাকি মশায় ?

বললাম, আপনি এ সম্পর্কে কি প্রতিকার ব্যবস্থা চিন্তা করেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু বললেন, দেখুন আমি সমাজ সংস্কারক নই। সাধারণ একজন ডাক্তার হিসাবে আমি যা চিন্তা করতে পারি, সেটা হচ্ছে, আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বাল্য বিবাহ চালু করা। না, আমি গৌরীদানের কথা বলছি নে। আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌবন আসে আগে। ঝরেও যায় আগে। কথায় বলে আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়ে যায়। একদল কারণ দেখায়, অল্পবয়সে বিয়ে হলে, মা ষষ্ঠীর কৃপা বেশীমাত্রায় বর্ষিত হলে এমনটা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু একথা মানিনে মশায়। ওকথা যদি সত্য হতো তাহলে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েরা এমন জীর্নশীর্ণ চেহারার হয় কেন ? আপনি এক'শ'টা যুবতী মেয়ে দেখুন, তাদের জীবনে বসন্ত যেমন এসেচে, শীতের হাত থেকেও তারা বাঁচেনি। ছেলেদের দিকে তাকালে বক্রমেরুদণ্ড, চোখ-বসে-যাওয়া ছোকরাই বেশী পাবেন। অন্য প্রদেশগুলো থেকে বাংলা দেশ তো আরও খাজা। এখানে ড্রেন পাইপ প্যান্ট, পয়েণ্টেড শুওয়ালা টেডী বয়েজ পাবেন, কিন্তু যে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য থাকলে ড্রেন পাইপ প্যান্ট মানায় তা পাবেন না।

অথচ ড্রেন পাইপের দেশ আমেরিকানদের তো খারাপ লাগেনা মশায়। বহুদিন আগে একবার কোনারক গিয়েছিলাম। উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্পে, এবং অন্যান্য শিল্পেও দেখা যায়, নারীদেহে উর্দ্ধাঙ্গে কোন আবরণ নেই। হতে পারে টপলেসএর প্রচলন সে যুগেও ছিলো! আমার কিন্তু মনে হয় বক্ষ

সৌন্দর্য তাদের সৌন্দর্যের লক্ষণছিলো। এযুগে বক্ষসৌন্দর্য বলে কিছু নেই, সুতরাং বক্ষবন্ধণীর প্রয়োজন। আরও একধাপ যারা এগিয়ে গেছে তারা 'ফলস্ ব্রেষ্ট' ব্যবহার করে। আমাদের ড্রেন পাইপ ভায়ারা যদি 'ফলস ব্যাক' পরা আরম্ভ করে, তাহলে সম্ভবত ভারসাম্য বজায় থাকে।

হেসে বললাম, প্রথমটার কথা যদিও কানে এসেছে, দ্বিতীয়টির কথা কিন্তু শুনিনি।

ডাক্তারবাবু বললেন, শুনবেন, শুনবেন। যে গতিতে প্রগতির দিকে এগুচ্ছি আমরা, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা শীগ্‌গীরই পাল্টালো বলে। বলবেন, আজকাল যা খাচ্ছি মশাই, স্বাস্থ্য হবে কি! কিন্তু তার আগে বলবো, পশ্চিমদেশের লোকেরা কী খায় মশায়! ডালরুটি ছাতুলঙ্কা খেয়ে যদি তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, আমাদের তা থাকবে না কেন? কিন্তু তা যদি আমরা করবো তাহলে এত চা সিগারেট বিক্রী হবে কি করে?

ডাক্তারবাবুকে পুরানো প্রসঙ্গে ফেরাবার জন্য বললাম, হ্যাঁ, বাল্যবিবাহের কথা সম্পর্কে যা বলছিলেন—!

ডাক্তার বললেন, ঐ দোষ আমার। থামতে জানিনে। আসলে এতকথা বলার আছে যে কোনটা রেখে কোনটা বলি তাই হয় মুস্কিল। বলছিলাম, আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের উরুউরু ভাব দূর করতে হলে, মেণ্টাল কনসেণ্ট্রেশন আনতে হলে, যৌবনটি যেই এলো, জোড় বেঁধে দাও। নইলে ইঁচড়ে পাকা প্রেমের জ্বালায় বড়দের ঘরবাড়ী বিক্রী করে মরুপ্রান্তরে যেয়ে বাস করতে হবে। যে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমরা বেশী বয়সে বিয়ে করার রেওয়াজ ধরেছি, সেই আমেরিকা, জার্মেনী প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশগুলোতে কী ঘটছে একবার লক্ষ্য করুন। তাদের দেশে অবাধ মেলামেশার সুবিধে আমাদের দেশ থেকে হাজরগুণ বেশী। এমন কি বিয়ে না করেও অনেক জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কারণ যৌন মিলন সেখানে আমাদের মতো এতো অবাঞ্ছিত নয়। আসলে এটাকে ওখানকার অনেক ছোকরা স্পোর্টস্ বলে মনে করে। আর গর্ভপাত, গর্ভনিরোধের তো হাজার গণ্ডা সুবিধে। কিন্তু অসংযত যৌনজীবন যাপনের ফল সমাজকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে যুবক-যুবতীরাও বুঝতে পারছেন। ঐ বিবাহ বন্ধন তো সেখানে একটা মিউচুয়াল

কনট্রাক্ট ছাড়া কিছু নয়! ডিভোর্সতো সেখানে কথায় কথায়। স্বামীর ঘুমের ঘোরে নাক ডাকলে, তা নাকি স্ত্রীর মানসিক পীড়ার কারণ বলে গন্য হয়। স্ত্রী বিড়াল নিয়ে শুলে স্বামীর সারারাত ঘুমের দফানিকেশ। ভালকথা, আগেই বলে রাখি, সবার বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয়। আদর্শ দম্পতি সে দেশেও আছে। তবে তাদেরও অনেকে বয়স কালে স্বামী হারালে কাচ্চাবাচ্চা নিয়েও মিসেস কেনেডীর মতো পাত্রী অপবাদের খোরাক হন। সত্যি বলতে কি যে দেশে পুরুষ বা নারী পাঁচ সাতবার বিয়ে করে, তাদের দাম্পত্য জীবন কেমন সহজেই বুঝতে পারছেন। সে গৃহতো সরাইখানা। সে বন্ধন তো, উড়ার নামান্তর মাত্র। এমন যে দেশ আমেরিকা, সেদেশের ছোকরারাও অনেক ঘা খেয়ে বাল-বিবাহে আকৃষ্ট হচ্ছে। না, শুধু যে যুদ্ধে যাবার ভয়ে সেকথা সত্য নয়। অন্তত প্রথম বিয়েটা তারা যেন আর অন্যপূর্বাকে অন্যপূর্বকে করতে চাইছেনা। সে জন্যে তো সারা জীবনই পড়ে আছে। প্রতিবারই বলা চলবে, এইটির জন্যই যেন আমার জীবাত্মা উন্মুখ হয়েছিলো। এই যে বাল্য-বিবাহ প্রবণতা এটা অভিশাপ না আশীর্বাদ তা সমাজকর্তারা ভাববেন। তবে এটা সত্যি এর ফলে সামাজিক ব্যাভিচারের মাত্রা যে কিছুটা কমবে, তা হয়তো মিথ্যে নয় ভায়া।

বললাম, ওদেশে সবই মানায়। আমাদের দেশের মতো 'ওয়ান পাইস্ ফাদার মাদার' নয়। তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো কত সুদৃঢ়। সেখানে বাৎসরিক তিন হাজার ডলারের কম রোজগার করলে তাদের গরীব বলা হয়। তাদের সংখ্যা যাতে না বাড়ে এজন্য আমেরিকান সরকারের চিন্তার অবধি নেই। আর এই সব গরীবদের বাড়ীতেও থাকে একটা টেলিভিশন সেট, একটা কাপড় ধোয়া কল। একটা মোটর গাড়ী লক্ষ্য থাকে। বেকার সেখানে নেই বললেই চলে। আর আমাদের দেশে! জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে হাজার কাঁটা। বেকার এখানে লক্ষ লক্ষ। আর জীবনে রুজিরোজগার না করে একটা পরের মেয়েকে ঘরে এনে চাঁদ ফুল দেখে দিন কাটালেই তো চলবেনা। উদর নামক ইঞ্জিনে অন্ন নামক কয়লা প্রদান করা না হলে শুধু ইঞ্জিন নয়, গাড়ীসুদ্ধ বিকল হবে ডাক্তারবাবু! আর পেটেই যদি কিছু না জুটলো, অর্থনৈতিক কাঠামোই যদি ভেঙে পড়ে, ভুয়ো সতীপনা চারিত্রিক

শুচিতা নিয়ে মাতামাতি করে কী ফল হবে? মানুষের মনে যখন জীবন সম্পর্কে হতাশা আসে তখনই মানুষ বিকল্পবস্তু দিয়ে নিজেকে ভুলাতে চায়; কেউ মদ ধরে, কেউ পতিতালয়ে যায়। কেউ রেস খেলে টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখে। সুস্থ মন, সুস্থ দেহ, সুস্থ সমাজ শয়তানের লীলাভূমি হতে পারে না।

ডাক্তার বললেন, আপনি কি মনে করেন পৃথিবীর সর্বত্রই এই হতাশা!

বললাম, মনে হয় তাই। জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর আমদানী। আজকের পৃথিবী এই অনিশ্চয়তার ব্যাধিতে ভুগছে। তাই কেউ নিজেকে ভোলাচ্ছে বিলাস দিয়ে, কেউ ফুটপাথে ঘুমড়ি খেয়ে। যে আমেরিকার কথা বললেন, তারাই কি সুখী। সেখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নত সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মান বজায় রাখতে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না সেখানে। একটা কোট ধোয়াতে লাগে পনেরো টাকার মত, চুল কাটাতে সাত টাকা থেকে আট টাকা। রাশিয়ায় ইংলণ্ডে একজোড়া জুতো যাট সত্তর টাকা। জাপানে এক কিলো মাংস কুড়ি টাকা; এক কিলো টমেটো চার টাকা। রাশিয়ায় একটা সাধারণ কম্বল একশ' রুবল। আর সেখানকার নৈতিক জীবন! আমেরিকায় প্রতি কুড়ি মিনিটে একটা করে খুন। প্রতি তিন মিনিটে একটা ছিনতাই এর ঘটনা। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কলুঠেরাদের জ্বালায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝানু গোয়েন্দারা পর্যন্ত হিমসিম। ইংলণ্ডের টেডী বয়েজদের জ্বালায় রাস্তা চলা ভার। রাতের অন্ধকারে ওখানকার হাইড পার্কে যে ঘটনা ঘটে আমাদের দেশের নিষিদ্ধ পল্লীগুলো সে তুলনায় তো পবিত্র জায়গা।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, নৈতিক অবনতি ও সমাজবিরোধীতার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অনেক দেশই আমাদের দেশ থেকে অনেক বেশী অধঃপতিত। বিয়ের ব্যাপারটাই দেখুন না, আমাদের দেশের মতো পবিত্র দাম্পত্য জীবন পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। এই যে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে, তুলনামূলকভাবে বিচার করলে তা প্রায় কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। একেবারে অনিবার্য কারণ না হলে, বিচারকরা এ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। নিছক খেয়ালের বশে, সাময়িক ভুল বুঝাবুঝিরূপ মানসিক নিপীড়নের

জন্য এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রশ্রয় পায় না। এর কারণ হচ্ছে ভারতীয় ধর্ম-কেন্দ্রিক ঐতিহ্য। স্বামীকে যতই সহকর্মী, পার্টনার প্রভৃতি আধুনিক বিশেষণ দেওয়া হোক না কেন, হিন্দু মেয়ের কাছে আজও স্বামী একটা মহান ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রতীক। অবলম্বন। সংসার নারীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

বললাম, পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রগতিশীল বলে দাবী করে। সেখানকার সমাজ ব্যবস্থাপকেরাও সে দেশের বাল-উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। তার প্রতিকার কল্পে রাশিয়াতে কিশোর-কিশোরীদের উপর বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। কোন কিশোর-কিশোরী রাত নয়টার পর পার্কে বেড়াতে পারবে না। কিশোরদের মোটর গাড়ী চালানো চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ইত্যাদি ইত্যাদি আরো প্রগতিশীল সহরে। সত্যি কথা বলতে কি ডাক্তারবাবু, আমাদের দেশের ছেলে ছোকরাদের মধ্যে শালিনতাবোধ অনেক বেশী। আমি অবশ্য ঐসব দেশের তুলনায়ই বলছি। তবে আমাদের দেশের গণিকালয়গুলো যে অস্বাস্থ্যকর, এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। এমন কি কোন ক্ষেত্রে ইনস্পেক্টরবাবুর সঙ্গেও।

কিন্তু এ ব্যাপারেও আমার বক্তব্য সরকারই এর প্রতিবিধান করতে পারেন। শুনেছি বেশ্যা বৃত্তি আইন করে বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাদের দ্বিজু চৌধুরীর মতে, সেখানেও আইনের ঘরে ফাঁক আছে। কালো টাকা ধরা পড়ার ভয়ে যেমন চাকরকে দান করাব রেওয়াজ আছে কোন কোন কালবাজারীর। তেমনই আইন বাঁচাতে কেউ যদি রাস্তার লোক ধরে ভুয়ো বিয়ের অনুষ্ঠান ঘটিয়ে, ভেতরে ভেতরে বেশ্যাবৃত্তি চালালে কে ধরবে তায়। তবে শুনেছি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এদের একটা সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে রুজি রোজগারের অন্য ব্যবস্থা হলে এদের এই পরিবেশ থেকে এই বৃত্তি থেকে রক্ষা করা যায়। অন্য কোন কায়িক শ্রমে এদের নিযুক্ত করলে এরা সুষ্ঠু ভাবেই করতে পারবে বলে অনেকেরই ধারণা! বিশেষতঃ, বহু লোক বসিয়ে নিজেদের দেহেরও সর্বনাশ করে। নারীত্ব বলে যে একটা বস্তু আছে তা ভুলে যায়। অথচ অন্য কাজ এরা সহজেই করতে পারবে। এরা স্বাভাবিক নিয়মেই সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে সাহসী। শারীরিক দক্ষতা এমন কি একটা পুরুষালী রুক্ষতারও অধিকারী। শ্রমমূলক

কাজে যেটা দরকার। দ্বিজু চৌধুরী একদিন বলেছিলো, যুদ্ধে যদি নারীবাহিনী, পুলিশে যদি নারী-পুলিশ দরকার হয়, এদের নিতে বলো রায় মশাই।

ডাক্তার বললেন, পরিকল্পনাটা ভালই। কিন্তু কি জানেন, এতে অসুবিধে আছে। পুনর্বাসন দিলেন, কিন্তু স্বভাব কি সহজে মরবে। বিশেষত যদি তাদের নিষ্কর্মা বসিয়ে খাওয়ান হয়। পেটের চিন্তে মানুষকে অনেক সময় কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। বেতাল বেচাল রকব্লাব বয়সেরও দেখা যায়, কোন কাজে ঢুকলে স্বভাব ফেরে। তবে ওদের যদি শ্রমমূলক কাজে নিয়োগ করা হয় তবে উন্নতি ঘটতে পারে।

বললাম, আমি তো সে কথাই বললাম ডাক্তারবাবু। কেউ কেউ বলেন রিফিউজী পি. এল. ক্যাম্পগুলোতে সরকার বসিয়ে বসিয়ে ক্যাশডোল দেওয়ার ফল ভালো হয়নি। একদিকে যেমন তাদের কর্ম পঙ্গু করা হয়েছে, বিরাট একটা শক্তির অপচয় ঘটানো হয়েছে, অপর দিকে তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক অধঃপতনের পথও সুগম করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান মাধ্যমে ঐ শক্তিকে কাজে লাগানো যেতো। আমি একসময় কৃষ্ণনগরের কাছে একটা ক্যাম্পে ছিলাম। একটা বিরাট যুবশক্তির জন্য কোন কলকারখানা নির্মাণ করে তাকে কাজে লাগানো হয়নি। পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ করে খাবার সুযোগ করে দেওয়ার কথাই অনেকে বলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা গণিকালয়ে যায় তাদের উপায় কী হবে? গণিকালয়ে সব শ্রেণীর লোক যায়। শ্রেণী বলতে আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের কথা বলছি। অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে গায় খাটা লোক সবাই। আবার তেমনি অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক বৃদ্ধ সব শ্রেণীর লোক। স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত পুরুষ যায়। স্ত্রীসঙ্গ লাভ করেন যারা তারাও। অবশ্য আমার বক্তব্য এ নয় সমাজের সব মানুষই গণিকালয়ে যায়। প্রতি স্তরের মধ্য থেকে বেশ একটা মোটা অংশ নিয়মিত, অনিয়মিত ভাবে যেয়ে থাকে।

বললাম, এদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোক বেশী যায় বলে আপনার ধারণা ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, বিভিন্ন দেশের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতে দেখা গেছে, পতিতালয়ে যারা যায় তাদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যা শতকরা ষাট ভাগ। আনুমানিক পঁচিশ ভাগ অবিবাহিত। বাকী পনেরো ভাগ প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ।

বললাম, বিবাহিতদের বারবনিতালয়ে যাবার কারণ কি ডাক্তারবাবু? তাদের তো ঘরে স্ত্রী রয়েছে, সংসার রয়েছে, সামাজিক সম্ভ্রমের প্রশ্নও আছে। অবশ্য সেটা সবার বেলায়ই।

ডাক্তারবাবু বললেন, বিবাহিত ব্যক্তি হলেই যে তারা স্ত্রীসহ বসবাস করেন এটা সত্য নয়। মনে করুন হাজার হাজার কলকারখানার শ্রমিক আছে, তাদের সামান্য রোজগারে স্ত্রী নিয়ে বাসা করে শহর বা শহরতলী অঞ্চলে থাকা সম্ভব নয়। আবার অনেক লোক আছে যাদের গ্রাম্য সংস্কার আছে, তাদের দেশ থেকে শহরে স্ত্রী আনা গুরুজন, সমাজ পছন্দ করে না। তারা একক ভাবেই শহরাঞ্চলে বাস করে। এইসব পুরুষদের, যারা একবার স্ত্রীসঙ্গ পেয়েছে, স্ত্রীসঙ্গবিরহিত অবস্থায় দীর্ঘদিন যৌনাবেগ দমন করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কাজের চাপেই হোক, অর্থকরী কারণেই হোক Week endএ বাড়ী যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সস্তায় ক্ষণিকানন্দ লাভের জন্য তারা ছোটে পতিতালয়ে। তাদের সামর্থ্যানুযায়ী পাড়ায়ই তারা যায়। এই দলে শুধু শ্রমিকরাই পড়ে না, পত্নী সঙ্গ বিহীন যৌনাবেগ দমন রহিত যে কোন প্রবাসীর পক্ষেই খাটে। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমও যথেষ্ট আছে।

বললাম, কিন্তু যারা স্ত্রী নিয়ে বাস করে তাদের পতিতালয়ে যাবার যুক্তি কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু হাসলেন। হেসে বললেন, আপনি সন্দেশ ভালবাসেন?

বললাম, সন্দেশ আবার কেনা ভালবাসে।

—তা সত্ত্বেও বাজারের, তেলে ভাজা খানতো!

—তা মাঝে সাজে খাই বৈকি?

—সন্দেশের তুলনায় তেলে ভাজা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। তবু লোভে পড়ে সেই তেলেভাজা খান। অভ্যাস বাড়তে বাড়তে পেটের দফা নিকেশ করেন, তবু মুখের স্বাদে খেতে সাধ যায়। তুলনাটা অবশ্য হুবহু খাটে না।

গান্ধীজীর ভাগ্যে পর্যন্ত এ দুর্ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিলো। অন্যের হলে এটা আমরা জানতে পারতুম কীনা সন্দেহ। আত্মজীবনীকার হিসেবে গান্ধীজীই অন্যতম যিনি নাকি নির্দ্বিধায় নিজের দোষ ত্রুটি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। ডাক্তারবাবু গান্ধীজীর Autobiography-খানা আলমারী থেকে এনে দেখালেন। গান্ধীজী লিখেছেন, 'My friend once took me to a brothel. He sent me in with the necessary instruction. It was all pre-arranged. The bill had already been paid...... I sat near the woman on her bed, but I was tongue-tied. She naturally lost patience with me, and showed me the door, with abuses and insults......I can recall four more similar incidents in my life.'

ডাক্তারবাবু বললেন, "বাংলা করলে কথাগুলো দাঁড়ায়. আমার বন্ধু একবার আমাকে এক পতিতালয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিল। এ সবই ছিলো পূব পরিকল্পিত। পাওনা (বিল) আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।.... আমি স্ত্রীলোকটির কাছে বিছানার উপর বসেছিলাম কিন্তু আমি বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলাম। (স্ত্রীলোকটি) স্বভাবতই আমার উপর ধৈর্য-হারালো এবং গালাগাল ও অপমান করে দরজা দেখিয়ে দিলো।.....আমার জীবনে এই ধরণের আরও চারটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে।'

একটু থেমে ডাক্তার বললেন, দেখুন অবিবাহিতদের মধ্যে একদল সত্য সত্যই সাময়িক যৌন উত্তেজনা প্রশমণ করতে যায়। এই যে যৌন উত্তেজনা এটা বহুবিধ কারণে আসতে পারে। বংশানুবর্তন থেকে আসতে পারে। পরিবেশ থেকে আসতে পারে। উপযুক্ত বয়সে বিয়ে না করে যৌন কৃচ্ছ্রতা পালন করলেও আসতে পারে। আধুনিক জীবনে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ সিনেমা, বিজ্ঞাপন, পুস্তক এ ব্যাপারে দায়ী হতে পারে। গৃহ পরিবেশ, রাস্তা ঘাটের নানা রঙীন প্রজাপতির মেলা, বিবিধ কু-দৃশ্য এজন্য দায়ী হতে পারে। অর্থনৈতিক কারণে গৃহসমস্যা একটা বড় সমস্যা। একই ঘরে স্বামী স্ত্রী বড় ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে শুতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিজেদের যৌন অনুষ্ঠানে যতখানি সতর্কতা দরকার, আবেগ উত্তেজনায় অনেক সময় অভিভাবক

অভিভাবিকা সেদিকে খেয়াল করেন না। অনেক সময়, 'ওরা কী বুঝে' এই ধরণের আত্মপ্রসাদও তাদের মধ্যে থাকে। এই 'ওরা'ও যে কিছু বোঝে, অনেক সময় নিজদের ঘরে ঘরেই যে বোঝে, তার নজিরও কিছু কম নয় এদেশ ওদেশে। এমনি ভাবে এঁচোড় পাকা হবার পথ খুলে যায়। এ নিয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে রসাত্মক গল্প চলে। তারপর সুযোগ পেলে অধঃপাতের আপাত রঙীন পথে পা বাড়ায়। তাই বলছিলাম, বারবনিতালয় উঠিয়ে দিলেই কি সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা কমবে মশাই ?

বললাম, তাহলে ?

ডাক্তার বললেন, সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করলে এরও প্রতিকার হয়। আলেকজাণ্ডার কুপরিণ সাহেব তার 'য়্যামা ডুপিট' বইতে লিখেছেন, যুবকদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে চাইলে কী করা যেতে পারে। 'মোটা বিছানার চাদর, শক্ত তক্তপোষ, প্রচুর আলোবাতাস খেলতে পারে এমন সুশীতল শোবার ঘর' তাদের জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। সুনিদ্রা যাতে হয় তার ব্যবস্থা। প্রত্যূষে ঘুম থেকে ওঠা, ঠাণ্ডা জলে স্নান করা খুব ভালো। সাদাসিধে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত মশলাপাতি, ঘৃতপক্ক খাদ্যাদি বর্জন করতে হবে। এছাড়া তাদের গ্রন্থাগারগুলোরও কর্তব্য আছে। সৎসাহিত্য, সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনীমূলক গ্রন্থপাঠে উৎসাহ দিতে হবে। প্রচুর কাজ ও খোলা হাওয়ায় খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার ব্যাপারে তাদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা করলে, নারী পুরুষ সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল, আকর্ষণ কমবে। আর সব চেয়ে বড় কথা, তরুণ বয়সে ছেলেদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে আরও একটু আগে। ধরুন একটা বাড়ীতে তিনচারিটি বড় বড় ভাই রয়েছে। বড়টিরই বিয়ে হয়নি। ছোটটি জানে উপরের গাড়ীগুলো পাস্ না করালে তার বড় সিগন্যাল ডাউন হবে না। ফলে তাকে একটা অনিশ্চয়তা রোগে ভুগতে হয়। কিন্তু যদি ছেলেমেয়েরা বোঝে তাদের একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে থা হবেই, তাহলে এই অনিশ্চয়তাজনিত বেদনায় ভুগতে হয় না। নিমন্ত্রণে ভোজ খেতে যেয়ে ভোক্তা যদি আগেই জানে কী কী খাওয়ানো হচ্ছে অর্থাৎ মেনু কী, তাহলে আর দালদার লুচি আর ছক্কা

দিয়ে পেট ভরাবে না। একটু পরই যে পোলাও আসচে, সন্দেশ রসগোল্লা আসচে এ বিষয়ে তাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে।

বললাম, সে তো বটেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ ভালো কথা, কিন্তু বিয়েটা যৌবন আসার সময়ই ঘটা ভালো বলে আমারও মত। আর কুপরীণ সাহেবের মত আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিদের মত। এ যুগেও অনেক সমাজ সংস্কারক একথা বলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, দেখুন, আমাদের জীবনটা কেবল বিয়ে থা নিয়েই নয়, যৌনাচার নিয়েও নয়। কিন্তু একটা বৃহৎ জীবনে এটা অস্বীকার করার বিষয়ও নয়। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, উপদেশ দেওয়া সোজা, উপদেশ পালনের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। সবচেয়ে একটা ভালো উপদেশ, যে বীর্যক্ষয়ে এত আনন্দ, সে বীর্যরক্ষণে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ। একথা এক মহাপুরুষের।

কিন্তু ক'জন শুনছে সে কথা। আগেকার দিনে ঋষিরা উর্দ্ধরেতা হতেন, হবার পরামর্শ দিতেন। এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হবার প্রয়োজন আছে। যে জাতির নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ নয়, সে জাতির স্থায়িত্ব খুব বেশী হয় না বলেই আমার ধারণা। সে বিয়ে করা বউই হোক, আর বারবণিতাই হোক। জর্জবার্ণার্ড শ' এক জায়গায় বলেছেন, Marriage is the legal prostitution, বিয়েটা হচ্ছে আইনসিদ্ধ বেশ্যাবৃত্তি। কথাটা চিন্তা করে দেখুন, অস্বীকার করতে পারবেন কি?

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। ডাক্তারবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আর একটু চা হোক, কী বলেন? ছাতা ছাড়া যাবেন কি করে!

হেসে বললাম, না আমার তাড়া নেই তেমন। আর যেতে হলে দ্বিজু-চৌধুরীর জন্যেই যেতুম। কিন্তু আজ কি আর চৌধুরীর গানের আসর বসবে! তার চেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু শিখছি। ভালোই লাগছে আমার।

ডাক্তারবাবু হাসলেন। হেসে বললেন, আমার হাতেও আজ কাজ নেই। আর কিছু জ্ঞানদানের স্পৃহাও বেশ চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রোতা হিসেবে আপনি বেশ ভালোই। তবে একটু চাপা এই যা।

বললাম, এ সম্পর্কে ধারণাও আমার কম। যাও আছে তাও ভাসাভাসা।

ডাক্তারবাবু বললেন, আরে মশাই ডাক্তারী করি বলে, না এখনও ঠিক ডাক্তারী বেশী করিনে, বরং পড়ছি। কিন্তু তাই বলে আমিও যে অথরিটি তা নয়। যা ভাবি, বা এই মুহূর্তে ভাবছি তাই বলছি। সাবজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং তো! বললাম, শ'য়ের কথা কী যেন বলছিলেন?

ডাক্তারবাবু বললেন, গভীরভাবে চিন্তে করলে শ'এর কথা অস্বীকার করা যায় না, এ কথাই বলছিলাম। বিবাহ ক্রিয়ার পশ্চাতে রয়েছে যুগধর্মের আইন। যুগধর্ম বলছি এজন্য, এক এক জাতিতে এক এক আইন। এক এক যুগে এক এক আইন। হিন্দুদের বিবাহ কথাটার ব্যুৎপত্তিগত মানে দেখুন? বি পূর্বক বহ ধাতু ঘঙ্। যার মানে হলো বিশেষ ভাবে বহন করে, বা বলপূর্বক বহন করে আনা। বলপূর্বক বহন করে এখন আনছে কি? এখনকার বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ। হাঁটু ছুঁয়ে কন্যা সম্প্রদান-জাত বিবাহ। অথচ প্রাচীন কালে সত্যই বলপূর্বক হিড় হিড় করে অপর গোষ্ঠীর মেয়েকে টেনে এনে বিয়ে করতো। আজকের সিঁদুর সেই বীরত্বের রক্তচিহ্ন। আজকের হাতে নোয়া সেই শৃঙ্খলের ধ্বংসাবশেষ। বুনো অশ্বিনীকে এনে বশ করতে হলে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো তো!

বললাম, আমাদের সতীসাবিত্রীরা একথা জানলে নোয়া সিঁদুর পরবে বলে মনে হয় না।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমরা তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও তৈরী রেখেছি। কিন্তু যা বলছিলাম, এই যে বিয়ে এ যে জাতিরই হোক যে সমাজের হোক এর পেছনে সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু পতিতালয়ে যে জৈব অনুষ্ঠান হয় তার পেছনে সামাজিক স্বীকৃতি নেই। আইন এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে না। বিয়ের উদ্দেশ্য যতই মহান উদ্দেশ্য-জাত হোক না কেন, পুত্রার্থেই যে ভার্যা ক্রয় (?) করা হয় একথাতো প্রাচীন কালের মহাজনরাই বলে গেছেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই যে Biological necessityর দোহাই রয়েছে এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই: অথচ একটাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অপরটিকে ব্যাভিচার বলে নাক সিঁটকোচ্ছি।

তবু প্রতীকটা খাটে। ঘরে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী রেখে বারবণিতালয়ে যাওয়ার রেওয়াজ অনেক বিবাহিত পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দীতে অনেক বড়ঘরে এটা একটা তথা কথিত মর্যাদা বলে গণ্য হতো। বনেদী ঘরের ছেলে বাড়ীতে রাত কাটাবে কোনো কোনো খানদানী বংশে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো। 'সাহেব বিবি গোলাম' বইতে এর উদাহরণ পাবেন। ছোটবাবুকে ছোটবউরাণী কিছুতেই গৃহে আটকে রাখতে পারেন নি। কেন স্বামী বারবণিতালয়ে যায়, একথা ছোটবউরাণী জিজ্ঞেস করেছিলেন। গৃহে সেই আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন। উত্তর পেয়েছিলেন, তিনি কি মদ খেতে পারবেন? নাচতে পারবেন? ছোটবউরাণী মদ ধরেছিলেন। কিন্তু স্বামীকে ফেরাতে পারেন নি।

বললাম, হ্যাঁ, কোন কোন ধনী এবং অভিজাত ঘরে পর্যন্ত একসময়, এমন কি এখনও রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ আছে। এমন কি অনেক বড় চাকুরে পর্যন্ত রক্ষিতা রেখে থাকেন। শুনেছি যে সকল বারবণিতা সেকালে সঙ্গীতে, রঙ্গমঞ্চে, বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নাম করতো, তাদের রক্ষিতা রাখার জন্য রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যেতো।

ডাক্তারবাবু বললেন, শুধু যে জৈব কারণেই তারা রক্ষিতা রাখতেন তা নয়, অনেকে আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ বারবণিতা পুষতেন। গায়িকা রাখতেন। যেমন অনেক সময় দেখা যায়, ধনী গৃহকর্তা কেবলমাত্র লোক দেখানো আভিজাত্যের নেশায় দামী আলমারী বোঝাই দামী বইয়ের কলেকশন রাখেন। নিজে তার এক আধখানাও পড়েন কিনা সন্দেহ। পয়সা খরচ করতে হবে তারা করেন। বারবণিতার জন্যই হোক, আর বাঁদরের বিয়ে দেবার জন্যই হোক একটা উপলক্ষ চাই। শোনা যায় কোলকাতার এক বাইজীর নাচের আসরে লাখখানেক টাকা শুধু 'প্যালা' পড়েছিলো। আর হবে বা না কেন, বেড়ালের বিয়েতে যদি লাখটাকা খরচ করতে পারে, এ আর বেশী কি বলুন?

বললাম, একটা গল্প শুনেছিলাম, লাখটাকা যৌতুক পাওয়া এক অভিজাত ধনী ঘরের বর ফুলশয্যার রাত্রে নববিবাহিতাকে আপনাদের ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে যেয়ে গর্ব করে বলেছিলেন, জান আমার ঠাকুরদা বিড়ালের বিয়েতে

লাখটাকা খরচ করেছিলেন। বধূ শুনে উত্তর দিলো, আমার বাবাও বাঁদরের বিয়েতে লাখ টাকা ব্যয় করেছে।

ডাক্তার বাবু বললেন, যা বলেছেন। সে যুগ দেখাবার যুগ। কে কত দেখাতে পারে। যাক, যা বলছিলাম, সাধারণতঃ বিবাহিতেরা বার-বণিতালয়ে যায় বিকৃতরুচি চরিতার্থ করতে। কারণ তাদের মন, বিকৃত মনই বলবো, যেভাবে যৌনতৃপ্তি তথা যৌনবিকৃতি চরিতার্থ করতে চায় বাড়ীতে গৃহিণীদের কাছে সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবে লজ্জাশীলা গৃহবধুর কাছে সেই নিত্য নতুনত্ব বা বিকৃতি লাভ করা সম্ভব হয় না। শালীনতা বিরোধী বলেই হোক, লজ্জাবশতই হোক অধিকাংশ স্ত্রী এসব ব্যাপারে এই শ্রেণীর পতিদেবতাদের প্রশ্রয় দেয়না। কোন কোন স্বামী আবার স্ত্রীর কাছে ভালমানুষী বজায় রাখতে চান। ফলে ঘরে সাধুটি, বাইরে চোরটি নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীদেরও অজ্ঞাত থাকে। অতি সাহসী যারা, অর্থাৎ যারা স্ত্রীকে কেয়ার না করেই ওপাড়ায় যাতায়াত করেন, তাদের যুক্তির অভাব নেই।

বললাম, হ্যাঁ, দুরাত্মাদের তো ছলের অভাব হয়না শুনেছি।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমার এক রোগী, ধনী রোগী একদিন বলছিলেন, আরে মশাই অ্যাদ্দিন বিয়ে হয়েছে, কিন্তু যৌন অনুষ্ঠানের সময় একটা গালাগাল বা তুইতুকারী বের করতে পারলাম না বউয়ের মুখ থেকে। এর পর আর কী করে প্রেম থাকে বলুন তো! বুঝুন কাণ্ডখানা। আসলে এই জাতীয় বেশ্যাঘেঁষা লোকগুলো পতিতাদের মুখের অশ্লীল গালাগাল শুনতে ভালবাসে। দৈহিক অত্যাচার, দন্তক্ষত নখরক্ষত সইতে ভালবাসে। বিপরীত বিহার করতে বা দেখতে ভালবাসে। প্রতিপক্ষের কাছে অনুরূপ প্রতিদানও কামনা করে। একান্নবর্তী পরিবারে, ছেলেমেয়েভরা সংসারে এটা সম্ভব তো নয়ই। একক সংসারেও অনেক ক্ষেত্রে এ সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও একদল কামুক স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল যৌনানুষ্ঠানের ফল স্বরূপ একগাদা সন্তানের জন্ম দিতে দিতে স্ত্রী স্বাস্থ্য খুইয়ে বসে আছেন। সেই দেহ তখন ঐ সব কামাতুরদের আর আকর্ষণ করেনা। ফলে তারা মধুকরের মতো অপর ফুলের সন্ধানে বেরোয়।

আর এসব ব্যাপারে পুরুষদের স্বাধীনতা স্ত্রীদের থেকে এখনও অনেক বেশী। পাঁক ঘেঁটে এসে পা ধুয়ে শুদ্ধ হতে এদের যত সুবিধে মেয়েদের পদস্খলনের পর তেমনি সুবিধে নেই।

বললাম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিবাহিতদের বারবণিতালয়ে যাবার ব্যাপারে পুরুষই কি একমাত্র দায়ী ?

ডাক্তারবাবু বললেন, নিশ্চয়ই নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, স্ত্রী যথাযোগ্য সহানুভূতি ও ভালোবাসা না দেখানোর জন্য তিলে তিলে ক্ষুব্ধ স্বামী অনন্যোপায় হয়ে মদ ধরেছে, নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত করে, নিজের তথা পরিবারের সর্বনাশ করেছে। স্বামীর মনোরঞ্জনের যে দিকটার কথা এর আগে বললাম, স্ত্রীরা যদি যেটুকু রয়সয় সেটুকু এগিয়ে আসেন, আমার মনে হয় অনেক না হোক্ বেশ কিছু বিপথগামী স্বামীকে ফেরাতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, এমন স্বামী খুব কমই আছে, যারা স্ত্রীর আন্তরিক প্রেমকে উপেক্ষা করতে পারেন। বশীকরণ করার দরকার নেই, কী করে স্বামীর মন পাওয়া যায় এ সম্পর্কে একটু সজাগ থাকলে অনেক ঘর ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে আমার ধারনা।

বললাম, ডাক্তারবাবু, বলুন না যদি আপত্তি না থাকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, বিয়ে করেছেন ?

—আজ্ঞে না।

—বেশতো আগে বিয়ে করুন, তখন শিখিয়ে দোব।

বললাম, বেশ দেবেন। অবশ্য আমার যা মতিগতি তাতে আপনার হতাশ হতে না হয়। এবার অনুগ্রহ করে বলুন, অবিবাহিতেরা পতিতালয়ে কেন যায় বলে আপনার ধারণা।

ডাক্তারবাবু বললেন, বলছি। তার আগে, আপনার ঐ হতাশ হবার কথায় মনে পড়লো জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়েও অনেক স্বামী বারবনিতালয়ে যায়। অবশ্য স্বামী নয় এমনরাও যায়। এই বাজারে দুই প্রান্তকে এক করা মুস্কিল। তেল নুন চালের সমস্যায় মানুষ পাগল। ঘরে খাবার নেই, ছেলে-মেয়ে স্ত্রী খেতে পাচ্ছে না। দুঃখ ভুলতে স্বামী অন্য পথ বেছে নিয়ে নিজেকে ভোলাতে চেষ্টা করে কোন কোন সময়। কেউ রেস কোর্সে ভাগ্য

ফেরাতে যেয়ে আরও ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন, কেউ সবকিছু ভুলতে বোতলেশ্বরীর শরণাপন্ন হয়। নিষিদ্ধ পাড়ায় যাতায়াত করে। বাড়ীকে 'অ্যাভয়েড' করতে চায়। কেউ আবার গলায় দড়ি দেবার সহজ পথ খুঁজে নেয়।

বললাম, এর ব্যতিক্রমও তো আছে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা আছে। আমি শুধু সম্ভাব্য কারণগুলো দেখাচ্ছিলাম। নতুবা হতাশাকে জয় করে বীরের মতো দাঁড়াতে পারেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। অবিবাহিতদের মধ্যে যারা বারবনিতালয়ে যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। জীবনটা তখন বোহেমিয়ান গোছের। লোকলজ্জা, ভয় প্রভৃতি স্পর্শ করতে পারে না। কী হয় ওখানে দেখবার একটা স্পৃহা থাকে। এই স্পৃহার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভই সেখানে মুখ্য থাকে। এ দলের সবাই যে যৌনতৃপ্তির জন্য যায় তা নয়। কোন অভিজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে যায়। দেখে শোনে। বেরিয়ে এসে সেই অভিজ্ঞ বন্ধুকে সতর্ক করে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। আশ্চর্য নয়, এই 'পথ চেনা' পরবর্তী সময়ে আরও অভিজ্ঞতা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কচু কাটার বিদ্যে থেকে ডাকাত হবার দীক্ষা লাভ হয় কারও কারও।

বললাম, আপনি আমার সম্পর্কেও তাই বুঝি ঐ কথা বলেছিলেন?

ডাক্তারবাবু বললেন, ওটা অবশ্য রসিকতা করছিলাম। সবার বেলায় একথা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে সাধারণ স্ট্যামিনার ছেলে যারা তাদের সম্পর্কে ভয় আছে বৈকি? তবে অনেক ছোকরা আবার ছোকরা বয়সে ঐ যে লভ্ না কী বলেন ঐ সব তালে থাকে। সমাজের বুকেই খোরাক পেয়ে গেলে আর নিষিদ্ধপল্লীর ঘাস মুখে তোলে না। দরকারও হয় না। বিশেষ এই প্রেম রোগটা ভয়ানক সংক্রামক তো। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তার আক্রমণ দশ-বারো বছর থেকে শুরু হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রথম প্রথম 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' থাকে। পরে 'কংক্রীটে' এসে দাঁড়ায়।

বললাম, কুসঙ্গীর পাল্লায় পড়েও তো অনেকে পতিতালয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু বললেন, যায় বৈকি? রামবাবু শ্যামবাবু কা কথা, আমাদের

অথচ উভয় ক্ষেত্রের ক্রিয়াকাণ্ড এক।

ডাক্তারবাবু একটু থেমে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, অতীতে নারী ও ভূমিকে বহুভোগ্যা বলা হতো। মহাভারতের যুগে ক্ষেত্রজ সন্তান লাভের ব্যবস্থা ছিলো। তার সরলার্থ হচ্ছে, স্বামী অক্ষম হলে, অপর কাউকে দিয়ে সন্তান লাভ করা আইন সিদ্ধ ছিলো। কুন্তী ও মাদ্রির পুত্রলাভ এই পর্যায়ে পড়ে। শ্রীমতী দ্রৌপদী শাশুড়ীর ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবকে স্বামী রূপেই পেয়েছিলেন শ্রীমতী। কিন্তু তাতেও খুসী না হয়ে মহাবীর কর্ণকে রাজসূয় যজ্ঞের সময় দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুধু মুগ্ধ নয় তাঁকে স্বামীরূপে পাবার একটা সদিচ্ছা তাঁর মনে সুপ্তও ছিলো। বেচারা এক সময় ধরা পড়ে লজ্জাও পেয়েছিলেন। কাঠখোট্টা ভীমসেন তো সব শুনে 'এই মারি তো সেই মারি' ভাব। শেষ পর্যন্ত সখা বিপদতারণ কেষ্টঠাকুরের হস্তক্ষেপে পঞ্চসতীর একজন হয়ে বিরাজ করছেন। সত্য বলতে কি আমাদের এই প্রাতঃ-স্মরণীয়া পঞ্চসতীরা নেহাৎ সার্টিফিকেটের জোরে সর্বযুগে সতী বলে নাম কিনেছেন। নইলে শ্রীমতী অহল্যার ইন্দ্র অপবাদ, কুন্তীর সূর্য অপবাদ, বালীপত্নীর সুগ্রীব অপবাদ, মন্দোদরীর বিভীষণ অপবাদের পর কী করে যে সতী আখ্যা পায় আমার তা বুদ্ধির অগম্য। কে জানে এমন সতী সাধ্বী এ যুগেও কত আছে।

বললাম, কিন্তু সে যুগে তো দেবর বিবাহ সমাজ-সিদ্ধ ছিলো ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা হয়তো ছিলো। রামচন্দ্র কৈকেয়ীর কথার উত্তরে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভরতকে সীতা উৎসর্গের কথা বলেছিলেন। রাবণবধের পর সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে আনা হলে, তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে পারেন না। সীতা ইচ্ছে করলে তাঁর সখা বা অনুচর যে কাউকে গ্রহণ করতে পারেন। আর সেই রামচন্দ্রই সীতার রাবণ অপবাদে মুহ্যমান হয়ে তাঁকে বনে নির্বাসিত করেছিলেন। এ রহস্য সত্যই আমার বুদ্ধির অগম্য। সত্য কথা বলতে কি, আমার কী মনে হয় জানেন, যতক্ষণ আমরা ধরা না পড়ি ততক্ষণই আমরা সতী সাধ্বী, ততক্ষণই আমরা সাধুপুরুষ। সবাই এই পর্যায়ে পড়েন না এটা সত্যি কিন্তু অন্তরে

বহুভোগ্য, বহুভোগ্যা হবার বাসনা নেই এটা জানতে হলে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া দরকার যেখানে ভাবের ঘরে চুরী চলে না। রক্ষা আমাদের সামাজিক শাসন, আইনগুলো আমাদের যথাসম্ভব বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবু দুচারটে সংবাদও যা লোকচক্ষে আসে তাতে ঐ সব নিষিদ্ধ পল্লীর বারবণিতারা লজ্জা পায়। এই যে এত বারবণিতা দেখেন, এর একটা মোটা অংশ আসে এই সব ব্যাভিচারের শিকার হিসেবে। তাও দশবার চোরের একবার সাধুর এজন্যে। বাকী নয়বারের খবর আমরা কতটুকু রাখি বলুন।

ডাক্তারবাবুর একটা স্বভাব এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যা বুঝছিলাম, একবার মুখ খুললে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু বাদ যায়না। অথচ আমার জানা দরকার ওদের সম্পর্কে, ওদের প্রসঙ্গে। সে সম্পর্কে যে কিছু পাচ্ছিলাম না তা নয়, তবে সেই একটন বালি ঘেঁটে এক আউন্স সোনা পাবার মতো। অবশ্য আমার বিবেচনায়। এদিকে বৃষ্টিটা থামা পর্যন্ত আমার ওঠারও উপায় নেই। তাই বাধা দিয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের কথা থাক্, পতিতালয় সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা থাকলে অনুগ্রহ করে যদি বলেন। আচ্ছা, আপনি ব্যক্তিগত ভাবে পতিতাদের কি ঘৃণা করেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করে বসলেন? হ্যাঁ মশাই, আপনি সত্যিকারের কে বলুন তো? আই. বি, টাই-বির লোক টোক নন তো! নাকি ঘটক টটক কেউ!

বললাম, আরে না না। আমি এক ছা পোষা লেখক মাত্র। ছারপোকা পোষা লোকই বলতে পারেন। আমার তক্তপোষে যা গুচ্ছের ছারপোকা সে যদি দেখতেন! এ সব শুনছি আর ভাবছি যদি কোন দিন ওদের নিয়ে কিছু লিখি।

ডাক্তারবাবু বললেন, বলেন কি মশাই! দেখবেন শেষে ফ্যাসাদে না পড়েন। কুপরীন হওয়া ওদেশেই চলে। সত্য কিনা জানিনে, শুনেছি দীর্ঘ ছ বছর ঐ সব পল্লীতে বাস করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করে ভদ্রলোক বইটে লিখেছিলেন। আপনাদের মতো তিনতলার ফ্যানের হাওয়া খেতে

খেতে পল্লীগীতি লেখে না ওরা। ওদের সম্পর্কে লিখতে হলে একেবারে নিঘৃণ হয়ে, সমাজ সংসার ত্যাগ করে ওদের সম্পর্কে জানতে হবে। আর সে চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল। এর পর আর সমাজে কলকে পাবেন কিনা সন্দেহ।

বললাম, আমাকে তো নিঘৃণ হতে বলছেন ডাক্তারবাবু, আপনি কি ওদের ঘৃণা করেন?

ডাক্তারবাবু বললেন, এক কথায় তা বলা মুস্কিল। ওদের ঘৃণা ঠিক করিনে। ঘৃণা করি ওদের পরিবেশটাকে। ঘৃণা করি ঐ বৃত্তিটাকে। জানি এ ব্যাপারে ওদের হাত কতটুকুইবা। অথচ দেখুন, অর্থের জন্য ওরা পারে না হেন কাজ পৃথিবীতে নেই। একটা গল্প পড়েছিলাম, কার লেখা মনে নেই, এক ভদ্রলোকের প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর, তার শ্বশুর তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের পুনর্বিবাহ দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়াও মারা যায়। কিন্তু এমন একটি মূল্যবান জামাইকে হাতছাড়া করতে চান না। ফলে তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন। সে কন্যাটিও বেশ বড়সড় হয়েছে। বিয়ের কয়েকদিন আগে মেয়েটি আত্মহত্যা না গৃহত্যাগ যেন করে। তার বাক্সে একটা ডাইরী পাওয়া যায়। তাতে লেখা, জামাই-বাবু যখন বড়দিকে বিয়ে করে তখন মেজদি বাসর ঘরে আড়ি পেতেছিলো। জামাইবাবু যে সব মিঠি মিঠি বাৎ বলেছিলো, হুবহু সেই কথাগুলো দ্বিতীয়ার বেলায়ও বলেছিলো। তৃতীয়ার আশঙ্কা তার বেলায়ও সেই একই কথা অর্থাৎ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এমন করে ভালোবাসিনি ইত্যাদি ভালবাসাবাসির কথা নিশ্চয়ই বলবেন। সেই একই কথা শুনতে তৃতীয়া আর রাজী নয়। কথাটা প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু বারবণিতালয়ে যারা যায়, তারা এই একই ভালবাসাবাসির কথা যান্ত্রিকভাবেই প্রতিনিয়ত শোনে। এমনকি কিছুক্ষণ আগের যে উত্তপ্ত শয্যায় পরবর্তী আগন্তুককে বসাবে তার সঙ্গেও সেই একই ন্যাকামো, একই ঘাড় ভাঙার মতলব করবে। সুবিধে পেলে, শাঁসালো মক্কেল পেলে ছুরী বসাতেও কসুর করবে না। এরা এসব করে। অনেকক্ষেত্রেই করতে বাধ্য হয়, কারণ অনেক সময় ওরা ওদের নিজদের দ্বারা পরিচালিত

হয় না। আর সেজন্যেই ওদের ঘৃণা করতে ঠিক মন সায় দেয় না।

বললাম, বৃত্তি হিসাবে ঘৃণা করেন, আবার ওদের ঘৃণা করেন না, কথাটা পরস্পরবিরোধী হলো না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন, বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে ওরা ঐ বৃত্তির শিকার হতে বাধ্য হয়। ঐ বৃত্তির খারাপ যত দিক আছে ওরা শত চেষ্টা করেও তার হাত থেকে সবাই রেহাই পেতে পারে না। দু পাঁচটা ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বাকী সবাই এই পর্যায়ভুক্ত। জাত পতিতাদের কথা বাদ দিলে অর্থাৎ মাতৃসূত্রে যারা বারবণিতা তাদের কথা বাদ দিলে, বাকীরা যে ভুল, যে দুর্দৈবের জন্য একবার বাড়ী থেকে, সমাজ থেকে বেরুয় শত চেষ্টা করেও, শত মাথা কুটলেও সেখানে ফিরে যাবার উপায় শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই আর থাকে না।

বললাম, আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন যাঁরা করবেন তাঁদের এ সম্পর্কেও সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করি ডাক্তার বাবু। ওদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন যেমন দরকার, তেমনি সমাজকে পদস্খলনকারিণীদের সম্পর্কে আরও উদারতা দেখাতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, অথচ দেখুন পদস্খলনকারী পুরুষ কিন্তু সমাজে বহাল তবিয়তে বাস করছে। দুপাঁচজনের যে সাজা না হচ্ছে আইনের হাতে তা নয়, কিন্তু সাজা পাবার পরও তাদের একঘরে করে রাখার নিয়ম নেই। বড় জোর পাড়া পাল্টালেই গঙ্গাজলে শুদ্ধি। পুরুষের বেলায় যত লীলে, আর মেয়েদের বেলায়? তাদের অনেকের জন্য এই পতিতালয়ই আশ্রয়। এই নরক কুণ্ডে জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করে নরকে যাবার জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হয় তাদের। শাস্ত্রকাররা এদের জন্য কোন স্বর্গের ব্যবস্থা রাখতে সাহস পায়নি। এরাও স্বর্গ প্রাপ্তির আশা নিয়ে মরেনা। বললাম, দিনের পক্ষে ঝিগিরি করে, বিনে চিকিৎসায় নর্দামায় পড়ে না মরে এই প্রার্থনাই বোধ হয় ওরা করে থাকে, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বাবু বললেন, তা যা বলেছেন মশাই। আমাদের শাস্ত্র বলে, নারী বাল্যে পিতার তত্ত্বাবধানে থাকে, যৌবনে স্বামী তত্ত্বাবধান করেন, আর বার্ধক্যে পুত্রের তত্ত্বাবধান। ব্যতিক্রম থাকলেও, এই যে নিরাপদ আশ্রয়, এযে কী বস্তু

তা বোঝা যায় যখন কেউ এ আশ্রয় হারায়। সেই আশ্রয়হীনাদের সম্পর্কে আমাদের সহানুভূতির অন্ত থাকেনা। আহা মেয়েটা এত অল্প বয়সে বাপকে হারালোগো। মা ভাই কি আর একে মানুষ করে তুলতে পারবে! পারবে কি বড় করে ঘরবর দেখে বিয়ে দিতে! অথবা আহা, কচি বউটা এমন কাঁচা বয়সে স্বামী হারালো গো! সারাটা জীবন সামনে পড়ে রইলো, কী করে কাটাবে গো! কিংবা আহা, ভদ্রমহিলার একটা উপযুক্ত ছেলেও নেই যে বুড়োবয়সে দেখবে! এমন হাজারো সহানুভূতির কথা আপনি শুনতে পাবেন। কিন্তু ঐ হতভাগিনীদের আশ্রয় দাতা কে? হয়তো স্রোতে ভাসতে ভাসতে, দুর্ভাগ্যের চক্কর খেতে খেতে এক বাড়ীওয়ালীর আশ্রয় পেলো। তাকে ওর রোজগারের অংশ দিতে হবে। আর তা যদি পেতে হয় তাহলে বাড়ীওয়ালী দেখবে, ওযেন কাজে ফাঁকী না দেয়। ওকে খাটিয়ে কত বেশী রোজগার করতে পারবে সেই চিন্তা থাকবে বাড়ীওয়ালীর। রুচি নেই, সামর্থের প্রশ্ন নেই, ঘৃনা নেই, লোক যে যত বসাতে পারবে বাড়ীওয়ালীর কাছে সে তত প্রিয়। যে যত ছলা কলায় পটু, যে যত বাবুর পকেট উজার করতে পারবে সে তত পেয়ারের, সে তত কাজের লোক।

বললাম, বাড়ীওয়ালী ছাড়া অন্যের অভিভাবকত্বেও থাকে অনেকে। ডাক্তার বাবু বললেন, সেতো রক্ষিতাদের ব্যাপার। তাদের কথায় পরে আসচি। বাড়ীওয়ালী ছাড়াও, এমনকি বাড়ীওয়ালীর ওখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবক থাকে পোষা গুণ্ডা। তাদেরও মন জুগিয়ে চলতে হয় এদের। সেও সময়ে অসময়ে ওকে শয্যাভাগিনী করবে। ওকে নিংড়ে খাবে। ওর রোজগারে ভাগ বসাবে। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দালালের আনা যে কোন লোক বসাতে বাধ্য করবে। তা সে অতিথির টি.বি.ই থাকুক, আর অন্য জঘন্য রোগই থাকুক। কারণ সেই অতিথির কাছ থেকে 'মারজিন' সেও মারবে। এই হতভাগিনীদের জীবন এত অসহায় যে ঐ সব গুণ্ডাদের ইঙ্গিতে এরা আগুনে ঝাঁপ দিতে পযন্ত অস্বীকার করার সাহস পাবেনা।

কমলরাণীর সেই আট আঙ্গুলে আংটিওয়ালা জগদীশলালের কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ, কমলরাণীর শ্রদ্ধা ভক্তি আসলে এই ভয়ের প্রশ্রেই কিনা কে জানে?

নইলে এমন স্তবস্তুতি করে তুষ্ট রাখার তো অন্য কোন কারণ দেখিনে।

কমলরাণী একদিন বলেছিলো, দাদা, এ পাড়ায় কোন বিপদে পড়লে জগদীশলালজীর কথা বলবেন। তার মানে গোটা পাড়ায় এই জগদীশলাল রূপী মস্তানটি ত্রাণকর্তা বিশেষ। হবেও'বা। আমার সাতটাকা দামের পাইলট পেনের ব্যাপারে তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত তো আমার অজানা নয়। কমলরাণীর বাড়ীওয়ালীকে আমি দু একদিন দেখেছি। ভাবলেশহীন মুখে হাসি দেখেছি কিনা বলতে পারিনে, তবে জাঁদরেল এক ইস্তিরী লোক যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বেশ রাজেন্দ্রাণী, রাজেন্দ্রাণী চেহারা। তার নাগরটিকে তো ছুঁচো বলেই মনে হয় আমার। অবশ্য কমলরাণী রক্ষিতা। কিন্তু তার জীবনেও ভাগ বসানো বাড়ীওয়ালী পর্ব ছিলো শুনেছি। এখন অবশ্য এ বাড়ীওয়ালী কমলরাণীকে অপেক্ষাকৃত তোয়াজই করে। কমলরাণীও এই যে মাসী একটা পান খেয়ে যাও, কিংবা মাসীর ঘরে ভাল মাল থাকলে পাঠিয়ে দিও তো, এমন ধরণের কথাবার্তা আমারও কানে গেছে। তবে আমার উপস্থিতিতে সেই রসালাপ বেশী দূর গড়ায়নি। তবে আমার সম্পর্কে বাড়ীওয়ালীর চোখ প্রথম দিকে একটু চকচকে হলেও, এখন তা রীতিমত নিষ্প্রভ। কেমন যেন একটা ঠোঁট বেকানো নিস্পৃহ ভাব। কমলরাণীকে হয়তো কিছু বলেও থাকবে কিন্তু কমলরাণী আমাকে কিছু বলেনি।

ডাক্তার বললেন, কী খুব ভাবনায় পড়েছেন তো। অবশ্য স্বাধীন ভাবে যে কেউ ব্যবসা করেনা তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। আর তার ঝামেলাও কিছু কম নয়। ফলত বা মূলতঃ এই সব পতিতাদের খারাপ রোগ হলে, অন্য অসুখ বিসুখ হলে, দেখার, শুশ্রূষা করার বড় কেউ থাকে না। রোজগার কম হলে লাথি ঝাঁটা। আর রোজগার বন্ধ হলে তো কথাই নেই। লাথি মেরে রাস্তায় ফেলবে। তখন ওর ঝিগিরি বা ভিক্ষে করে খাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না। অবশ্য ঝিগিরি করতে করতে কেউ যদি বাড়ীওয়ালা বা তার ছোকরা পুত্র বা চাকরের সঙ্গ লাভ করতে পারে বা কারও দালালী করতে পারে তা সে ওর বাড়তি লাভ। বাড়ীর গিন্নীর চোখ এড়িয়ে সেটুকু

করাও সহজ নয়। এমন কি ওযে কোন পাড়ার বাসিন্দে এটা যতক্ষণ জানিনে জানিনে করে থাকা যায়। জানাজানি হলে আবার কাজ জোটার অসুবিধে। এদিকে সারা জীবনের অত্যাচারের ফল ততদিনে ফুটে বেরুতে আরম্ভ করবে। এই সব সম্ভাবনার কথা কমবয়সী পতিতারাও জানে। ভাবে। ভেবে ভেবে এরা পাষাণ হয়। দয়া, মায়া, নারীত্ব সব কিছু এরা বিসর্জন দেয়। কেমন একটা বিজাতীয় প্রতিশোধ স্পৃহা সেই মনে এসে বাসা বাঁধে। এর পরও কি ভাববেন, ওরা আমাদের এবং আমাদের সমাজের মঙ্গল চাইবে? চাইবে কি তাদের রোগ তাদেরই থাক, খদ্দেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে নিজেদের রোজগারের পথ বন্ধ করার! কোন ব্যবসায়ী কি তার খারাপ মালের কথা খদ্দেরকে বলে সাবধান করে গ্যায়। দুচার জন দেয়। ওদের মধ্যেও দুচারজন দেয়। বাকীরা সমাজের ভালোকে আলকাতরা মাখিয়ে দেবার চেষ্টা করে এক পৈশাচিক উল্লাসে উত্তেজনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর এই উত্তেজনা জিইয়ে রাখার জন্য এরা সব রকমের উত্তেজক মাদক দ্রব্য, উত্তেজক আচার ব্যবহার করে। এদিকে এই ক্রম উত্তেজনার অন্তরালে যে ক্ষয় প্রতিনিয়ত লোকচক্ষু এমনকি এদের নিজেদের চোখের অন্তরালে ঘটতে থাকে তাতে কতজন যে বলি হয় কে তার খবর রাখে? পক্ষাঘাত, ক্ষয় রোগ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আলো আঁধারের খেলায় সুযোগ সন্ধানী কত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বেশ্যা লোক বসায়, তার খবরই বা কে রাখে?

বললাম, যারা উঁচুদরের বা যারা মোটা টাকায় বাঁধা তাঁদের জীবন হয়তো অপেক্ষাকৃত সুখের ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারবাবু বললেন, যারা আখের গুছাতে জানে তাদের পক্ষে সুখের। তবে এ ব্যবসায়ের মূলধন হচ্ছে যৌবন। আর যতক্ষণ এই যৌবন ততক্ষণ সুখের। তাই যৌবনকে বেঁধে রাখতে এদের চেষ্টার অন্ত নেই। অভিনেতা, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, ম্যাজিসিয়ানদের মতো এদেরও এজন্য অনেক যত্ন অনেক চেষ্টা চলে। তবে ঐ যে বললাম, যৌবন থাকলেই যে সব সময় সুখের তাও নয়। যে কর্তারা পয়সা দিয়ে রক্ষিতা রাখেন বা মোটামুটি দীর্ঘদিন একই মেয়ে মানুষের কাছে যাতায়াত করেন, তাদের আবার

শতেক বায়না। হাজার আবদার। সে সব বায়না, সে সব আবদার সহজ সরল দাম্পত্যজীবনের আবদার নয়। সতীলক্ষ্মী গৃহবধূদের থেকেও এইসব রক্ষিতাদের অনেক বেশী সতীপনা দেখাতে হয়। বাবুর মন জুগিয়ে চলতে হয়।

বললাম, কেন, শুনেছি অনেক সময় এই সব বাবুরাই রক্ষিতাদের মন জুগিয়ে চলেন!

ডাক্তারবাবু বললেন, আরে মশাই, সে তো অনেক স্বামীর বেলায়ও খাটে। কিন্তু এখানে স্বামীস্ত্রীর বন্ধন নেই। ঢং আছে একনিষ্ঠতার এইমাত্র। দু পাঁচটি ক্ষেত্রে এমনটা যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে রাখা রক্ষিতাকে অনেক কিছু ন্যাক্কারজনক কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। পাছে বাবুর অসন্তুষ্টিতে একটা নিরাপদ আশ্রয় উপে যায় এই ভয়ে। একজনের মন রাখা তবু সোজা, কিন্তু বাবু হারালে আবার বাবু না পাওয়া পর্যন্ত তো আবার সেই দু টাকা দশ টাকার খদ্দের পাকড়াতে হবে।

বললাম্, বাবুর মন রাখতে ওরা কতদূর পর্যন্ত নামে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, নামার কি শেষ আছে ভাই! কোন নামারই শেষ নেই। মনে পড়লো দ্বিজু চৌধুরী একদিন বিকৃতরুচি বাবুদের কাণ্ড কারখানা বলেছিলো। বলেছিলো, বাবুদের কথা আর বলোনা ভায়া। এমন এক একজন আসেন, যাদের লীলে দেখলে আস্তাকুড়কেও পবিত্রস্থান বলে মনে হবে। এমন ভাষায় তাঁরা কথা বলেন যে কোন কিতাবেও তা পাবে না। এমন বিকৃতরুচি বাবু আছেন, যিনি নিজের মেয়েমানুষকে নিজের আদরের কুকুরের সঙ্গে শয্যাগ্রহণে বাধ্য করেন।

বলেছিলাম, তোমাদের সেই মেয়েমানুষ রাজী হয় কেন?

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, পয়সার জন্যে, অত্যাচারের ভয়ের জন্য। বাবুর মনস্তুষ্টির জন্য। পয়সার জন্য লক্ষহীরা বেশ্যা যদি কালিদাসকে খুন করতে পারে, পয়সার জন্য পেয়ারের মেয়েমানুষ বাবুর অবাধ্য হবে এতখানি বিপ্লববাদী এখনও তো ওরা হয়নি ভায়া। তবে ওরা যদি স্ট্রাইক করে ভায়া তাহলে কিন্তু তোমাদের রেলওয়ে ট্রামওয়ে স্ট্রাইকের চেয়ে অনেক বেশী জোরদার স্ট্রাইক করতে পারে।

বলেছিলাম, তা চেষ্টা করাও না কেন চৌধুরী। অন্ততঃ নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যও তো এটা ওরা করতে পারে।

চৌধুরী বলেছিলো, করবে ভায়া করবে। এমনদিন খুব বেশী দূরে নেই। এদের প্রতি যে অত্যাচার অবিচার হয় তাতে এমন একদিন আসবে ওরা অনেক কিছু আদায় করে নেবে। এই যে পুঞ্জিভূত ঘৃণা জমা হচ্ছে এর বহিস্ফুরণ একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, এক সময় আমাকে ঐ পাড়ার কোন কোন বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছে। আমিও আপনার মতই ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলাম। দীর্ঘদিন আমি ওদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছি। আপনাকে এতক্ষণ যা বললাম, তার বেশ কিছু অংশ আমার ওদের ওখান থেকে সংগ্রহ করা।

বললাম, তাই বলুন ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ, বাবুদের সম্পর্কে কী বলছিলেন বলুন! ডাক্তারবাবু বললেন, এক একবাবুর এক এক খেয়াল মশাই। এমন অনেক বৃদ্ধ আছেন, যৌনাচার করার কায়িক সামর্থ হয়তো নেই, বিকৃতরুচির বশে নিজের চোখে বিকৃত কামাচার দেখার জন্যে নিজের চাকর বা সঙ্গীকে নিজের রক্ষিতার সঙ্গে যৌন ব্যাভিচার করতে বাধ্য করে এক বীভৎস আনন্দ লাভ করেন। এছাড়া যৌন অনুষ্ঠানে রক্ষিতাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে, বুকের উপর মা কালীর মত দাঁড়া করিয়ে কুৎসিৎ আনন্দ লাভ, এতো সামান্য ব্যাপার। এ ছাড়া আরও অনেক জঘন্য প্রক্রিয়ার কথা শোনা যায় সে সব আর আপনার শুনে কাজ নেই মশাই। লেখকদেরও তা কল্পনায় আসবে না। বাবুর মনোরঞ্জনের জন্য, দায়ে পড়ে ঐ সব হতভাগিনীরা এসব করতে বাধ্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যে এরা বিদ্রোহী হয় না তা নয়। তারাশঙ্করের মঞ্জুরী অপেরাতে মঞ্জুরীর মা বাবুর আনা লোক বসাতে রাজী না হওয়ায় বাবুকে হারিয়েছিলেন। বইটা পড়া থাকলে দেখতে পাবেন। আবার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে এত সব করেও কিন্তু এদের সব সময় 'হারাই হারাই' ভাব যায় না। কখন পান থেকে চুণ খসলে কী ঘটবে সেজন্যে তটস্থ থাকতে হয়।

বললাম, এ ব্যাপারে বারবণিতাদেরও দোষ আছে ডাক্তারবাবু। অনেক রক্ষিতা বাবুর অগোচরে নতুন বাবু বসায়। লুকিয়ে চুরিয়ে বেশী রোজগারের

আশায় এখানে সেখানে যাতায়াত করে। এজন্যে খুন পর্যন্তও ঘটতে দেখা গেছে বলে শুনেছি।

ডাক্তারবাবু বললেন; হ্যাঁ, সে কাহিনীও আছে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে। অপরের রক্ষিতা ভাগানোর ব্যাপারও আছে। কোন পড়তি বাবুর রক্ষিতাকে নতুন ধনীবাবু লোক লাগিয়ে হাত করেন বা করার চেষ্টা করেন এমন একটা কাহিনী 'সাহেব বিবি গোলাম' বইতেও পাবেন। মোট কথা প্রেমে এবং রণে কোন নীতির বালাই নেই একথা রক্ষিতা-রক্ষণ ব্যাপারেও খাটে মশাই। তবে কোন ক্ষেত্রের প্রেমে হয়তো পয়সা ব্যয় হয় না, অবশ্য একথাও বলি কি করে, কারণ লেকে হাওয়া খেতে যাওয়াই বলুন, আর ইংরেজী বই দেখিয়ে নায়িকার মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে প্রেম জাগিয়ে তোলার ব্যাপারেই বলুন অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে 'কামগন্ধ হীন নিকষিত প্রেম'ও এযুগে অচল। সেই সোনার পাথর বাটী রূপ প্রেম সেযুগে কেমন করে ছিলো, সেই নিরাকার প্রেম ব্রহ্মের খবর অবশ্য আমি রাখিনে। আপনারা আধুনিক লেখকেরা এ নিয়ে রিসার্চ করে দেখতে পারেন। তা যাই হোক, বারবণিতালয়ের রক্ষিতা-প্রেমের বেলায় কাঞ্চনমূল্য নিয়ে দর কষাকষি হয়। সেখানে পুতুপুতু মুরদওয়ালাদের স্থান নেই। আর এই প্রতিযোগিতায় নামতে যেয়ে কোলকাতার কত তাগড়াই তাগড়াই নামকরা বাড়ী যে ফকীর হয়ে গেছে, পুরোনো কোলকাতার বড়লোকদের ইতিবৃত্ত ঘাঁটলে পেয়ে যাবেন! কত বাড়ী বন্ধক পড়েছে, কত মোটর গাড়ী, ফিটন বিক্রী হয়েছে, শুধু মদ আর মেয়ে মানুষের পেছনে সে ইতিহাস যদি কেউ কোনদিন লেখেন তাহলে তার সব নাহোক কিছু পরিচয় পাবেন। আর সেই সব বারবণিতারা যদি নামকরা বাইজী, সঙ্গীতজ্ঞা, নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রী হয় তাদের পোষা তো হাতী পোষার চেয়েও বেশী।

বললাম, হ্যাঁ সেজন্যেই বলা হয়ে থাকে বোধহয় উনবিংশ শতকে বাঙ্গালী জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখে গেছে। সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়ে এবং বিলাসিতায়। এই বিলাসিতার একটা মোটা অংশ ব্যয় হয়েছে উৎসবে, নাট্য শিল্পে আর বারবণিতালয়ে।

ডাক্তারবাবু বললেন, নাট্যশিল্পে উৎসাহ দিতে যেয়েও ফকীর হয়েছেন

অনেকে। উদাহরণস্বরূপ শ্যামবাজারের নবীন বসু মশায়। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো এক সময় ওখানে ছিলো নবীন বসুর পুকুর ঘেরা বাড়ী। লক্ষ টাকা ব্যয় করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন থিয়েটারের দল চালাতে যেয়ে।

নবীন বসু করিয়েছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। এই অভিনয়ে একটা বড় ব্যাপার ছিলো, সেই উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়েছিলো ১৮৩১ সনে, পুরুষ ভূমিকায় নেমেছিলো পুরুষ আর স্ত্রী ভূমিকায় স্ত্রীলোকই নেমেছিলো। সুন্দরের ভূমিকায় নেমেছিলো মনি নামে এক সুন্দরী যুবতী। মালিনী ও রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করে জয়দুর্গা নামে এক বৃদ্ধা। হেমেন দাশগুপ্ত মশায় তাঁর ভারতীয় নাট্যমঞ্চ নামক বইতে লিখেছেন, সম্ভবতঃ বারাঙ্গনা শ্রেণীর ভিতর থেকেই এই স্ত্রীলোকদের সংগ্রহ করা হয়েছিলো। তৎকালীন খবরের কাগজে এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা বেরিয়েছিলো। এই অভিনেত্রী মণি অতি বৃদ্ধবয়সেও কীর্তন গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো।

বললাম, ডাক্তারবাবু এই নাট্যশিল্পে উৎসাহদানকে আমি বিলাসিতার পর্যায়ে ফেলতে পারিনে। কারণ সে যুগে এই সব বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে, নাট্যশিল্পে আধুনিকতম ক্রম-বিকাশ আমরা দেখতে পেতাম না। যে উনবিংশ শতাব্দীতে পায়রার লড়াই, পক্ষীর লড়াই মানে সেই রূপচাঁদ পক্ষীদের কথা বলছি আমি, এই সব চলতো সে তুলনায় এগুলো গুণবিশেষ ছিলো।

ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে তো বাইজী পোষাও সঙ্গীত শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা বলা যায় মশাই। তাদের কাছ থেকেই আমরা গজল, ঠুংরী, দাদরার এমন বহুল প্রচার পেয়েছি। এমন কি বাঙালী বাইজীদের খ্যাতি সারা ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত রাজা রাজরার প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

বললাম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নিজের কোন অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি ঐ নিষিদ্ধ পল্লীতে!

ডাক্তারবাবু হাসলেন, হেসে বললেন একদিনে এতসব জানতে চাইলে চলবে কেন ভায়া। আজ আসুন, আজকের আলোচনা রোমন্থন করুন। ভাল লাগলে আর একদিন আসবেন, আরও নতুন তথ্য সংগ্রহ করে

রাখবো, আর নিজের কথাও সেদিন বলা যাবে। তবে আগেই বলেছি এ পাড়ায় স্বেচ্ছায় যেমন অনেকের যাতায়াত আছে, আবার পরীক্ষা করার জন্যেও অনেক মহাপুরুষকে পর্যন্ত এদের পাল্লায় ফেলে দেওয়া হয়।

বললাম, কী রকম?

ডাক্তারবাবু বললেন, গান্ধীজী গিয়েছিলেন দলে পড়ে। সাধারণতঃ দলে পড়েই অনেকে যান। আর পরমহংসদেবকে, সাধক রামপ্রসাদকে বেশ্যা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আরও অনেক মহাপুরুষকেও।

বললাম, সাধক রামপ্রসাদের কাহিনী শুনেছি। পরমহংসদেবের কথাটা যদি বলেন ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারবাবু বললেন, না, আপনি দেখি একেবারে নাছোড়বান্দা লোক। বললাম, সেজন্যেই কেউ কেউ বলে যাত্রার দলের ছোকরা আর ছটাকি লেখকদের প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রশ্রয় দিলেই নাকি মাথায় চড়ে বসে তারা।

ডাক্তারবাবু বললেন, মথুরবাবু ঠাকুরকে চিনতেন। তবু সন্দেহ যায় না। মনে মনে ঠাকুরকে পরীক্ষা করার জন্য এক প্ল্যান কসলেন। মথুরবাবুর কাছে বারবণিতালয় অপরিচিত ছিলো না। কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণও ষোল আনা। তবে, 'বুদ্ধিভ্রষ্ট কর্মনষ্ট যদিও ঘটে না।' লছমন বাই নামে এক পরমাসুন্দরী বেশ্যা ছিলো। তার সঙ্গে মথুরবাবু কুপরামর্শ করলেন। ঠাকুরের সব কথা লছমনবাইকে খুলে বললেন মথুরবাবু। বললেন, তিনি, 'তেজোজ্জ্বল ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণতনয়।' লছমন বাই বললো, বড় বড় রথী টলিয়েছি সে এতো তুচ্ছ। মথুরবাবু লছমনবাইকে একা নিয়োগ করেই নিশ্চিন্ত রইলেন না। আরও ষোলজন রূপসী বারবণিতাকে লছমন বাইয়ের সঙ্গে দিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা মত মথুরবাবু জানবাজার থেকে ফিটনে চড়িয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গেলেন। সেখান থেকে সোজা লছমন বাইয়ের কুঞ্জে। ঠাকুরকে পৌঁছে দিয়ে কৌশল করে এক ফাঁকে মথুরবাবু কেটে পড়লেন। ঠাকুর পড়লেন সেই কুহাকিনীদের পাল্লায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবাবেশে শ্যামা-গুণ-গান গাইতে গাইতে গভীর সমাধিস্থ হলেন। ঠাকুরের এই ভাব দেখে সেই বারবণিতাদের কোথায় গেল অর্জিত কলাকৌশল, কোথায় গেলো মানুষকে মেষ করার কায়দা কানুন;

অশান্ত অদৃষ্টপূর্ব এই ব্যাপার দেখে সব বারাঙ্গনা সশঙ্কিত। অক্ষয়কুমার সেন মশায় লিখেছেন,

মূর্ছাগত দেখি যেন নিজের সন্তান।
স্নেহময়ী জননীর আকুল পরাণ॥
সেইমত হইল যত বারাঙ্গনা গণে।

তখন কেউ মুখে সুশীতল জল সিঞ্চন করে, কেউ ব্যাকুল হয়ে ব্যজন করে। কেউবা বুদ্ধি শূন্য হয়ে অন্যকে ডাকাডাকি করে। শব্দ শুনে মথুরামোহন এসে তো বেয়াকুব। তাড়াতাড়ি প্রভুকে নিয়ে সোজা জানবাজার।

ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় নিলাম ঘড়ির কাঁটা তখন একটার কাঁটা ছাড়িয়েছে।

পেছন থেকে ডাক্তারবাবু ডেকে বললেন, আর একদিন আসবেন দুপুরের দিকে, নিজের কেচ্ছা শোনাবো।

পেছন ফিরে উত্তর দিলাম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যে খনির সন্ধান পেয়েছি, সবটা না তুলে কি আর ছাড়ি।

ডাক্তারবাবু হেসে উত্তর দিলেন, খনি না ছাই!

বললাম, ভাঙ্গা কুলো তো আমিই আছি দাদা।

প্রোগ্রামের দিন সকালবেলা দ্বিজু চৌধুরী বাসায় এসে হাজির। তখনও ঘুম ভাঙেনি আমার। চৌধুরী সুর করে গাইছে, কত নিদ্রা যাওগো বন্ধু, কত নিদ্রা যাও, শিথানে জাগিয়া আছি দেখিতে না পাও।

ভাবলাম কোন বোষ্টম বাবাজী হয়তো। তা আমার ঘরের জানালা কেন বাবা। গেরস্তের ঘরে যাও। আমার ঘরে চালকলা কোথায়? বড়জোর এক আধটা বিড়ি খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। ঘুম ভাঙলেও মেজাজটা ভালো ছিলো, শুয়ে শুয়েই গেয়ে উঠলাম,

রাত জেগে শুয়েছি ঠাকুর এখন না জাগাও।
বিড়ি একটা দিতে পারি যদি প্রভু চাও॥

খোলা জানালা পথে ঠক ঠক করতে করতে চৌধুরী বললো, বিড়িতে কুলোবে না ভায়া গোটা পাঁচেক টাকা চাই।

তাকিয়ে দেখি অ্যা, চৌধুরী যে।

দরজা খুলতে খুলতে বললাম, সে কি হে, ও পাড়ার বেড়ালটার পর্যন্ত নাকি বেলা দশটার আগে ঘুম ভাঙে না। তুমি কি বেড়ালেরও অধম নাকি চৌধুরী।

চৌধুরী বললো, দরকার পড়লে আমরা শ্রীচরণ, শ্রীচরণের ধুলো হয়ে যাইগো ভায়া।

চৌধুরীকে বসিয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে কোন রকমে হাতমুখ ধুয়ে এসে বললুম, তারপর টাকার কথা কী বলছিলে গো। টাকা দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী বললে, শোন কথা মিনসের, টাকা দিয়ে কী না হয়! টাকা না থাকলে মাগ পর্যন্ত চিনতে পারে না সোয়ামী বলে।

ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁইয়ে বললাম, কিতাবের ভাষা বল চৌধুরী, এ তোমার কমলরাণীর ডেরা নয়। ভদ্রবাড়ী।

চৌধুরী লজ্জিত কণ্ঠে বললে, তোবা তোবা। এই নাক কান মুলছি ভাই। আর বলোনা, ও পাড়ায় থাকতে থাকতে কথাবার্তাগুলোও নর্দামা ঘেঁষা হয়ে গেছে। তা যাকগে, পাঁচটি টাকা বের করতো ভায়া। একটা ঢোলক পাওয়া গেছে। আমাদের গানের সঙ্গে খাসা হবে কিন্তুক।

বললাম, হুঁ।

—হুঁ কি? আরে মশাই বিকেলেই তো প্রোগ্রাম। রেডিওর টাকাটা পেয়েই, আপনার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দোব। নাকি বিশ্বাস হচ্ছে না। আর বিশ্বাস হবে কি, বেশ্যা বাড়ী, থুড়ি ইয়ে পাড়ার দালালদের কথা কি কেউ বিশ্বেস করে সহজে। না, নাথি ঝাঁটা খেয়ে কমলরাণীর কাছে হাত পাতলেই হতো। ভাবলাম, প্রোগ্রামের দিন, হাত পাতিতো সদ্ ব্রাহ্মণের কাছেই পাতি।

চৌধুরী মুখখানা বেগুন বেচা করে (সত্যি বলতে কি বেগুন বেচা মুখ ঠিক কীরকম আমি মশাই কোনদিন দেখিনি) সিগারেট টানতে লাগলো। বোঝ ঠ্যালা, এখন কী করা যায়! এর আগেও দু পাঁচ টাকা যে চৌধুরী আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেনি তা নয়। সেকি ধার না স্থায়ীভাবে গ্রহণ

তা বোঝার অবকাশ পর্যন্ত দেয়নি। ভাবটা এমন, তার টাকা দরকার, আমার পকেটে টাকা থাকলে (আমার পকেটে তখন টাকা থাকাও তিথি নক্ষত্র দেখেই থাকতো। পত্রিকে-ওয়ালারা যে দু দশ টাকা দিতেন, তাও সুখতালি না ক্ষয় করে তো পাবার উপায় ছিলোনা) তা চাইবার অধিকার দ্বিজু চৌধুরীর আছে। এবং তা পেলে আমার সামনেই ব্যয় করার একটা প্রত্নতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার যেন তার আছে।

আগের দিনই এক পত্রিকে থেকে গোটা দশেক টাকা পেয়েছিলাম, গোটা ছয়েক অবশিষ্ট ছিলো। ইতঃস্তত করে টাকা পাঁচটা এগিয়ে দিলাম। চৌধুরী নিস্পৃহ চোখে তা অবলোকন করলো। ততোধিক নিস্পৃহ ভাবে দু আঙ্গুল দিয়ে পকেট মারদের ভঙ্গীতে তুলে নিয়ে পুনরায় গম্ভীর ভাবে সিগারেট টানতে লাগলো।

কে যেন বলেছিলো, বেশ্যা বাড়ীর দালালের হাতে টাকা দিয়েছো কি নির্ঘাৎ জেনে রাখো সে টাকা তোমার পকেটে ফিরে আসবে না। বিশেষ করে সে দালাল যদি দ্বিজু চৌধুরী হয়। সোনাগাছি বাই লেনের এমন বাসিন্দে নেই, এমন ঝি, চায়ের দোকানের বয় নেই যে চৌধুরীর কাছে দু পাঁচ টাকা না পায়। এ নিয়ে অপমানও কম হতে হয় না চৌধুরীর। সবাইকে সে ঐ প্রোগ্রামের টাকা দেখিয়ে রাখে।

কাউকে হয়তো বলে, এই পানওয়ালা দাদা তুমি যেন কত পাও ?

পানওয়ালা হয়তো বললো, কেন দেবে নাকি ? তা ধর গিয়ে তোমার সাড়ে তিন টাকা।

চৌধুরী বলে বসলো, বেশ। তুমি যখন বলছো, আমি কি আর হিসেব দেখতে যাবো দাদা। তা আর দেড়টা টাকা ধার দাও দেখিনি, মোট পাঁচ টাকা মানে রাউণ্ড ফীগার হয়ে থাকুক। কালই তো রেডিওর টাকা পাচ্ছি। সোজা ট্যাক্সি করে তোমার এখানে নেমে তোমার হাতের একটা ছোট বাদশাহী পান খেয়ে, একেবারে পাঁচটাকা মিটিয়ে তবে ডেরায় উঠবো।

আশ্চর্য এই অবিশ্বাস করেও পানওয়ালা চৌধুরীকে রাউণ্ড ফীগার ধার দিয়ে বসতো। কোন পাওনাদার পথে ধরলে চৌধুরী বলতো, এই যে আজ কী বার ভায়া ?

—রোববার!

—কাল?

—সোমবার।

—সোমবার! বেশ।

পাওয়ানাদার কিছুটা ভরসা পেয়ে বলতো, তাহলে কাল আসবো।

চৌধুরী অম্লান বদনে বলতো, নিশ্চয়ই, কালকে এসো, কবে টাকা দোব বলে দোব? কিন্তু সব সময় এসব কায়দায় চলতো না। বেরসিক পাওনাদার নতুন গামছা বের করতে চাইতো। কোন কোন সময় দিতোও। কিন্তু চৌধুরীর তাতে বিন্দুমাত্র লাজলজ্জার বালাই ছিলোনা। বরং দুতিনদিন যেতে না যেতে সেই লোকের কাছ থেকে এক পাইট ধেনো নিদেন পক্ষে তাকে ধরে দু ছিলেম গাঁজার পয়সা ধার সে নিতই। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে চৌধুরী বললো, আরে মশাই ভাবছেন কি অ্যাত অ্যাঁ। আপনি তো প্রোগ্রামের সময় আমার সঙ্গেই থাকবেন। নক্সার কথার অংশটুকু তো আপনিই পড়বেন! তারপর এক সঙ্গেই তো রেডিও স্টেশন থেকে বেরুবো।

তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, না, মাগীবাড়ীর থুড়ি, ওপাড়ার দালালি করি বলে আর জাতে উঠতে পারলাম না ভায়া। কিন্তু আমিও যে একজন আর্টিষ্ট সেটা কেউ ভাবে না। আরে মশাই, আপনি না হয় এখনও ধোয়া তুলসী পাতা (কদ্দিন থাকবেন সেটা অবশ্য মা ধেনোশ্বরীই জানেন) কিন্তু ঐ তীর্থে কে না যায় দাদা। আপনি তো আপনি, অমন যে মহাকবি কালিদাস তিনি পর্যন্ত ঐ তীর্থে মাথা মুড়িয়েছিলো! বলি ঐ স্বর্গে কে না যায়। কেনাও যায়, মহারাজকুমার বোম্বাগড়ও যান্ন। যারা যায়না তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। অথচ সমাজে ফিরে তারাই সাধু গিরি ফলায়। আমরা না হয় দুকুল ডুবিয়ে বসে আছি। কিন্তু আমরাও তো এক সময় সমাজের লোক ছিলাম। কিন্তু বউটাই তো দিলে সব কাচিয়ে। ভাগ্নেবাবুটার সঙ্গে ইয়ে করতে দেখেই না মেজাজটা কেমন ইয়ে হয়ে গেলো। আশ্চর্য, কথা বলতে বলতে চৌধুরী ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সর্বনাশ করেছে। আরে আরে এটা ভদ্রলোকের বাসা! এখানে আমি

ছাত্র পড়িয়ে খাওয়া থাকা পাই।

না, চৌধুরীটা এই সাতসকালেই বেশ কিছু গিলে এসেচে!

দ্বিজু চৌধুরী আঙ্গুরবালাদের বেলগাছিয়ার বাসায় ঘুপসী ঘরে দিনের বেলাই লাইট জ্বালাতে হয়। কিন্তু বাড়ীওয়ালা তা দেবে কেন। দু টাকায় লাইট জ্বালিয়ে রাখবে সারাদিন এমন বড়মানুষী দ্বিজু চৌধুরীর থাকলে সে অন্য বাড়ীতে উঠে' যাক্। তিন চার রকমের লাইট রাখুক। শোবার সময় নীল আলো জ্বেলে স্বপ্নরাজ্যি তৈরী করুক গে। মাঘ মাসে ফ্যান চালিয়ে গায়ের গরম মারুক গে।

আঙ্গুর বলতো, এ একটু অন্ধকার কিছুই না। তুমি বাইরে থেকে আসো বলে আঁধার বেশী লাগে। কই আমার তো কোন অসুবিধে হয় না।

তা হয় না, চোখে সয়ে গেলে আঁধার লাগে না। নাগপুরের গরম খেয়ে এলে কোলকাতার গরমে লেপ গায়ে দিতে ইচ্ছে করে।

সেই ঘুপসী ঘরেই একদিন চৌধুরীকে ডাকতে এলো সুধু ঘোষ ওরফে ভাগ্নেবাবু। অনেক খুঁজে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে না শিল্পীর দেখা পেয়েছে। পাড়ার ছেলেরাই বলে দিয়েছে।

—ও, ঐ যে যাত্রার দলের সঙ্গীত পরিচালক, তা ঐ বাড়ী। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐযে ডান দিকে যেয়ে বাঁয়ের টালির চালাওয়ালা ঐটে। সাধনা করছেন তো, তাই বস্তি বাড়ীই ভাড়া নিয়ে থাকে। একটা মেয়েমানুষও সঙ্গে থাকে দাদা, যান। তবে মালটি কিন্তু বেশ জুটিয়েছেরে ক্যাবলা, 'একেবারে ফুটন্ত কমল যেন নর্দমার নীরে।'

ক্যাবলা বলেছে, মেয়েমানুষ কি রে শ্লা।. দেখছিস নে মাথায় সিঁদুর দেয়।

প্রথম মস্তান বলেছে, আরে শা—, যাত্রাদলের লোক আবার পুরুত ডেকে বিয়ে করে নাকি রে। ওসব জুটিয়ে নেয় মাইরী।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, তা কীজন্যে আগমন এজ্ঞে।

সুধু ঘোষ বলেছিলো, আগমন আর কিসের জন্যে, দুদিন যাওনা ম্যানেজারবাবু খবর দিতে বললেন, তাই আসা। কাল বায়না গাইতে যেতে হবে।

—তা তুমি এলে যে নাগর!

—কেন দোষ আছে নাকি! বলতো চলে যাই। এসেছিলাম বন্ধু বলে।

দ্বিজু চৌধুরী বলে, আহারে, বন্ধুর অদর্শনে তো একেবারে কাহিল দেখছি। বন্ধু দেখতে বুঝি এমন চুড়িদার পাঞ্জাবী, আর এসেন্স গায়ে লাগিয়ে আসতে হয়!

তা এসেছিলো ভাগ্নেবাবু। সেদিকে তাকিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে আঙ্গুরবালারও মনে হয়েছে, না ভাগনেবাবু যেন আগের থেকেও দেখতে সোন্দর হয়েছে। আর ভাগ্নেবাবুও দেখেছিলো, হুঁ, বিয়ের জল পেয়ে আঙ্গুরবালা ভাদ্র মাসের ভরানদীর মতো দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে যৌবনে।

দ্বিজু চৌধুরী বললে, কৈগো, কুটুম এলো একটু চা খাওয়াও। নাও ঐ সিলভারের বাটীতেই কাগজ জেলে চাপাও, আমি বরং দুটো সিঙ্গাড়া নিয়ে আসি।

ভাগ্নেবাবু অবশ্য আপত্তি করেছিলো। কিন্তু মনে মনে খুশীও হয়েছিলো। চৌধুরী চলে যেতেই সেদিকে উঁকি মেরে দেখে বলেছিলো, তারপর আঙ্গুরবালা ঘর সংসার কেমন লাগচে।

চাপা হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলো আঙ্গুর, যেমন দেখচেন!

সব কিছু কি আর দেখা যায়!

সব কিছু কি দেখানো যায়। চোখ থাকলে গ্যাখে।

—তা ঘরখানা যা তোমার, তোমার রূপের আলো না থাকলে অন্ধকারে হুঁচট খেতুম।

আঙ্গুরবালা উত্তর দিয়েছিলো, আর কত হুঁচট খাবেন। এবার নিজের ঘরে হ্যাজাক জ্বালিয়ে নিন।

সেদিন এই পর্যন্ত। আঙ্গুরবালাও সহজভাবেই কথা বলেছিলো। ……ও বেফাঁস কিছু বলেনি।

দ্বিজু চৌধুরী সিঙ্গাড়া পায়নি। দুটো লেড়ু বিস্কুট নিয়ে এসেছিলো। এসে বলেছিলো, তারপর ভাগ্নেবাবু গল্প সল্প হলো?

ভাগ্নেবাবু বলেছিলো, তুমিই নেই গল্প করবো কার সঙ্গে গো!

দ্বিজু চৌধুরী মনে মনে বলেছিলো, আহা—কী আমার সতীলক্ষ্মীরে! মেয়েমানুষ ছাড়া তুমি যেন অন্য কারো সঙ্গে কথা কও!

মুখে বলেছিলো, বেশতো বসো, পরাণ খুলে গল্প করি!

কিন্তু না, ভাগ্নে বাবুর হঠাৎ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়েছিলো। বলেছিলো, আর একদিন আসবো ভাই, আজ একটা জরুরী কাজ আছে।

দ্বিজু চৌধুরী মনে মনে বলেছিলো, ঘর যখন চিনে গেলে, না এসে কি তুমি ছাড়বে মক্কেল! তা এসো। যখন খুসী এসো। কিন্তু আমি বাসায় থাকলে কি আর আসবে চাঁদ!

এই থেকে সুরু। সত্যিই পথ চেনা হয়ে গিয়েছিলো। সুবিধে ছিলো, দূরের বায়না থাকলে আগে যদিও কোন কোন সময় দলের সঙ্গে যেতো সুধু ঘোষ কিন্তু এখন যেন আগের মত চাড় নেই। কী, না মামা দূরে যাওয়া পছন্দ করে না। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের জন্য যাওয়া। তা অ্যামেচার প্লেয়ারের উপর তো জোর নেই। সুতরাং সুযোগ পেলেই আঙ্গুরবালাদের বাসায় হাজির হতো……। আসতো। গল্প সল্প করতো। পাকে প্রকারে সুযোগ পেলেই পুরানো কথার খেই ধরে রঙ্গরসিকতা করার চেষ্টা করতো।

কোন কোন দিন এটা সেটা নিয়ে আসতো। মাথার দিব্যি দিয়ে আঙ্গুরবালাকে নিতে বাধ্য করতো। প্রথম প্রথম আঙ্গুরবালা কিছু মনে করতো না। আহা, হাজার হলেও ভাগ্নেবাবু তার জীবনের প্রথম পুরুষ। ঠিক প্রথম পুরুষ নয়। তার আগে পাড়ার বখা ছোকরা দু' একজন চিঠি চাপাটি যে না ছুঁড়েছে, আকার ইঙ্গিত যে না করেছে তা নয়। আর ঠিক সাড়া না দিলেও ব্যাপারগুলো যে কিশোরী আঙ্গুর একেবারে উপভোগ করেনি, ফাঁকেফোকরে দু'একটা কথাবার্তা না বলেছে তা নয়। এমন কি সতপ্ত দীর্ঘশ্বাস বা হৃদয় বিদারক কথাও যে না শুনেছে তাও অস্বীকার করতে পারে না। তবে একটু আধটু বোধগম্যি হওয়ার পর ভাগ্নে বাবুই জ্ঞানগম্যি যা দিয়েছে ও রাজ্যের। বিশেষ করে যখন সুধু ঘোষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেমন কেমন মুখে দুঃখ করে বলতো, আর বিয়ে, আঙ্গুরের মতো মেয়েকে নিয়েই যখন ঘর বাঁধতে পারলাম না, অন্যকে নিয়ে কি আর মন ভরবে! নইলে মামাবাবু তো লোক দিয়ে কত সাধাসাধি। এই কদিন আগে নন্দনগড়ের

বড় নায়েবের একমাত্র কন্যাকে দিয়ে সম্বন্ধ তো পাকাপাকি। কিন্তু না, যে চোখে আঙুরের মতো মেয়ে পড়েছে, পেয়ারা, বেদানা নামের মেয়ে কি আর সে চোখে পড়ে; আঙুরই বলুক। দেয়ালের ঐ আরসীটার সামনে দাঁড়িয়ে বলুক।

এ আর বলাবলির কী আছে। চিরকাল এই প্রশংসার অস্ত্রে পুরুষেরা নারীদের ঘায়েল করেছে, সেই শাশ্বত অস্ত্রাঘাত। বোকা হরিণীকে ফুসলে এনে ফাঁদে ফেলার কৌশল।

কিন্তু যাত্রার দলের মেয়েকে ফাঁদে ফেলা কি অতই সহজ! বিশেষ করে যে মেয়ে মন দেয়া নেয়ির পর ঘর বেঁধেছে!

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, ছাখো ভায়া, পাঁচদিনই যদি পোনামাছ খাও তাহলে তা গতানুগতিক হয়ে পড়ে। মনে হয় এ আর কী পেলাম। আহা, এর চেয়ে সেই যে ট্যাংরা মাছের ঝোল খেয়েছিলাম, কী না মিষ্টি ছিলো। কেমন তেল তেলে তার দেহ, কেমন মিষ্টি মিষ্টি গড়ন! আসলে কী জান, (অবিবাহিত অবস্থার প্রেমের একটা মজা কি জান ভায়া, তখন কোন পক্ষেরই টাকা পয়সা নিয়ে খিটিমিটি নেই, দুজনেই দুজনার কাছে যথাসম্ভব ছিমছাম সুন্দর দেখাতে চায়।) ঐ যে একটা গান আছে না, 'তুমি আমারে চেয়েছো বলে প্রিয় আমি সুন্দর সেজেছি যে তাই।' এ হচ্ছে সেই রকম। ফর্সা জামার নিচে যে ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জী তা দুজনের চোখের অন্তরালেই থাকে। তারপর টুকিটাকি এটা সেটা উপহার। মিষ্টি মিষ্টি মন গলানো কথা। সব মিলিয়ে প্রেমের অধ্যায়টা বড় মধুর। তারপর বিয়ে হলেই প্রথম কিছুদিনও চাঁদ ফুল নিয়ে চলে, কিন্তু তারপরেই রূঢ় বাস্তব। তখন সেই ছিপে না গাঁথা মাছটির জন্যে প্রাণ আইঢাই করে। আহা, তার ঘরে পড়লে না জানি কেমন সুখে রাখতো। আহা, সে কোনদিন আমার মনে আঘাত দেয়নি গো। আহা, তিল চাইলে সে আমাকে তাল এনে দিতো গো।

প্রেমের বিয়ের পরিণতিও অনেক ক্ষেত্রে তাই। আগে যা ঢাকা থাকতো, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তার কুৎসিৎ দিকটা বেরিয়ে পড়ে।

দ্বিজু চৌধুরী যে শুধু ঘোষকে পছন্দ করতো না শুধু ঘোষ নিজেও

তা বুঝতো। এক আধদিন মোকাবিলা হয়ে গেলে তুই সেয়ানে কোলাকুলি ঘটতো। মুখে দুজনেই যথাসম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতো। কিন্তু মনে মনে দুজনেই বিপরীত সম্পর্ক পাতিয়ে বসতো।

সুধু ঘোষ যথাসম্ভব দ্বিজু চৌধুরীকে এড়িয়ে এ বাসায় আসতো।

দ্বিজু চৌধুরী আঙ্গুরকে নিয়ে পড়তো।

—ওকে তুমি আসতে নিষেধ করতে পারো না?

আঙ্গুর বলতো, বারে তোমার বাসা, তুমি নিষেধ করতে পারো না?

কিন্তু তা পারে না দ্বিজু চৌধুরী। দলের অধিকারীর উপর সুধু ঘোষের বিরাট হাত। চাই কি, ইচ্ছে করলে দ্বিজু চৌধুরীর চাকরীটা 'নট্' করে দিতে একদিন দেরী হবার কথা নয়। বিশেষ করে মাঝে মাঝে সুধু ঘোষের কাছে হাত পাততে হতো দ্বিজু চৌধুরীর। টাকাটা সিকেটা ধার নিলে আর ফেরৎ দেবার কথা মনেই আসতো না। আর এই ধার চাওয়ার ব্যাপার আঙ্গুরবালা জানতো না। জানলে আবার যদি যাত্রার দলে যোগ দিতে চায়, তাহলে তো আরও চিত্তির। এতো তবু একজনের নজর, দলে এলে হাজার হায়নার নজর থেকে কপিলা গরু রক্ষা করার ঝামেলা।

এদিকে আজকাল ভাগ্নেবাবু আবার কায়দা ধরেছে। বাসায় দেখা হলেই বলে বসতে চায়, এই যে চৌধুরী সেই টাকাটার জন্যেই একবার এলাম ভাই। অধিকারী কি ম্যানেজারের সামনে চাওয়াটা বড় বিচ্ছিরী লাগে। হাজার হলেও তোমার তো একটা প্রেস্টিজ আছে। একজন মিউজিক ডিরেক্টর।

চোখে আগুন, মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে আঙ্গুরবালার চোখ কান এড়িয়ে বলতো, কী যে বল ভাই, যাত্রার দলের মিউজিক ডিরেক্টর ওতো হেতুড়ে লোকও হতে পারে। কিন্তু তোমাদের মত স্বাধীনতা কোথায় আমাদের।

পরক্ষণে গলা নামিয়ে বলতো, এ মাসের মাইনে পেলেই দিয়ে দোব ভাই। সব হিসেব করে রেখেছি। ভাগ্নেবাবু বলতো, আরে ঐ হিসেবের জন্য কী যায় আসে। ওজন্যে তুমি কিছু ভেবো না। ও আমি ঠাট্টা করলাম।

বলেই যেন ঠাট্টার দমকে হো হো করে বাড়ী কাঁপিয়ে হেসে উঠতো। হঠাৎ চমকে উঠে আঙ্গুরবালার হাতের চায়ের কাপ ছলকে উঠে লজ্জা দিতো আঙ্গুরবালাকে। কিন্তু অভাবের আগুন কাপড় চাপা দিয়ে কদিন চলে। একদিন না একদিন কাপড় ধরে উঠবেই। মাছের পাট আগেই উঠেছিলো। এখন ডাল নুনেও ধার বাকী।

আর বাড়ীওয়ালার কাছে হাত পাততে তো আঙ্গুরবালাই। কিন্তু এতবড় একজন মিউজিক ডিরেক্টরের বউ হয়ে, ধার বাকী চাইতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কত না গল্প করেছে আঙ্গুরবালা, এরকম বাড়ীতে কি থাকা অভ্যেস আছে নাকি। শীগগিরই দমদমার বাড়ীতে উঠে যাবে।

দ্বিজু চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে কিছুদিন আগে ও-না বলেছে, হ্যাঁগো তোমার দমদমার বাড়ী কোথায় হচ্ছেগো! পাশের ঘরের উমাদি জানতে চাইছিলেন?

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, বলে দিও অ্যারোপ্লেন যেখানে নামে তার পাশে।

উমাদি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই জবাব করেছিলেন।

—অ্যারোপ্লেন যেখানে নামে সেতো সরকারী জায়গা। সেখানে আবার বাড়ী হবে কী করে গো আঙ্গুর দিদি।

দ্বিগুণ বয়েসের উমাদি একগুণ বয়সের আঙ্গুরবালাকে দিদি বলেই ডাকতো। ভাড়াটে বাড়ীতে তাই রেওয়াজ। সব থেকে মজা লাগতো দ্বিজু চৌধুরীর পঞ্চাশ বছরের বাড়ীওয়ালী যখন উত্তরের ঘরের ভাড়াটেদের বার বছরের মেয়েকে ছায়াদি বলে ডাকতো।

আঙ্গুরবালা দ্বিজু চৌধুরীর শেখানো মতো বলতো, তা দিদি, ওঁর কথা আর আমি কতটুকু জানবো। রাজা রাজড়ার বাড়ীতে গাওনা করে। কোন রাজাবাহাদুর জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তা আমি মেয়ে মানুষ, আমি খোঁজ নিতে চাইনি।

উমাদির পাশের ঘরের ভাড়াটে বেলাদি বলতো, তা যা বলেছ দিদি; আমরা মেয়ে মানুষ, দুটি অন্ন, আর একটুকরো ট্যানা পেলেই যথেষ্ট। ব্যাটাছেলে, পুরুষ মানুষ কোথায় কী করবে আমাদের তার খোঁজ খবরে

দরকার কী!

আঙ্গুরবালাও প্রথম প্রথম খোঁজ খবর রাখতো না। দ্বিজু চৌধুরী মদ খেতো। আঙ্গুরবালা যাত্রার দলে থাকার সময় থেকেই খেতো। খায়ও অনেকে। যাত্রাদলে থাকলে, দিনের পর দিন রাত জাগলে নাকি না খেয়ে পারেও না। থানার ইনস্পেকটর বাবু হলে বলতেন, ঐ ঐটে হলো চিল্পী আই মীন্ শিল্পী হওয়ার লক্ষণ।

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, মদ খেলোনা, মেয়ে মানুষের কাছে গেলো না, তাহলে সে জীবনে জানলো কী? আর তাহলে একটা নিরামিষ্যি জীবন বয়ে ষাট, সত্তর, আশী বছর বেঁচে থাকার মানে কি হয় দাদা! জীবনকে জানতে চাও, মদ খাও। জীবনকে ভুলতে চাও, মদ খাও। তবে হ্যাঁ শুদ্ধি করে খেতে পারো। তিল তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করে নিতে পারো। তাহলে আর কোন দোষ থাকে না। বিশ্বেস না করো দেবতার দিকে ছাখো, তাঁরা গিয়ে তোমার কী বলে সুধা পান করতো। মুনি ঋষিরা সোমরস পান করতো। সাহেব সুবোরা জলের পরিবর্তে ঐ দ্রব্যি পান করে থাকে। উনবিংশ শতকের প্রগতিশীলরা পিতার হস্ত থেকে স্বাস্থ্য পান করতেন।

এরপর আর বাধা কি? আর বাধা দেবেই বা কে? তবে ইদানীং তা মাত্রায় বেড়েছিলো। ঘরে অভাবটা বেশী ছিলো তো!

তা ছাড়া যাত্রার দলের নতুন সখী সাজা মেয়েটার দিকে একটু নজর পড়েছিলো। আঙ্গুরবালার চেয়েও কুসুম অনেক আঁটসাট, অনেক ফুটন্ত মেয়ে। কথার ঢল, চোখের ঢলানি, মুনির মন টলানি না হলেও যাত্রার দলের মস্তানদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে প্রতিপক্ষও অনেক। কিন্তু গানের মাষ্টারের সুযোগ বেশী। বিশেষ করে সে মাষ্টার যদি নাচের মাষ্টারও হয়।

আঙ্গুরবালা এতসব জানতো না। ভাগ্নেবাবু জানতো। সুতরাং একদিন সুযোগ বুঝে সেই জানা জিনিস্ আঙ্গুরবালাকে না জানিয়ে পারেনি।

তা অবশ্য আরও কিছুদিন পরে। তবে ইদানীং যে দ্বিজু চৌধুরীর আগের মত ঘরে ফেরার টান ছিলোনা এটা লক্ষ্য করেছিলো আঙ্গুর। কোন কোন রাত্রে বাড়ী ফিরতেও দেরী হতো। গাওনা না থাকলেও।

আসতো এসেই শুয়ে পড়তো। আঙ্গুরবালা খেয়েছে কি খায়নি, তা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতো না। এমন কি বাড়ীতে হাড়ি চড়েছিলো কিনা, এ খোঁজও না।

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, জ্ঞান বিবেক তো তখনও লোপাট হয়নি। তাই জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেতাম না। পাছে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়! চাল কিনে দিলে তো তা পিণ্ডির জোগার হবে।

ধারধোর করে আর কদিন চলে। কথা মুখ দিয়ে বেরুলেই তো তা কটু কথা!

এমনি সময় একদিন বিকেল বেলা। দ্বিজু চৌধুরী বাসায় ছিলোনা। তবে দুপুরে রান্না হয়েছিলো। রান্নাবান্না করে দ্বিজু চৌধুরীর জন্য বসেছিলো আঙ্গুরবালা! কিন্তু না মনিষ্যিটির দেখা নেই। হাড়িকুড়ি সিকেয় তুলে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত দেহে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম যখন ভাঙলো, ধড়মড় করে উঠে বসলো। না, দ্বিজু চৌধুরী আসেনি। কলে জল এসেচে। আর অপেক্ষা করে কী হবে এই ভেবে গা ধুয়ে আসতে বাথরুমে ঢুকেছিলো আঙ্গুর। গামছা পরেই ঢুকেছিলো। এমন কতদিনই তো ঢোকে। দুখানা শুকনো শাড়ী তো অনেক দিন দেখেনি আঙ্গুরবালা।

গা ধুয়ে, ঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে বুকের গামছাটা সবে সরিয়েছে আঙ্গুরবালা। অন্ধকারটা ততক্ষণে চোখে সয়ে গেছে। হঠাৎ পিছু ফিরে শাড়ীটা নিতে যেয়েই নজর পড়লো। কে দ্বিজু চৌধুরী! না, চোখ দুটিতে বিশ্বের ক্ষুধা নিয়ে বসে আছে স্বয়ং ভাগ্নেবাবু ওরফে সুধুচন্দ্র ঘোষ।

কখন এসে চোরের মত বসে আছে কে জানে।

রেডিও স্টেশন থেকে ট্রামে শ্যামবাজার ডিপোর কাছে নেমেছি। নেমে মনে মনে দ্বিজু চৌধুরীর মুণ্ডপাত করতে করতে দু'পা এগিয়েছি। ব্যাটা দালাল আমার টাকাটা দেয়নি। বলে কিনা চেক পেয়েছি। চেকটা ভাঙিয়ে কাল দিয়ে যাবে। চেক পেয়েছে কথাটা সত্যি কিন্তু কাল দিয়ে যাবে কথাটা কি সত্যি? কেষ্ট ঠাকুরও তো শ্রীমতী রাধাকে কালের

কথা বলেছিলেন। আমি অবশ্য গোপী নই, কিন্তু ব্যাটা দালাল তো কলির কেষ্ট। ছাখো দিখিনি, কবে চিৎহস্ত উপর করে।

কেষ্টরাম বসুর রাস্তার কাছে আসতেই পেছন থেকে কে যেন ডাকলো। "আরে ভায়া না? এই যে এখানে।"

পিছন ফিরে দেখি, ডাক্তারবাবু একখানা বাইরের ঘরে বসে আমাকে ডাকছেন।

বললাম, আজ আবার এখানে যে! সেদিন দেখলাম অন্য বাড়ীতে।

—এটা এক বন্ধুর বাসা। ওরা গেছে কয়েকদিনের জন্য বাইরে। তাই একটু দেখাশোনা করছি আর কি?

তারপর বললেন, এবার বলুন কী খাবেন!

খিদে পেয়েছিলো ঠিকই। ব্যাটা দ্বিজু চৌধুরীর হাত দিয়ে এক পয়সাও গলেনি। এ বেলায়ও বলেছিলো, আজকে তোমরা যার যার পয়সায় খাও। চেক ভাঙিয়ে সবাইকে ভরপেট খাইয়ে দেবো।

কমলরাণী বলেছিলো, মিনসের কথা শুনলে ইয়ে হয়। এক পয়সার তেল দিয়ে বিয়ের রান্না রাঁধবে, গায়ে মাখবে, কালকের জন্যে আবার কিছু রেখে দেবে। এই জন্যেই তো ওর দলে আমি গাইতে চাইনে। ওর মতো ছ্যাচড়া আছে নাকি? ইচ্ছে করে নোড়া ঘঁসে দি মিনসের ক্যালানো দাঁতে।

দ্বিজু চৌধুরী হাত কচলে বলেছিলো, এ হেঃ হেঃ, আর হাটে হাঁড়ি ভেঙোনা লক্ষীটি। রেডিও অফিসের সবাই জানে সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরের সহশিল্পীবৃন্দ নিয়ে গান গাইতে এসেচি। আর আসলেও তো ভদ্রঘরের বেশ কয়েকজনা আছেন গো, তেনারাই বা কী ভাববেন।

ভাববার যা আমরা তখন ভেবে বসেছিলাম। সুনীল বাড়ুয্যের ছাত্রী ক্ষেয়া ব্যানার্জি তো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলো। তার সঙ্গে আসা বাবা-ভদ্রলোক তো ভ্রূ কুঁচকে মেয়েকে যেন কী বলছিলেন।

এরপর আর যাই হোক, ক্যান্টিনে যেয়ে চা জলখাবার খাবার বাসনা করা বাতুলতা। বিশেষ করে দ্বিজু চৌধুরী এবং তার অভিজাত সহশিল্পীবৃন্দ চুলে চুলে মারামারি করিয়া যে যুদ্ধ তাহাই যদি আরম্ভ করে!

তবু ডাক্তারবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বললাম, না এইমাত্র রেডিও স্টেশনে কিছু খেয়ে এলাম তো!

ডাক্তারবাবু বললেন, আবার ওপাড়ায়ও যাতায়াত আছে নাকি? তা কোন পরিকল্পনার চেয়ে পরীদের কল্পনা মন্দ নয়।

একটু গর্বিত কণ্ঠে বললাম, না, আজকে একটা রেডিও প্রোগ্রাম ছিলো কিনা! একটা বেতার নক্সা।

ডাক্তারবাবু বললেন; তাই নাকি? তবে তো আপনি মশাই একজন বেশ গুণী লোক! এঃ, আগে যদি জানাতেন তাহলে আপনার প্রোগ্রামটা শোনা যেতো! কিন্তু এরপর তো আর আপনাকে কিছু না খেয়ে উঠতে দিতে পারিনে।

মনে মনে ভাবলাম, আমিও আর না খেয়ে উঠতে পারিনে।

ডাক্তারবাবু রুটি মাংসের অর্ডার দিলেন। সর্দার হোটেলের কষামাংস। ঐ সঙ্গে কয়েকটি কোবরেজী কাটলেট। আর মিষ্টি; না, কোলকাতায় তখনও সন্দেশ রসগোল্লার উপর ঢেঁরা পড়েনি। ডেরায় আনা মোটেই কঠিন ছিলোনা। দ্বিজু চৌধুরী হলে বলতো, ভাগ্যি করে এসেছিলে ভায়া। তোমাদের কেমন জুটে যায়। মিষ্টি অবিশ্যি আমাদের ভাদ্রবউ। ওসব বস্তু ছুঁতে নেই। কিন্তু আমাদের কপালে কোবরেজী কাটলেট তো দূরের কথা, হেতুড়ে কাটলেটও জোটে না।

আরাম করে বসে বললাম, তাহলে আগের দিনের কথাটার জবাব দিন ডাক্তারবাবু? নাকি বাইরে যাবার তাড়া আছে?

ডাক্তারবাবু বললেন, না এ কয়দিন আমার বিশ্রাম।

পরে শুনেছি, পাশপোর্টের অপেক্ষায় বসেছিলেন তিনি। অন্য সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ফরেন এক্সচেঞ্জ, কেনাকাটা সব।

ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে খাওয়া দাওয়াটা সেরেই আরম্ভ করা যাক, কী বলেন? সেই কখন রেডিও স্টেশনে খেয়েছেন। তারপর কি আর ধকল কম গেছে।

আশ্চর্য, খাবার এলে কিন্তু তিনি কেবলমাত্র এক কাপ চা মাত্র তুলে নিলেন। মুখে বললেন, মনে কিছু করবেন না ভাই, বিকেলে চা ছাড়া

আর কিছু চলে না আমার। উঁহু, একপাশে সরিয়ে রাখলে চলবে না। এমন দিনে একজন গুণীকে একটু খাওয়াতে সাধ জেগেছে।

ডাক্তারবাবু কি আমার মুখ দেখে ক্ষিদের কথা টের পেয়েছিলেন? নাকি মাংস রুটির দিকে আমার দৃষ্টি প্রখর হয়েছিলো বলে!

ডাক্তারবাবু আরম্ভ করলেন।

হ্যাঁ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিলো। আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের এক বন্ধু ছিলো, মেদিনীপুরের ওদিকে বাড়ী। বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। ওপাড়ায় তার যাতায়াত ছিলো। একদিন তার পাল্লায় পড়ে আমরা আরো দু' তিনজন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বেরুলাম। সেদিন ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহ। অধিকাংশ বাড়ীই হাউসফুল যাচ্ছে। মাসের প্রথম দিকটায় অমন যায়। চাকুরে বাবুদের হাতে টাকা থাকে তো!

অবশেষে খুঁজে পেতে একটা বাড়ী পাওয়া গেলো। তেমন কিছু উঁচুদরের বাড়ী নয়। রেটও কম। ঔজ্জ্বল্যও কম।

কেউ কেউ মত করলো, আজ না হয় ফিরে যাই।

অন্যেরা বললো, এসেচি যখন, ফিরে যেতে হলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই যাবো। সুতরাং আমরা বাড়ীওয়ালীর সঙ্গেই কথা বললাম।

বললাম, আমরা আলাদা আলাদা ঘর চাই। আর প্রত্যেকে একজন করে মেয়ে চাই।

বাড়ীওয়ালী কিছুক্ষণ ভেবে রাজী হলো।

আমার ভাগে যে মেয়েটি পড়লো, সে মোটামুটি ফর্সা। বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। কিন্তু কেমন যেন রোগা আর ফ্যাকাশে।

মেয়েটি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলো। সাধারণ ঘর। মেঝেতে একটা তক্তপোষ। বিছানার চাদরটাও তেমন পরিষ্কার নয়। বালিশগুলোও কুকড়ানো। ঘরটার একপাশে একটা কাঠের পার্টিশন করা। পার্টিশনের গায়ে একটা দরজা। দেয়ালে দু একখানা বিলিতি মেমের ছবি। একপাশে কেষ্টঠাকুর গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করে গাছের ডালে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। গোপিনীরা কেউ জলে অর্ধেক বা সিকিখানেক ডুবে হাত

জোড় করে কেষ্টঠাকুরের কাছে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। একজন গোপিনী বিচ্ছিরীভাবে গাছের গুড়িতে দেহ লেপটে লজ্জা নিবারণ করছে। কিন্তু চতুর কেষ্টঠাকুর নির্বিকার। কাপড়গুলো অবশ্য আলাদা আলাদা ভাবে এ ডালে সে ডালে ঝুলছে। তার দু একটা ডাল এমন সরু, কেষ্টঠাকুর তো কেষ্টঠাকুর একটা ইঁদুরও যদি সেখানে এগুয় ডাল ভেঙে নির্ঘাত জলে পড়বে। ছবিটে কার আঁকা জানিনে, তবে প্রত্যেকটা গোপিনীই শুকনো কাটখোট্টা। ছোকরা-কেষ্টঠাকুরের দিদিমার বয়সী। কে একজন বলেছিলেন, ছবিটা ইংরেজ আমলে আঁকা প্রতীক ধর্মী ছবি। ইংরেজ সরকার আমাদের অন্নবস্ত্র কেড়ে নিয়ে ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে। আর আমরা সবাই অন্নহীনা গোপিনীর দল, সেই বাউণ্ডুলে ইংরেজ ছোকরার কাছে হাত পেতে দয়া ভিক্ষে চাইছি।

ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করা গেলো। তারপর তক্তপোষের উপর এসে বসলাম। তক্তপোষটি সশব্দে প্রতিবাদ জানালো। যেমন শুনেছিলাম, এদের ঘরজোড়া গদি বিছানো থাকে। বসলে কোমর অব্দি ডুবে যায়। ঘরের মধ্যে নাকি একশ টাকা শিশির ফরাসী সেন্টের গন্ধ ভাসতে থাকে। তেমন কিছু দেখলাম না। গুমট, কেমন একটা বদ্ধ গো-ডাউনের গন্ধ ছাড়া অন্য কোন গন্ধ নাকে এলোনা। সব মিলিয়ে মনে হলো, মেয়েটা বড় অসহায়। বড় কমদামী। নইলে দেয়ালে কেউ দেশী কাঁচের আরসী রাখে। ফ্লাউয়ার ভাসে কেউ কাগজের বিবর্ণ ফুল রাখে! এবার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার পালা।

মেয়েটি আগেই তক্তপোষে বসেছিলো। এবার উঠে যেয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো। ঘরে পাখা ছিলোনা। গুমট গন্ধটা যেন আরও পেয়ে বসলো। না, এর চেয়ে দরজাটা খোলা থাকলেই ভালো হতো। কী জানি হয়তো দরজা বন্ধ থাকাই নিয়ম। নইলে আবার কোন খদ্দের এসে রসভঙ্গ করবে তার ঠিক কি?

মেয়েটাকে কাছে ডাকলাম। তারপর কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলাম এবং সবাই যে প্রশ্নটা সাধারণতঃ করে থাকে শুনেছি, সে প্রশ্নটা আমিও করলাম।

কেন সে এপথে এলো। সে কি আর অন্য কোন ভদ্র উপায় খুঁজে পায়নি জীবিকার্জনের! এপথে এসে কি সে সুখী হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটা যান্ত্রিকভাবে একটা মনগড়া কাহিনী আমাকে শুনিয়ে দিলো।

বললাম, কাহিনীটা কী ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারবাবু বললেন, ঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ বলেছিলো, স্বামীর এক পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে বর্ডার পার হবার জন্যে স্বামীর সম্মতিক্রমেই রওনা হয়েছিলো। স্বামী তার দোকানের পাওনাগণ্ডা আদায় করে, কিছুদিন পরে পশ্চিমবঙ্গে আসবে। পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে স্বামীটি এপারে এসেছিলো ঠিকই। কিন্তু পুলিশ বন্ধু এদিকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে, সুযোগ মত পাকিস্তানে পালিয়েছে। আবার কাউকে বর্ডার পাশ করাতে কিনা কে জানে! সব শুনে স্বামী তাকে ঘরে নিতে চেয়েছিলো কিনা জানতে চাইলে মেয়েটি বলেছিলো, আর নেয়! লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে নতুন বউ নিয়ে এখন ঘর করছে।

বললাম, তাহলে তো স্বামীটাকে একটা পাষণ্ডই বলতে হয়। জেনেশুনে অমন বন্ধুর সঙ্গে পাঠাতে গেলি কেন? আর নির্দোষ মেয়েটাকে এমন হেনস্থাই বা করলি কেন, ব্যাটা পাষণ্ড।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা পাষণ্ড বলুন। কিন্তু মেয়েটির আর কোন উপকার হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপর একটু থেমে বললেন, শুনুন তারপরের ঘটনা।

তার কোন রোগ আছে কিনা জানতে চাইলাম আমি।

মেয়েটি উত্তরে বললো, না। তার কোন রোগ নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই আমি তা অবিশ্বাস করলাম। রোগ থাকলে এরা রোজগার বন্ধ হবার ভয়ে মিথ্যে কথা বলে থাকে, এক্সপার্ট বন্ধুটি আমাকে বলেছিলো। বিশেষ করে এমন একজন সাধারণ মেয়ের রোগ থাকবে না এটা সত্য বলে বিশ্বাস করিই বা কী করে!

মেয়েটি দিব্যি কেটে বলেছিলো, এক ডাক্তার তার ঘরে আসে প্রতি সপ্তাহে। রোগের চিহ্ন দেখলে তিনিই নাকি চিকিৎসা করেন।

কে জানে একথাটাও মেয়েটি বানিয়ে বলেছিলো কিনা। কারণ

শোনাচ্ছিলো, মিথ্যে কথা বলতে এরা এক অদ্ভুত ধরণের অশিক্ষিত পটুত্ব লাভ করে। অথচ এমনভাবে বলে যে সেই মুহূর্তে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। বিশেষতঃ, ডাক্তারের কথা বলাতে ব্যাপারটা আমারও সত্য বলে মনে হয়েছিলো। নিজের প্রোফেশনের লোক ওকে পরীক্ষা করে, এটা যেন এক কথায় বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে আপত্তি ছিলোনা আমার। এদিকে, আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন দু একবার কাঠের পার্টিশনটার ওদিক থেকে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছিলো। ফলে কথা বলতে বলতে দু একবার আমি উৎকর্ণ হয়ে, শব্দটা কিসের তা অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলাম। এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, শব্দটা কিসের !

মেয়েটি খানিক সেদিকে তাকিয়ে বললো, ও কিছু নয়। ইঁদুর আরশোলাটোলা হবে হয়তো !

তা হবে। যে প্রাসাদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল-দেখা বাড়ী। বিছে, ইঁদুর আরশোলা কেন, সাপ নেউল বেরুলেও আশ্চয হতাম না।

ওদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। কে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে এই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রয়েছে। এমন কি একবন্ধু টিটাগড়ের রেল লাইনের ধার দিয়ে আসতে আসতে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলো। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করতে চাওয়ায় যে জীবনটা বাজে খরচ হবার উপক্রম হয়েছিলো, সে অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনা হয়ে গেছে। অবশেষে পরিচিত এক পোষ্টাল পিয়ন যে নাকি ঐখানে বদলি হয়েছিলো, তার আগমনে কোন রকমে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলো। পিয়ন ভদ্রলোকটিকে খাতির করার কারণ, ওপাড়ায় চিঠি বিলি করার সময় অনেক বাড়ীতে চিঠিও পড়ে দিয়ে আসতে হতো। কাজেই খাতিরটা জমেছিলো। এমন কি চা সিগারেটের সঙ্গে এক আধটা বিস্কুটও জুটেছিলো। মেদিনীপুরের রথীটিকে বাদ দিলে, এই অভিজ্ঞতাই এখনও পর্যন্ত কেউ ডিঙ্গোতে পারেনি।

সুতরাং সেদিক থেকে আজকের অ্যাডভেঞ্চারের তাৎপর্য অপরিসীম। অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই সময় মাত্র এক ঘণ্টা।

কাজেই ইঁদুর বেরালের কথা চিন্তা না করে, আবার কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

এখানকার জীবন তার কেমন লাগছে, একথার উত্তরে মেয়েটি বললো, মন্দ নয়। —কী রকম মন্দ নয়!

মেয়েটি বললো, নিত্য নতুন লোক দেখি। কত অভিজ্ঞতা লাভ করি! কেউ মুখর, কেউ মূক। কেউ বকবক করে মাথা ধরায়। কেউ সন্ন্যাসীদের মতো নিস্পৃহ। কিন্তু পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে সবাই সমান।

বললাম, আর একটু খুলে বলনা?

মেয়েটি বললো, আপনি খবরের কাগজের কেউ নাকি? এসব কথা আর খুলে বলার কী আছে! কেউ আসে পয়সাও কম খরচ করবে, অথচ আনন্দ স্ফূর্তি চাইবে আঠার আনা। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করবে। আবার কেউ পয়সা খরচ করতেই যেন আসে, পাছে আমরা ভাবি লোকটা না জানি কত উঁচু দরের। অথচ এটাতো আমরাও বুঝি এর চেয়ে উঁচু জায়গায় যাবার পয়সা থাকলে কেউ এখানে আসে না।

বললাম, এই জীবন থেকে তুমি মুক্তি পেতে চাও না?

মেয়েটি ম্লান হাসি হেসে বললো, কেন আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন নাকি?

তারপর শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললো, দেখুন, দুটো টাকার জন্যে আমার জীবন কাহিনী শুনে আমার সময় নষ্ট করে কী লাভ! তার চেয়ে যে জন্যে এসেছেন, সেই দিকে মন দিন।

তবু বললাম, কেন কেউ যদি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধে তাহলে তো একটা নিশ্চিন্ত জীবন পেতে পারো।

মেয়েটি বললো, দেখুন, আবেগের মুহূর্তে আপনাদের মতো ভদ্রলোকেরা বিয়ে করা বউকেই কত কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমাদেরও দেয়। কত ভালো ভালো কথা শোনায়। কত স্বপ্ন গড়বার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এটাতো বুঝতে না পারার কথা নয়, আমাদের নিয়ে বিলাস চলে, ঘর বাঁধা চলে না। আপনাদের শরৎবাবু পর্যন্ত সতীশকে দিয়ে সাবিত্রী ঝি ঘর বাঁধতে পারেন নি। অথচ যে কোন ভালো মেয়ের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলোনা।

বললাম, অনেকে তো ঘর বাঁধেও শুনেছি।

মেয়েটি বললো, দু চারজন যে ঐ লোভে পড়ে এখান থেকে বেরিয়ে

যায়নি তা নয়। সত্যি সত্যি ভালবাসার টানেই গেছে। কেউ কেউ টাকা কড়ি গয়নাগাটি নিয়েই বেরিয়েছে। ঠিক যেমনটা আপনাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা দু দশজন প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, বাপের বাক্স, ভেঙ্গে টাকা, মায়ের বাক্স ভেঙ্গে সোনার গয়না নিয়ে! শেষ পর্যন্ত কী হয়?

বললাম, কেন আমাদের অনেক মেয়ে তো ঘর বেঁধে সুখে ঘর সংসার করে।

মেয়েটি বললো, আমাদের বেলায় সে ঘর ঐ গয়নাগাটি থাকা পর্যন্ত। আমাদের যতই ঘৃণা করেন আপনারা, কিন্তু বেশ্যার টাকায় বড়লোক হয়েছে, বেশ্যার মেরে বড়লোক হয়েছে এমন সংখ্যা আপনাদের কোলকাতা সহরে বেশ দু দশজন পাবেন। আর ঐ যে যারা ভালবাসার টানে বেরিয়ে গেলো, তারা আবার ফিরে আসে। একশজনে নিরানব্বুই জন তো বটেই। কিন্তু ততদিনে এরকম পল্লীতে ব্যবসা করার মতো যৌবনও তাদের থাকে না। ফলে আরও কমদামী পল্লী তারা খুঁজে নেয়। আরও নোংরা অঞ্চল। আরও নোংরা কাণ্ডকারখানা চলে যেখানে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, বল কি? কিন্তু কোন কোন বইয়ে যে দেখি—। মেয়েটি শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো, কী দেখেন! বেশ্যার জন্য সমাজ, প্রতিষ্ঠা, সব ছেড়ে আন্দামানে ঘর বাঁধতে গেলো! ওসব ঐ নাটক নভেলেই চলে! পাগল, আপনাদের সমাজ দেবে আমাদের স্বীকৃতি, আপনারা দীর্ঘদিন সহ্য করবেন আমাদের? দুদিন বাদে নেশা ছুটে গেলে আমাদের পুরানো কথা মনে পড়বে না? বলে, আপনাদের কোন গৃহবধূ পদস্খলন করে দেখুক না কী হয়! আমরাই কি চিরকাল এই ছিলাম! আমাদের একটা পদস্খলন সইতে পারেন নি আপনাদের সমাজের স্বামী মহাপুরুষ, আর হাজারবার দান করা দেহকে সম্মান দেবেন আপনারা? 'বেনারসী' বলে একটা বই বেরিয়েছে না আপনাদের এক নামজাদা লেখকের! দেখেন নি, অত পরোপকার করেও তার হালটা কী হয়েছিলো!

তারপর একটু থেমে বললো, নিন, আরও দেরী করলে কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে তা বলে রাখছি!

ঠিক এমনি সময়, পাশের পার্টিশনের ওপাশ থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানী ভেসে এলো।

চমকে উঠলাম। এসব জায়গায় অনেক সময় পাশের ঘরে, তক্তপোষের তলায় গুণ্ডা রাখা হয় শোনা ছিলো। আর এই গুণ্ডারা যে কী উদ্দেশ্যে লুকিয়ে থাকে তাও অভিজ্ঞবন্ধুরা বলে দিয়েছিলো। কিন্তু কৈ আমি কি মেয়েটার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছি, নাকি আমার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি আছে বলে এরা ভেবে নিয়েছে!

কোন কিছু সিদ্ধান্তে আসার আগেই চট করে তক্তপোষের ঝুলেপড়া চাদরটা তুলে ধরলাম।

না, নিচে কেউ নেই।

কিন্তু কাঠের পার্টিশনটার ওপাশে কী! কী ওখানে!

এমনি সময় একটা ধপাস করে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট চিৎকারের মত শব্দ হয়ে, তা থেমে গেলো।

বললাম, বল কী ওখানে? কে ওখানে!

বলেই লাফিয়ে গিয়ে পার্টিশনের শেকল দেওয়া দরজাটা খুলে ফেললাম। আধা অন্ধকারে একফালি জায়গায় একটা ঝুড়ির মধ্য থেকে একটা অতি শীর্ণশিশু হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে গেছে!

মেয়েটিও আমার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলো। আর তার দিকে তাকিয়ে সেই কঙ্কালসার শিশুটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে বলে উঠলো, আমি ঘুমুইনি মা। আমি ঘুমুইনি। আমার কোন দোষ নেই মা। আর কোনদিন এমন হবে না মা। তুমি আমাকে মেরোনা মা।

মেয়েটি পাংশুমুখে আমার হাতে পায়ে পড়তে লাগলো।

—আপনি মনে কিছু করবেন না। আপনি রাগ করবেন না বাবু, আমি ক্ষমা চাইছি। চলুন আমরা ওঘরে যাই। চলুন ওঘরে যেয়ে গল্প করি।

সবকিছু আমার চোখের সামনে ঘটছিলো। অথচ কোন কিছুই বোঝার সামর্থ যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তবু পরক্ষণেই দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না। বল ও কে? ও তোমাকে মা বলছিলো কেন? কী হয়েছে ওর? একটা ঝুড়ির মধ্যেই বা ওকে রেখেছিলে কেন?

একটু সম্বিত ফিরে আসতেই তাকিয়ে দেখি, মেয়েটির দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।

কেঁদে বললো মেয়েটি, আপনি যদি রাগ না করেন তাহলে বলি। ও আমারই ছেলে। আজ সাতদিন ধরে ওর অসুখ। আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে দেখেছি ওর গায়ে একশ' আড়াই ডিগ্রী জ্বর। আমি নিজেও ক'দিন আগে অসুখে ভুগে উঠেছি। কালই ভাত খেয়েছি। ঘরে একটা পয়সাও নেই, যা দিয়ে ওর জন্যে ডাক্তার ডাকবো, পথ্য কিনবো। তাই পেটের দায়ে কাল থেকে কাজে নেমেছি। কাল লোক আসেনি। কালও ও ওখানেই ছিলো। কাল জ্বরটা কম ছিলো। ঘুমোয়নি। পড়েও যায়নি। আজ জ্বরটা বেশী। কী করে পড়ে গেছে। আপনি রাগ করবেননা বাবু। আপনি যদি রাগ করে চলে যান বাবু, তাহলে আমার ছেলেটার এক ফোঁটা অষুধ, একটু পথ্য জুটবে না।

রাগ করবো কি, আমার দুচোখ বেয়ে আমার অজ্ঞাতসারে কখন যে জল ঝরছে জানতেও পারিনি। মানবতার এমন অপমান চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলাম। হায়রে, দুটো টাকা দিয়ে আমি ওর অবোধ, অসহায়, রুগ্ন দেহটাকে কিনতে চেয়েছিলাম!

পকেট হাতড়ে দশটা টাকা বের করে ওর বিছানার উপর রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। জানি আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে বোকা বলবে। আনাড়ি ভাববে। কিন্তু আমি যেন চিরকাল এমনি বোকা, এমনি আনাড়িই থাকি। টাকা দিয়ে যেন ভালবাসা কেনার দুর্বুদ্ধি আমার না হয়।

কিন্তু তখনও আমার আরো কিছু দেখবার বাকী ছিলো। দরজার ছিটকিনিটা খুলে চৌকাঠ পেরুবার জন্য পা বাড়াতেই পেছন থেকে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো মেয়েটি, একী! আপনি দশটা টাকা রেখে গেলেন কেন? আপনি যদি নাই 'বসবেন' ওটাকা আমি চাইনে। দেহব্যবসায়িনী আমরা, যা রোজগার করি দেহের বিনিময়েই করি। ভিক্ষে করিনে। ও ভিক্ষে দিয়ে আমাকে অপমান করতে হবেনা আপনাকে!

পিছনে ফিরলাম। একি এক মুহূর্ত আগের সেই ভেঙেপড়া মেয়েটা এমন দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়ালো কী করে। ঐ আলুলায়িত কেশ, ঐ জ্বলন্ত চক্ষু।

সত্যই তো। ঐ চির অবমানিতাকে এমন করে অপমান করার কোন অধিকার আছে আমার! এই কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দেবার এক্তিয়ারই বা কে দিলো আমাকে?

ছিটকানী খুলতে যাওয়া উদ্যত হাতখানা নামিয়ে নিলাম। তারপর ফিরে এসে তার হাতদুটি ধরে বললাম, কিন্তু বোন, আমি তোমার দাদা হিসেবে এই টাকাটা তোমাকে দিচ্ছি। দয়া নয়। বেশতো, তুমি যেদিন পারবে না হয় ফেরৎ দিও। মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে যে এর আগে খুব এসেচে তা মনে হয় না।

বললাম, ভাল কথা, যদি কিছু মনে না কর তো বলি, যদি কোন দিন টাকার দরকার হয়, কোন সঙ্কোচ না করে, আমার খোঁজ করো। তোমাদের সামনের ঐ পার্কেই মাঝে মাঝে আমি বিকেলে আসি। যেও, কোন লজ্জা করোনা। ধনী আমি নই, তবে দু' দশ টাকা তোমার দরকারে আমি সাহায্য করতে পারবো।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কী খুব নাটকীয় মনে হচ্ছে তো আপনার? কিন্তু যা সত্য তাই বললাম। এটা ঠিক, আবেগের মুখেই এসব বলেছিলাম আমি। এবং মেয়েটা সত্যসত্যই প্রতিমাসে হাত পাততে এলে আমি কতদিন এ উদারতা দেখাতে পারতাম, এ বিষয়ে এখন আমার সন্দেহ হয়। কিন্তু তখন এ আশ্বাস তাকে আমি দিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর কি আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?

—না।

—মেয়েটা কি টাকা চাইতে এসেছিলো।

—না।

—সেই দশটা টাকা! টাকা দশটা কি সে আপনাকে ফেরৎ দিয়েছিলো?

—না।

—তবে?

—তবে কী? মেয়েটা ছলনাময়ী এই তো! যেমন অধিকাংশরাই হয়ে থাকে? না, মেয়েটার টাকা ফেরৎ দেবার মতো সম্ভবতঃ সামর্থ ই আর ফিরে আসেনি। বছর দুই আগে, শতচ্ছিন্ন বসনে ওকে ঠনঠনের কাছে

ভিক্ষে করতে দেখেছি। আর ওর সেই ছেলেটি ওর সঙ্গে নেই। কে জানে আমিই ওকে ব্যবসা-ছাড়া করেছিলাম কিনা! কিন্তু এখনও আমি কান পাতলে ওর ছেলের সেই আর্তস্বর শুনতে পাই, আমি ঘুমুই নি মা। আমি ঘুমুই নি! আমার কোন দোষ নেই মা। আমায় তুমি মেরোনা মা। আমায় তুমি মেরোনা।

পুজোয় আসামে বায়না পেলো চৌধুরীদের দল। দলের পরিচালক (না, ডিরেক্টর বলে না তাকে) অশোক মিত্তির বায়না ধরতে ভাদ্রমাসেই চলে গিয়েছিলো। আসাম লাইনে এক্সপার্ট। কলিয়ারী লাইনে যেমন জগা সা। ছুটকোছাটকী………। কী করে বায়না বাগাতে হয়, শিখে এসো মিত্তিরের কাছে। ধরা বাঁধা যেখানে অন্যদলের গাওনা, অশোক মিত্তির সেখানে স্ুঁচ হয়ে ঢুকবে। তারপর ফাল হয়ে বেরুনো, না-বেরুনো তার ইচ্ছে। গোটা পুজোয় আসাম সার্কেল বাঁধা। তবে বাদ যে যায়না তা নয়। 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের সময় বাদ পড়েছিলো। সেবার পর পর দুবছর বন্যার জন্যে বাদ পড়েছিলো। তবে সরকার থেকে উঁচু করে বাঁধ দেবার কথাবার্তা চলেছে। যদি কাজ হয় তাহলে হয়তো দুর্ভোগ কমবে।

মহালয়ার দিন ট্রাঙ্ককলে খবর দিয়েছে মিত্তির মশাই। ষষ্ঠীপুজার দিন জয়েন দিতে হবে তিনসুকিয়া, বড়পেটায় তারপর। বড়পেটা ব্যবসায়ীদের জায়গা। সেখানে তিন রাত্তির। সেখান থেকে ধুবরী। ধুবরী থেকে গৌহাটি হয়ে শিলং। সেখান থেকে টিকিয়াজুলি। টিকিয়াজুলি থেকে মঙ্গলদই এক স্কুলের জন্যে তিন রাত্তির গাওনা। মঙ্গল দই থেকে তেজপুর। তারপর রাঙাপাড়া। হরবর গাঁও। সবশেষে জুরিয়া বাজার। না, জোগাড়ে আছে বটে অশোক মিত্তির। সাধে কি আর মালিক মশাই এত খাতির করেন। নিজের পানের ডিবে থেকে গন্ধওয়ালা পান খাওয়ান। কৈ দ্বিজু চৌধুরীদের তো খাওয়ায় না। ষষ্ঠীপুজার চারপাঁচ দিন আগে ম্যানেজারবাবু এত্তেলা পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভান্সও দিলেন। রাহা খরচও দিলেন।

আগের বছরের মতো সব টাকা আঙ্গুরবালার হাতে দিলোনা দ্বিজু

চৌধুরী। আসাম রওনা হওয়ার আগের দিন কুসুমকে নিয়ে বিলিতি সিনেমা দেখলো। একটা বিলিতি দোকানের কেবিনে বসে খেলো। চপ, কাটলেট, ফ্রাই এই সব। আঙ্গুরের কথা যে দু'একবার মনে না পড়েছিলো তা নয়। আঙ্গুর এসব খেতে ভালোবাসে। কিন্তু মুখে বলতো না। বিয়ের প্রথম প্রথম দু চারদিন খেয়েছে দ্বিজু চৌধুরী। আঙ্গুর আপত্তি করতো। কী হবে মিছি মিছি পয়সা নষ্ট করে এইসব বলতো।

জেদ করলে খেতো। আগ্রহ মিশ্রিত লোভ নিয়েই খেতো। ফড়িয়া-পুকুর থেকে ঢাকাই বাখরখানি নিয়ে বাসায় গেলে মনে মনে খুশী হতো আঙ্গুরবালা। মুখে অনুযোগ জানালেও মনে মনে খুশী হতো।

কুসুমের ওসব বালাই নেই। গোগ্রাসে গিলতে তার কোন সঙ্কোচ নেই। ব্যাটাছেলের মতো হা করে খেতে দেখলে কেমন গা ঘিন ঘিন করে দ্বিজু চৌধুরীর। অন্য দিকে চোখ ফেরায় দ্বিজু চৌধুরী। না, দৈহিক সম্পদে আঙ্গুরবালা কুসুমের কাছে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই কুসুমের জন্য পয়সা খসাতে আপত্তি লাগেনা চৌধুরীর। প্রতিশোধের মন নিয়েই আরো খরচ করে।

তারপর অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরে। ফিরবার আগে কুসুমের বাসা হয়েই ফিরে।

আঙ্গুরবালা জেগেই বসেছিলো। দ্বিজু চৌধুরী হাতমুখ না ধুয়েই বিছানায় বসে।

ভাত বাড়তে বাড়তে আঙ্গুরবালা বলে, খেতে বসো।

---আমি খাবোনা।

—কেন ?

—খেয়ে এসেচি।

—কোথায় ?

—তা দিয়ে তোমার দরকার কী !

না, তা দিয়ে আঙ্গুরবালার দরকার কী। আঙ্গুরবালা বাড়া ভাত হাড়িতে ঢেলে তাতে জল ঢেলে দিলো। তারপর এক গেলাস জল ঢকঢক করে খেয়ে মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল।

দ্বিজু চৌধুরী জানতেও চাইলো না, আঙ্গুরবালা খেয়েছে কিনা! জানতেও চাইলোনা এত রাতে ঢকঢক করে জল খেয়ে শুলো কেন আঙ্গুরবালা। না জানার জন্যেই যেন পাশ ফিরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল দ্বিজু চৌধুরী।

কিন্তু আঙ্গুরবালা জানে। কুসুমের উপর বসা মধুকরের সংবাদ আঙ্গুরবালার অজ্ঞাত নয়। জানাবার লোকের অভাব হয় নাকি? ভাগ্নেবাবুই জানিয়েছে। কাউকে অবৈধ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হলে নবাগত নায়ক দুটো উপায় বেছে নেয়। নায়িকা যদি বিবাহিতা হয় তবে তার স্বামীর কোন কেচ্ছা তার কানে তুলে দেয়। আর কোন্ কোন্ মহাপুরুষ, দেবতা অবৈধ প্রেম করেছে তার রসালো কাহিনী শোনায়। জানায় শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মামী ছিলো। অহল্যা ইন্দ্রের গুরুপত্নী ছিলেন। চন্দ্রের অনুরাগিনী তারা দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী।

রসিক যারা তারা গানের সুরে বলে,

'সুবাদে বাধে কি লো সই
যারে দেখে মজেলো মন,
তুলনা কি দিব অন্যে
হরে ব্রহ্মা নিজ কন্যে
ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে সহস্রলোচন।'

এক কথায় পৃথিবীর কে কোথায় অবৈধ কাজ করে পার পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে, তার কাহিনী শোনাবে।

শোনাবে, জানো স্বয়ং ইন্দ্র আপন কন্যা জয়ন্তীকে পাঠিয়েছিলো শুক্রাচার্যের ধ্যান ভাঙার জন্য। হ্যাঁ, দেবযানীকে পায় তার থেকেই ঋষি শুক্রাচার্য। যার সঙ্গে পরবর্তী কালে রাজা যযাতির বিয়ে হয়েছিলো।

বলবে স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার অবৈধ অনুরাগের কথা। আরও অনেক অনেক কাহিনী।

মজার কথা হচ্ছে ঐ সব শিকারী পুরুষেরা বিবাহিত হলে, ভুলেও তাদের স্ত্রীদের কাছে কিন্তু এসব কাহিনী বলবেনা। তখন সেখানে সীতা সাবিত্রী ছাড়া অন্য কাহিনীর প্রবেশ নিষেধ। তার চেয়ে বরং কোন্ স্ত্রী পঙ্গু স্বামীকে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে কোন্ বারবণিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলো সে সব কথা পাঁচকাহন করে বলবে।

ভাগ্নেবাবুও বলতো। সুযোগ পেলেই আঙ্গুরবালার কাছে দ্বিজু চৌধুরী কুসুম কাহিনী বলতো। রইয়ে সইয়ে বলতো। কারণ বিয়ের আগের আঙ্গুরবালা বিয়ের পরের আঙ্গুরবালা ঠিক একবস্তু নয়। এ ভাঙবে কিন্তু সহজে মচকাবে না। এ প্রমাণ ভাগ্নেবাবু একাধিকবার লক্ষ্য করেছে। চোরাবালির ঠিক পাশে দাঁড়িয়েও আশ্চর্য নিপুণতায় আঙ্গুরবালা নিজকে সামলে নিয়েছে।

তবু স্বামীর কেচ্ছা ক'জন স্ত্রী শুনতে অনিচ্ছুক হয়। ক'জন নিষিদ্ধ কথা শুনতে কানে আঙ্গুল দেয়!

ভাগ্নেবাবু বলতো, কুসুমের মধ্যে আছে কি? ঐ তো হোতকা চেহারা। আঙ্গুরবালার পায়ের নখের যোগ্য নয় তা হলফ্ করে বলা যায়। আর সেই ভাদুরে কুত্তীর মতো মেয়েটাকে লটকে কিনা চৌধুরীটা উড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্যও যোগ করতো ভাগ্নেবাবু। আর উড়বে না তো কি? যার যেমন রুচি। নর্দমার লোকের রুচি কি আর স্বর্গের অপ্সরার দিকে যাবে? শুধু কি তাই! ভাগ্নেবাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করে যে ফূর্তি করে এটাই বা দলের কেনা জানে!

আঙ্গুরবালা হয়তো বলতো, ভাগ্নেবাবু কেন টাকা ধার দেয় চৌধুরীকে! ভাগ্নেবাবু সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল চোখে আঙ্গুরবালার দিকে তাকিয়ে বলতো, চৌধুরীকে যে টাকা ধার দেয়, সেতো আঙ্গুরবালার মুখ চেয়েই। আঙ্গুরবালার স্বামীকে কি টাকা না দিয়ে পারে ভাগ্নেবাবু! আরও বলতো, আঙ্গুরবালা যাই মনে করুক, এমন একটা সুলক্ষণা মেয়ে ভাগ্নেবাবুর জীবনে এলে, ভাগ্নেবাবুর জীবনটা কি আর এমন ছন্নছাড়া হয়ে উঠতো!

উঠতো না।

নিজের চোখেই তো দেখছে ভাগ্নেবাবু। শোনা কথা তো নয়! কী দিয়ে কী করছে আঙ্গুরবালা। নিজে না খেয়ে ভাতের থালা ধরছে ঐ পাষণ্ডটার সামনে। পাষণ্ড নয় তো কী!

আঙ্গুরবালা যদি ভুল করে এমন একটা লোফারকে বিয়ে না করতো, তাহলে কি আর এমন কষ্ট করে হাড়ি ঠেলতে হয় তাকে। একটা রাঁধুনি কি আর রেখে দিতে পারতোনা আঙ্গুরবালাকে!

আঙ্গুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দুর্বল কণ্ঠে বাধা দিতো।

বলতো, ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি বলুন তো! যার যেমন অদৃষ্ট তা নিয়েই মেয়েদের সুখী থাকতে হয়। সেই বিয়েকেই মেনে নিতে হয়। ওসব কথা আমার শুনতে নেই।

ভাগ্নেবাবু বলতো, যাত্রার দলের বিয়ে আবার বিয়ে। তুমি তো সেদিনের। আমরা চোখের উপর কত দেখেছি। তখন নায়ক ছিলো রঞ্জনবাবু। নোয়াখালির রঞ্জন চক্কোত্তি। ডাকসাইটে অ্যাক্টর। কী গভীর গলা, কী দরাজ কণ্ঠ। চেহারায় একটু খাটো। কিন্তু অন্য গুণে মানিয়ে যেতো। আটশ' টাকা বাঁধা মাইনে। ঘরে মাগ ছেলে মেয়ে। কিন্তু থাকলে কি হয়। মন বাঁধা ছিলো পূর্ণিমা দত্তের সঙ্গে। দলের হিরোইন। জাহাবাজ সুন্দরী। সবাই বলতো এ যুগের তারাসুন্দরী। রঞ্জন চক্কোত্তি ঘর সংসার ভুলেছিলো। ঘরের সুন্দরী স্ত্রী ছেলে মেয়ে ভুলেছিলো। কেউ কেউ বলে রঞ্জন চক্কোত্তি গোপনে কালীঘাট যেয়ে পূর্ণিমা দত্তকে বিয়েও করেছিলো।

হঠাৎ অসুখ হলো রঞ্জন চক্কোত্তির। উপায়? উপায় আর কি, নিরঞ্জন অপেরার নায়ক সন্তোষ সাঁপুইকে ভাঙিয়ে আনা হলো মোটা টাকা দিয়ে। ভাঙিয়ে এনে দিলাম আমিই। সেজন্যেই তো মালিকের কাছে এত খাতির আমার। আদর আব্দার সব রাখে।

রাণীগঞ্জে গাওনা করতে গেলো দল। সন্তোষ সাঁপুই গেলো। রঞ্জন চক্কোত্তিও গেলো। শরীর সারেনি। পূর্ণিমা দত্তের টানেই গেলো। মালিকও আপত্তি করলো না।

কিন্তু না গেলেই ভাল করতো রঞ্জন চক্কোত্তি। না গেলে চোখের উপর ওসব দেখতে হতো না। দেখতে হতো না গাওনার ফাঁকে ফাঁকে সন্তোষ সাঁপুই পূর্ণিমা দত্তের ঘনিষ্টতা। দেখেই অধিকার হারাবার ভয়ে মেজাজ খারাপ করে বসলো।

কিন্তু কে কার ধার ধারে যাত্রার দলে। যেটুকু আগঢাক ছিলো সেটুকু খোলস্ খুলে ফেললো দুজনে। হ্যাঁ, সোজা পথ দেখিয়ে দিলো রঞ্জন চক্কোত্তিকে।

তারপর যে ক'বছর এদলে ছিলো সাঁপুই, পূর্ণিমা দত্তকে নিয়েই ছিলো। এখনতো পূর্ণিমা দত্ত স্টার। সিনেমায় নামছে। নামতে সাহায্য করেছে সন্তোষ সাঁপুইই।

শুধু কি পূর্ণিমা দত্ত! যাত্রার দলে আকছারই এরকম হয়। অতশত দেখলে কী আর যাত্রার দলে চলে? না অতশত দেখলে জীবনে উন্নতি করা যায়!

আঙ্গুরবালাকে এসব কথা ভাবিয়ে তুলতো। অবসর মুহূর্তে একা একা ভাবতো। দ্বিজু চৌধুরীর সঙ্গে ভাগ্নেবাবুর তুলনা করে ভাবতো। দ্বিজু চৌধুরীর মতিগতি, সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য আরও ভাবিয়ে তুলতো আঙ্গুরবালাকে। বিশেষ করে ভাগ্নেবাবু যে বলতো, আঙ্গুরের মতো একজন শিল্পী এমন ভাবে হাড়ি ঠেঙ্গিয়ে জীবন কাটাবে এটা ভাবতেও তাঁর খারাপ লাগে। যে সুযোগ আঙ্গুরবালাকে দিয়েছিলো ভাগ্নেবাবু, আর মাত্র দুটো বছর লেগে থাকলেই একেবারে হিরোইন্। ভাবতেও কেমন গা শিরশির করে। হিরোইন্! বাঁধা মাইনে। বাঁধা সম্মান।

কেন ব্যালে গার্ল থেকে কি হিরোইন হয় না?

ভাগ্নেবাবুইতো বলতো, কেন, পূর্ণিমা দত্ত কী ছিলো আগে? নান্নার পেট্রিয়টিক ড্রামাটিক পার্টির সখীর দলে নাচতো না? নাচতো না অনুকূল চৌধুরীর বাগান বাড়ীর সখের দলে! এই তো সেদিনের ব্যাপার। বড় পাড়ার প্রাণবল্লভ বাবুই তো এ-দলে নিয়ে এলেন। দুবার দল পাল্টে আজ পূর্ণিমা দত্ত হিরোইন্। নগদ কড়কড়ে বাঁধা মাইনে ছ'শ টাকা। রিহার্শেলের সময় পর্যন্ত গাড়ী ভাড়া, জলখাবার। বোনাস্ আরও কত কী!

ভাগ্নেবাবু বলতো, এ লাইন কি আর আগের মত আছে নাকি? আগে সাধ আহ্লাদ ছিলো, টাকা ছিলোনা। এখন ব্যবসাবুদ্ধি বেশী এসেচে, টাকাও এসেচে।

এখন সখ করতে চাইলে অ্যামেচার পার্টি কর। কিন্তু তাতেও মেয়ে মানুষ চাইলে পয়সা গুণতে হয়। তাও আছে। অ্যামেচারেও আদর আপ্যায়ন কম নয় তবে নিরাপত্তার অভাব আছে কোন কোন সময়। সখের

দলের সখ। কোন কোন দলের সখের তো সীমা-পরিসীমা নেই। মুস্কিল হয় সেখানে। জগৎসিংহ ওসমানের মুখোমুখি হতে কতক্ষণ!

তবে যাত্রার দলের কাছে কিছুই নয়। প্রাইভেট নার্সের অদৃষ্টের মতো। ডাক পড়তে থাকলোতো দু'পয়সা কামাও। নইলে বসে বসে হাড়ে গিঁঠে খিল লাগিয়ে বসে থাকো।

যাত্রার দলের হালচালও আজকাল আলাদা। একদল পছন্দ না হয়, মুখের কথা ফেলার অপেক্ষা। তোমার যদি দাম থাকে, দেখবে অন্যদল ওৎ পেতে বসে আছে। একটু নাম হলেই একদল থেকে আর একদলে ভাঙিয়ে নেবার জন্য প্রতিযোগিতা সুরু হয়। দালাল, মালিকের নিয়োজিত অন্যলোক ঘুরঘুর করে। প্রতি বছরই একবার করে এই ভাঙাগড়ার পালা চলে। একাধিক বারও। অবশ্য চুক্তি, চুক্তিখেলাপ এর প্রতিবন্ধক না হলেই হলো।

—কী মশাই, কত দিচ্ছে এখানে?

অ্যাক্টর মশাই, এ-দলে সত্য সত্যই যা পায় তার থেকে বিশ পঞ্চাশ একশ' বাড়িয়েই বলে। সর্বত্র না হলেও, তাই সাধারণ রেওয়াজ।

অপরপক্ষ টোপ ফেলবে, আসবেন আমাদের দলে? ওখানে যা পান, তার থেকে অনেক বেশী দেবে আমাদের দল। অনেক বেশী সুবিধে।

এ সুবিধে সবাই পায় তা নয়। যারা পায়, তারাও যে সব সময় দল পাল্টিয়ে সুখ পায়, সুবিধে পায় তাও নয়। অনেকে নিজের দাম বাড়িয়ে বা যাচাই করে নিজের দলের কাছ থেকে মোচড় দিয়ে বেশী আদায় করার চেষ্টা করেন।

তবে ভাল অ্যাক্ট্রেস নিয়ে, নিদেন পক্ষে মাঝারি দরের কোন মেয়ে নিয়ে যে দলে আসে তার খাতির অনেক বেশী। একজন গেলে দুজন হারাবার ভয়। দুজন গেলে, জুটি গেলে, দলের ক্ষতি হয়। কাজেই একের জন্য দুয়ের তোয়াজ। শোভা অপেরার কাতুবসাক তো কেবল তার মেয়ে মানুষের জোরেই চারশ' টাকা মাইনে করে খাচ্ছে। নইলে একশ' টাকায় কেউ দৌবারিকের পার্টও দিতো না। অথচ প্রতি বইয়েই কেমন সেনাপতি, মন্ত্রীর পার্ট বাঁধা। খল নায়কের পার্টও করে মাঝে মাঝে।

যাত্রার দলের কতই না কেচ্ছা কাহিনী বলেছে ভাগ্নেবাবু। কত রঙীন ছবিই না এঁকে ছাখিয়েছে। সবই ছাখিয়েছে, শুধু দেখায়নি নিচে নামার সিঁড়ি। অধঃপাতের সিঁড়ি।

যাবার দিন সকাল বেলা সেই যে চল্লিশটি টাকা ছুঁড়ে দিয়ে গাওনা গাইতে চলে গিয়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী একমাসের মধ্যে আর কোন চিঠি পত্র নেই। টাকা পয়সা নেই।

এমনি সময় অসুস্থ হয়ে পড়লো আঙ্গুরবালা। জ্বর। আর অসুস্থতারই বা দোষ কী। এই এক মাস তো শুধু মনের দুটানার দ্বন্দ্বে ভুগেছে আঙ্গুরবালা।

প্রথম প্রথম বাড়ীওয়ালী যত্ন আত্তি করতো। পাশের ঘরের দিদি এসে সুখ দুঃখের কথা কইতো। ছেলেকে দিয়ে এটা সেটা আনিয়ে দিতো। কিন্তু ক্রমশই যেন তারা কী সব ভেবে বসে আছে। ঘরে থেকেও তাদের ফিসফিসানি শুনতে পায় আঙ্গুরবালা। কিন্তু তাকে দেখলেই সব চুপচাপ। চোখে চোখে আকার ইঙ্গিত। সব মুখে তালাচাবি।

বাড়ীওয়ালীর ব্যবহারেও তারই ছোঁয়াচ। টাকাটা সিকেটা আগে ধার দিতো বাড়ীওয়ালী কিন্তু ইদানীং দ্বিজু চৌধুরী আঙ্গুরবালার ব্যাভার যেন তাঁরও চোখে কেমন কেমন।

এই নির্বান্ধব পুরীতে এখন কী করবে আঙ্গুরবালা! পথ্য আনবে, ডাক্তার ডাকবে, পয়সা কোথায় তার? আর এনেই বা দেবে কে?

তবু লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে একে তাকে ডাকাডাকি করেছে। কেউ এক আধবার সাড়া দিয়েছে। কেউ শুনিনি শুনিনি করে পাশ কাটিয়েছে।

এরপর দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকা ছাড়া আর কী করতে পারতো আঙ্গুরবালা। ভিক্ষে করতে বেরুবে? গায়ে জ্বর না থাকলে তাই না হয় চেষ্টা করে দেখতো, না হয়, কারো বাড়ী ঝি গিরি করে খেতো।

কিন্তু এখন! এখন এই মুহূর্তে এই বাড়ীর ভাড়াটে হিসেবে কি সে রাস্তায় গড়াতে গড়াতে যেয়ে ভিক্ষে করতে পারে! থু থু দেবেনা সবাই! মিউজিক ডিরেক্টরের বউ না আঙ্গুরবালা!

ঠিক এমনি দিনে এলো ভাগ্নেবাবু। দলের সঙ্গে সেও আসাম গিয়েছিলো।

দল যখন আপার আসামে গাওনা নিয়ে রওনা হয়েছিলো এমন সময় দাদুর চিঠি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নাকি তার হাতে পৌঁছয়। দাদুর শরীর ভাল নয়। ম্যানেজার বাবু সব শুনে ছুটি দিয়েছেন।

দ্বিজু চৌধুরী মদের ঝোঁকে কিনা কে জানে, বলেছে, চললো শালা ছিরি রাধার জন্যে। যাও শালা, আমি চন্দরাবলীর কুঞ্জে বেশ আরামেই আছি বাবা।

ভাগ্নেবাবু সেকথার জবাব দিয়ে বলেছিলো, শালা, ভাত দেবার কেউ নয়, কীল মারার গোঁসাই।

ভাগ্নেবাবু যখন আঙ্গুরবালাদের বাসায় এসেছিলো, তখন আঙ্গুরবালা জ্বরে প্রায় আধা বেহুঁস। গায়ের কাপড় চোপড় বিস্রস্ত।

ভাগ্নেবাবু এগিয়ে এসে কপালে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলো, ইস্ গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

আধ সচেতন আঙ্গুরবালা আকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিলো, তুমি এসেচো' আঃ বাঁচলাম। তারপর যেন পরম নিশ্চিন্ততায় চোখ বুজেছিলো।

ভাগ্নেবাবু উল্লসিত কণ্ঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলো, হ্যাঁ, আঙ্গুর, আমি এসেচি। আর কোন ভয় নেই।

সহসা ঘোলাটে চোখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আঙ্গুরবালা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, একি আপনি? আপনি কখন এলেন?

মাথায় রাখা হাতখানা সহসা থেমে গিয়েছিলো ভাগ্নেবাবুর! ও, তাহলে তাকে নয়, দ্বিজু চৌধুরীকে ভেবেছে আঙ্গুরবালা। আর 'দ্বিজু চৌধুরী নয় বলেই, অক্ষম হাতে গায়ের কাপড় সামলাবার জন্যে এত ব্যাকুল চেষ্টা।

তাজ্জব এই মেয়ে মানুষের মনস্তত্ব মাইরী। হুমড়ি খেয়ে জ্বরে ধুকছিস্। অবস্থা দেখে যা মনে হয়, পেটে অষুধ পথ্যি পড়েছে কিনা কে জানে! আর সে ব্যাটাতো নতুন মেয়েমানুষ লটকে বেশ উড়ে বেড়াচ্ছে। তবু সতীপনা ছাখো মাইরী। তবু যদি যাত্রার দলের মেয়েমানুষ না হতিস্! তবু যদি সোয়ামী ভালবাসতো! ভালবাসার প্রতিদান দিতো!

মুখে বলেছিলো, হ্যাঁ আমি। দ্বিজু নই। আচ্ছা আমি চললাম। আঙ্গুরবালা ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথার জবাব

দিলোনা। কোন কথা জানার, কোন কিছু বলার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। তারপর কী হয়েছিলো মনে নেই।

না ভাগ্নেবাবু বাসায় যায়নি। পথ থেকে ফিরে এসেছিলো। ডাক্তার নিয়ে পথ্য নিয়ে ফিরে এসেছিলো।

অন্য ভাড়াটে বউরা উঁকি মেরে দেখেছিলো। বাঁকা হাসি হেসে ফিস-ফিসিয়ে নিজেরা নিজেরা কী বলেছিল।

পরদিনও এখানে ছিলো ভাগ্নেবাবু। তার পর দিনও। ক্রমান্বয়ে সাতদিন।

এই সাতদিন আঙ্গুরবালার কেমন কেটেছে আঙ্গুরবালাই জানে।

এই সাতদিন ভাগ্নেবাবু আঙ্গুরবালাকে অষুধ খাইয়েছে। মাথা ধুইয়েছে। মাথা ভরতি চুল যত্ন করে মুছিয়ে দিয়েছে। গা মুছিয়ে দিয়েছে। দরকার হলে কাপড়জামা পাল্টে দিয়েছে। থার্মোমিটার লাগিয়েছে।

মাঝে মাঝে হুঁস হয়েছে আঙ্গুরবালার। তার মধ্যে কোন কোন সময় লক্ষ্যও করেছে। সব বুঝেছে কিন্তু বুক গায়ের কাপড় সামলাবার জন্যে আগের মতো ব্যস্ততা দেখা যায়নি। হাত ওঠেনি।

মাঝে মাঝে বদলানো শাড়ীর দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেচে। কিন্তু এ শিহরণে আগের মতো গ্লানি অনুভব করেনি।

এর পরের কাহিনী যেমন দ্রুত, তেমনি নাটকীয়। কিন্তু জীবনটা নাটক না হলেও, নাটকীয় ঘটনা জীবনেই ঘটে। অন্তত, আমি যেটুকু শুনেছিলাম দ্বিজু চৌধুরী কাছে থেকে।

এমনি করে একদিন আঙ্গুরবালার জ্বর ছেড়ে গিয়েছিলো।. থার্মোমিটারটা লাগিয়ে জ্বর দেখতে দেখতে গায়ের তাপ দেখার জন্য গলার নীচে হাত দিয়েছিলো ভাগ্নেবাবু।

হঠাৎ সেই হাত দুটো বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো সমস্ত আবেগ ঢেলে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলো আঙ্গুরবালা, বল, বল আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবেনা তুমি!

নিচু হয়ে মাথাটা আলতো ভাবে একটু তুলে আঙ্গুরবালার রোগ শীর্ণ ঠোঁট দুটিতে নিজের তৃষিত ঠোঁট লেপ্টে বলেছিলো ভাগ্নেবাবু, না, না

তোমাকে ছেড়ে যাবো না। ভাল হয়ে উঠেছো, এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিলো দ্বিজু চৌধুরী। মাতাল কণ্ঠে বলেছিলো, বাহবা বাওয়া, একেবারে শিরি বিন্দাবন মাইরী। জয়বাবা কেষ্ট ঠাকুর, এবার মা কালী হয়ে কলঙ্ক ভঞ্জন কর বাবা। আমি ব্যাটা আয়ান ঘোষ, দেখে নয়ন যুগল কিতার্থ করি।

চমকে উঠেছিলো দুজনে। ভাগ্নেবাবু প্রতিবাদ করে বলেছিলো, কী বলছো চৌধুরী। দেখছোনা মেয়েটা অসুস্থ।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, তা বাবা তুমি ডাক্তার হয়ে চিকিৎসে করছো বুঝি বাবা। বলে ভাগ্নেবাবু বাধা দেবার আগেই আঙ্গুরবালাকে হাত ধরে তুলে, লাথি মারতে মারতে বলেছিলো, শালা বেবুশ্যেমাগী। ঐ নাগর নিয়ে চলে যা। ফিরে এসে যেন আর তোকে না দেখি।

না, অনেক রাত্রে ফিরে এসে আঙ্গুরবালাকে আর দেখেনি দ্বিজু চৌধুরী। শুধু দরজার কাছে যেখানটায় আঙ্গুরবালা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, সেখানে এক চাপ রক্তের মতো কী যেন কালোপানা হয়ে মেঝের সঙ্গে মিশে ছিলো।

বাড়ীওয়ালা বাড়ীওয়ালী ঝাঁঝিয়ে বলেছিলো, একজন তো বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছে, তুমিও বাপু কেটে পড়। এমন ভাড়াটে আমি রাখবো না। ভাড়া মিটিয়ে, ঘরে যা আছে নিয়ে বেরিয়ে পড়। এক ঘরের জন্য সাতঘর ভাড়াটে খারাপ করতে পারবো না।

অন্য ভাড়াটেরা এই মারে তো সেই মারে ভাব।

চোরের মতো বেরিয়ে পড়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী। মারের ভয়ে মদের নেশা তখন শিকেয় উঠেছে।

পথে পাড়ার মস্তানরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলো, কীবে শালা মানকে। বলেছিলাম না, যাত্রার দলের দ্রব্যি, উড়ু খৈ। তা শালা আমার মতো গোবিন্দের পাতে তো দিলিনে? এখন শালা দেখলি, কেমন বিনে পয়সার বিন্দেবন লীলে।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, তাজ্জব ছাখো ভায়া, আঙ্গুরবালার তখন কী

করার ছিলো ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া। তার দোষ দেখলাম সেদিন; আর আমি শালা যে কুসুমকে নিয়ে লটকে বেড়াচ্ছিলাম, তার সাজা দেয় কে? কিন্তু দেখো, সে সাজা তোলা আছে আমার। এই যে পা ধুয়ে ঘরে ঢুকি আমরা পুরুষরা, আর মেয়েদের বেলায় পান থেকে চুণ খসলেই ঘাড় ধরে বাড়ির বের করি, এ সবই জমা থাকে ঐ জমাদারের কাছে। সুদে আসলে তা তোলে রোজকিয়ামতের দিনে। দেখো আমার বেলায়ও তুলবে। আর সেদিন দুনিয়ার কেউ আমার জন্যে চোখের জল ফেলবে না, ফেলবে ঐ আঙ্গুরবালাই।

ডাক্তারবাবু বিলেত যাবেন জানতাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবেন এটা ভাবিনি।

দিন কয়েক পর হঠাৎ একদিন যেয়ে কড়া নাড়লাম। বেরিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু নয়, ডাক্তারবাবুর চাকর, ভগবান। বলিহারি নাম?

বললো, বাবু তো রওনা হয়ে গেছেন কত্তা। তবে আপনার জন্য একটা প্যাকেট রেখে গেছেন। বলেছিলেন, আপনি এলে যেন দেই।

ও হরি, প্যাকেট আবার কিসের!

এলে দেখলাম, একটা বন্ধ অফিস খাম। বেশ মোটা সোটা চেহারা।

ভাবলাম কী হতে পারে এতে। যাই হোক, বাসায় নিয়ে একে খুলবো। ভগবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

কালিদাস লক্ষহীরার কাহিনী পেলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। অম্বাপালীর কথা শুনেছিলাম সুবর্ণের কাছে।

ডাক্তারবাবুর লেফাফায় চিঠির সঙ্গে সেই কাহিনী। ডাক্তারবাবু লিখেছেন, আপনি আসবেন আশা করে কালিদাসের কাহিনীটা আমার বন্ধু ডঃ সুধাংশু শেখর বসুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। ভদ্রলোক বারাসতের দিকে থাকেন। শুনলাম আপনাকেও চেনেন। খুব বই পড়েন। সাপ সম্পর্কে ওঁর খুব ভাল ধারণা। এ নিয়ে লিখলেও ওঁর সাহায্য পাবেন। যাই হোক······এলেন না বলে, লিখে রেখে গেলাম। আমি তো আপনার মতো রেডিওতে 'গানা' দেই না, সুতরাং কাঠ খোট্টাই হবে। কেমন লাগলো

জানাবেন। ভাল কথা, একটু বেশী বকিতো, কাজেই প্রথমে একটু ভূমিকা করে নেবো। একটু অপ্রাসঙ্গিকও।

শকারি বিক্রমাদিত্যের কথা কেনা জানে। কিন্তু শকারি হয়েছিলেন পরে। আগে যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, লোকে বলে তার মধ্যে ছলনাই ছিলো বেশী। আর সম্রাট অশোকের মতো প্রথম জীবনে তেমন ভালো মানুষ ছিলেন না ভদ্রলোক।

উদাহরণ, নিজের বড় ভাই রাম গুপ্তের সুন্দরী পত্নী ধ্রুবদেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা রাম গুপ্ত জীবিত থাকতেই বেশী সুবিধের ছিলোনা।

শোনা যায়, রাম গুপ্তকে হত্যা করে তিনি ধ্রুবদেবীকে অঙ্কশায়িনী করেছিলেন। তখন তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। বড় ভাইকে খুন করে বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। পরে অবশ্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন ভদ্রলোক।

কিন্তু হলে কি হবে, স্বভাব চরিত্তির তখনও ভাল নয়। রক্ষিতা রাখলেন পরমা সুন্দরী লক্ষহীরাকে। নগর থেকে দূরে তার থাকার জায়গা করে দিলেন। লুকিয়ে চুরিয়ে যান সেখানে। খুব প্যায়ার করেন লক্ষহীরাকে।

এই রকম স্বভাব ছিলো অজাতশত্রুর বাবা বিম্বিসারের। প্রাসাদ ভর্তি মহিষী থাকা সত্বেও বিম্বিসারের লুব্ধ দৃষ্টি সারা ভারতের সুন্দরী বারবণিতা, রঙ্গনটীর পেছনে। বৈশালী নগরীর সুপ্রসিদ্ধা অম্বাপালী, উজ্জয়িনী নগরীর সভা নর্তকী পদ্মবতী বা পদ্মাবতী কোনো দিকে মহারাজ বিম্বিসারের অনাগ্রহ নেই। কাশী রাজ্যের বারবনিতা হরিণাক্ষি অর্ধকাশীকে দেখে বিম্বিসারের আহার নিদ্রা নেই। এ ছাডা নিজের রাজধানী রাজগৃহ, বর্তমান রাজগীরের বারবণিতারা তো ছিলোই। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা লাস্যময়ী বসন্তসেনা শালবর্তা। শালবতীর কথায় একটা কথা মনে পড়লো, এর পারতক্ত পুত্রই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জীবক।

যাক সেকথা, বিক্রমাদিত্যের কথায় ফিরে আসি আবার। মহাকবি কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ছিলেন, একথা আপনিও জানেন। তিনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন। বর্তমানকালে ঐতিহাসিকগণ অবশ্য সন্দেহ করেন একই সময়ে এই নবরত্ন ছিলেন কিনা,

কিন্তু মহাকবি কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ কেউ প্রকাশ করেননি।

এই কালিদাসের সঙ্গে লক্ষহীরার পরিচয় হয়েছিলো। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য নিজেই। এ নিয়ে একটা কাহিনী আছে। মহাকবি কালিদাস মাঝে মাঝে মৌন অবলম্বন করতেন। ঐ সময় তিনি নগর প্রান্তে চুপচাপ নিরালায় বসে থাকতেন। একদিন রাতের অন্ধকারে পাল্কীযোগে বিক্রমাদিত্য চলছেন অভিসারে। পথে এক বাহক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্য বাহকেরা খুঁজতে খুঁজতে কালিদাসকে ধরে নিয়ে আসে। কালিদাস কাদের হাতে পড়েছেন বুঝতে না পেরে, তাদের কথামত পাল্কী বইতে বাধ্য হন। কিন্তু অনভ্যস্ত বলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বলে উঠেন, ওহে মূঢ়, যদি তোমার কাঁধে বাধে তবে ক্ষণেক বিশ্রাম করে নাও। বিক্রমাদিত্য 'বাধতে' শব্দের বদলে 'বাধতি' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

কালিদাস আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, কাঁধে তত বাঁধছে না, যত বেধেছে ঐ 'বাধতি' শব্দে।

কালিদাসের পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান ও কণ্ঠ তিনটির সঙ্গেই বিক্রমাদিত্য পরিচিত। বুঝতে পারলেন, তাঁর বাহকেরা কাকে ভুল করে পাল্কী বইতে নিয়ে এসেছে। ততক্ষণাৎ পাল্কী থামিয়ে লজ্জিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শুধু তাই নয়, গোপন অভিসারের লজ্জায় তিনি খুবই লজ্জিত হলেন। কালিদাস নিজেও এই নিষিদ্ধ অভিসার কর্মে ওস্তাদ। সুতরাং মহারাজকে বললেন, না না, এতে আর দোষের কি। তবে দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলো আপনার এমন অরক্ষিত অবস্থায় আসা।

কিন্তু মহারাজ লোক জানাজানি করে আসতে চান না। আসল কারণ হচ্ছে তাই।

যাইহোক, এরপর ভদ্রতার খাতিরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে লক্ষহীরার বাড়ীতে না এনে পারলেন না। কালিদাস অবশ্য মুখে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন যখন আনলেনই কালিদাসকে, ভদ্রতার খাতিরে লক্ষহীরার সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিলেন।

চারি চক্ষুর মিলন ঘটল। কালিদাস দেখলেন, লক্ষহীরাই বটে। লক্ষহীরার দ্যুতি লক্ষহীরার সারা দেহে। এমন রমণীরত্ন রাজভাণ্ডারে আছে কিনা সন্দেহ।

লক্ষহীরাও কবি কালিদাসকে দেখলেন। কবির রচনা ইতোপূর্বেই তিনি শুনে থাকবেন। এবার সুপুরুষ কবিকে দেখে লক্ষহীরারও চোখের পলক পড়ে না।

কিন্তু উভয়েই বিক্রমাদিত্যের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ। সুতরাং 'কেমন আছেন, ভাল আছি,' এই ভাবেই লৌকিকতা পালন করা হলো। সেদিনের মতো এখানেই শেষ।

কিন্তু ডেরা চিনে গেলেন কবি। সুতরাং একদিন বিক্রমাদিত্যকে লুকিয়ে লক্ষহীরার কুঞ্জে এলেন কালিদাস। লক্ষহীরা অন্তরে খুসী হয়েও মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলো। তারপর দুজনে বসে রসালাপে মগ্ন হলেন। কিন্তু দুজনেই শেয়ানা। কেউ সহজে ধরা দিতে চায় না। সুতরাং সরস তীর চালাচালি চললো।

লক্ষহীরা বললেন, কী সৌভাগ্য, কবি যে! এমন ভাগ্যবতী আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি আমি।

কালিদাস পরোক্ষতার ধার ধারেন না। ধৈর্যও কম। সময়ও।

সুতরাং বলে বসলেন, হে মৃগ নয়না, তুমি তো জান না, তোমার সৌন্দর্যে কী মদনোন্মাদিনী শক্তি রয়েছে।

অর্থাৎ এরপর না এসে কি আর পারি ?

লক্ষহীরা বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে বললেন, আহা আমার মধ্যে কী আছে তা আমি কী করে জানবো বলুন। আপনি আমাকে কেমন দেখছেন, সে আপনিই বলুন! তা বলতে মহাকবির পক্ষে অসম্ভব কি ?

কালিদাস বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটি সরোবর।

লক্ষহীরা উদ্ভাসিত হাস্যে বললো, বলেন কি কবিবর। আমি একজন সামান্যা নারী, আর আপনি আমাকে দেখচেন একটি সরোবরের ন্যায়। আমার মধ্যে সরোবরের কি কি লক্ষণ দেখলেন বলুন ?

কালিদাস আবেগকম্পিত কণ্ঠে সুমধুর স্বরে বলে উঠলেন,

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং

লাবণ্যলীলা জলং

শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্র শফরং

ধম্মিল্ল শৈবালকম্।

কান্তায়াঃ চ স্তনচক্রবাকযুগলং

কন্দর্পবাণানলৈ—

দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা

রম্যং সরোনির্ম্মিতম্॥

গদ্য করিলে দাঁড়ায়, বাহুদুটি মৃণাল, বদন কমল, লাবণ্য জল, কটিদেশ (শ্রোণী) তীর্থশিলা অর্থাৎ সিড়ি, চোখ দুটি শফরী, বেণীযুক্ত কেশপাশ শৈবাল, স্তনদ্বয় চক্রবাক সদৃশ।

(ওহে, লেখক মশাই, এবার সরোবর কাহাকে বলে দেখলেন তো!)

ঐ সঙ্গে কালিদাস যোগ করিলেন, বিধাতাপুরুষ কন্দর্প বানানল দগ্ধ ব্যক্তিদের অবগাহনের জন্য এই রম্য সরোবর নির্মাণ করেছেন।

এরপর কি আর লক্ষহীরা নীরব থাকতে পারে? মদনশর ভ্রু ধনুকে সংযোজন করে, বিলোলকটাক্ষ-তীর নিক্ষেপ করে বললো, ইয়ে, কবিবর, আপনি আবার এই সরোবরের স্নানার্থী নন তো!

কালিদাস কৃত্রিম অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আরে না, না, আমি তপস্বী মানুষ। তপস্বীরা শম্ভু পূজা করে।

কমলমুখি, ভবত্যাশ্চারুবক্ষোজ শম্ভুঃ

কিল পরমরসাঢ্যো নির্ম্মিতঃ কেন ধাত্রা।

অহমপি তু ন কামী কিন্তু কান্তে তপস্বী

নিজকর কমলাভ্যাং শম্ভুপূজাং করোমি॥

লেখক মশাই, বুঝতে পারছেন, কবি নিজকে কিরূপ তপস্বী বলছেন? না কি, এরও বাংলা করে দোব। দেখবেন মশাই, লিখবেন টিখবেন না যেন।

কালিদাস বলছেন, হে কমলমুখি, তোমার চারুবক্ষে শম্ভু রয়েছে। বিধাতা পরম রসাঢ্য ও-দুটি নির্মান করেছেন। আমি কামনাশূন্য তপস্বী, কিন্তু হে কান্তে, (বাসনা) আমার হস্তদ্বারা ঐ শম্ভু পূজা করি।

কবি তো শম্ভুপূজা করতে ইচ্ছুক। লক্ষহীরারও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু একে নারী তায় বেশ্যা। সুতরাং এত সহজে ধরা দিয়ে সস্তা হতে পারে না। বিশেষতঃ, মহিলাদের নাকি বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা।

সুতরাং কালিদাসের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে কৃত্রিম ভীতির ভাব ও বিক্রমাদিত্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বললো, এ কী করে সম্ভব। আমি রাজার রক্ষিতা, আমার পক্ষে অপরকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ঠিক। কালিদাস বিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিই বলুন।

কালিদাস বললেন। সেই সরোবরের উদাহরণ স্মরণ করেই বললেন,

বাপ্যাং স্নাতি বিচক্ষণো দ্বিজবরো মূর্খোহপি বর্ণাধমঃ
ফুল্লাং নাম্যতে বায়সোহপি হি লতাং যা নামিতা বর্হিণা।
ব্রহ্মক্ষত্র বিশস্তরন্তি চ যয়া নাবা তয়ৈবেতরে
ত্বং বাপীব লতেব নৌরিব জনং বেশ্যাসি সর্বং ভজ।

অর্থাৎ সরোবরে বিচক্ষণ দ্বিজবর, বর্ণাধম মূর্খ স্নান করে। বৃক্ষলতায় কাকও বসে ময়ূরও বসে। নৌকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পার হয়। অন্যেও হয়। তুমি সরোবর, লতা, নৌকার মত সকলকেই ভজতে পার। কারণ তুমি বেশ্যা।

এমন যুক্তির পর আর আপত্তি করার কিছু থাকতে পারেনা। বিশেষ করে উভয় পক্ষের মিলনের বাসনা যেখানে ধৈর্যকে অতিক্রম করে গেছে ততক্ষণে।

মহাকবি কালিদাসের বাহুবন্ধনে ধরা দিলো লক্ষহীরা। আকণ্ঠ পান করলো দুজনে যৌবনসুরা। পরম তৃপ্তির মধ্যে বুকভরা অতৃপ্তির তৃষ্ণা বুকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেন কবি।

বিদ্যাবতী কমলা স্বামীর ভাবচাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। নিশীথে স্বামীর দেহে নখর ক্ষত লক্ষ্য করলেন বিদ্যাবতী। রসিক পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাবতী একেবারে কিছু জানতেন না তাঁ নয়।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন। কবি একটা অজুহাত দেখিয়ে সে কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

এরপর থেকে লক্ষহীরার কুঞ্জে বিক্রমাদিত্যকে লুকিয়ে মহাকবির অভিসার

চলতে থাকলো। কিন্তু এতকরেও কবির তৃপ্তি নেই। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে নিজকে তুলনা করে—নিজেই হীনমন্যতায় ভোগেন। কী করে বিক্রমাদিত্যকে লক্ষহীরার চোখে ছোট করা যায় এই ভাবনা।

কিন্তু কী করে?

অর্থে, প্রতিপত্তিতে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ হওয়া দুরাশা মাত্র। তবে?

কবি ভাবতে ভাবতে একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। হ্যাঁ, এই প্রক্রিয়ায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে অপদস্ত করা যায়।

একদিন লক্ষহীরার কুঞ্জে এলেন মহাকবি কালিদাস। লক্ষহীরার সঙ্গে রঙ্গ কৌতুক করতে করতে কালিদাস বললেন, রমনী ইচ্ছে করলে পুরুষকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিতে পারেনা।

লক্ষহীরা বললো, নিশ্চয়ই পারে। প্রেমাস্পদকে তো বটেই।

কালিদাস কৃত্রিম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তুমি পার?

লক্ষহীরা বললো, পারিইতো! তোমাকেই পারি।

কালিদাস বললেন, আরে আমি তো তোমার একান্ত অনুগত হয়েই আছি।

—তবে বল অন্য কী প্রমাণ চাও? আমি তাই করবো।

কালিদাস বললেন, তুমি পার মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে অশ্ব করে তাঁর পৃষ্ঠারোহণ করতে? পারো তাঁকে দিয়ে অশ্বের আচরণ করাতে?

লক্ষহীরার মুখ একথায় শুষ্ক হয়ে উঠলো। কিন্তু তখন পিছুহটা মানে কালিদাসের কাছে পরাজয় স্বীকার করা।

সুতরাং আগপাছ চিন্তা না করে, মরিয়া হয়ে বলে উঠলো, হ্যাঁ, পারি। তাই আমি তোমায় দেখিয়ে দোব।

কালিদাস বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না, তবে যদি স্বচক্ষে দেখি তাহলেই কেবল মাত্র বিশ্বাস করতে পারি।

তারই ব্যবস্থা হলো। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যেদিন আসবেন সেইদিনটি লক্ষহীরা জানতো, কালিদাসও সেইদিন আগে এসে লুকিয়ে রইলেন।

তারপরের কাহিনী বহু কথিত কাহিনী। কালিদাসের সর্বনাশের পথ সুগম হবার কাহিনী। নিয়তির অমোঘ পরিণতির কাহিনী।

লক্ষহীরা বিক্রমাদিত্যের আগমনের পূর্ব থেকে কৃত্রিম অভিমানভরে অপেক্ষা করতে লাগলো। বিক্রমাদিত্য এলেন। তারওসেই লুকিয়েচুরিয়ে আসা। জানে অনেকেই। তবু ভাবের ঘরে চুরি। এখানে সময় কাটাবার সময়ও বেশী নয়। এমতাবস্থায় মানভাঙাবার ব্যাপার ট্যাপার থাকলে চিত্তির। সুতরাং বিক্রমাদিত্য একেবারে কাতর কণ্ঠে এই বিষাদের কারণ জানতে চাইলেন।

অনেক সাধাসাধির পর লক্ষহীরা বললো তার বাসনার কথা। তার বাসনা সে অশ্বারোহন করে। কিন্তু জীবন্ত অশ্বে মেয়েমানুষ হয়ে কী করে চাপে। দেখতেও দৃষ্টিকটু, আর ভীতিপ্রদও বটে।

লেখক মশাই, ইতিহাস ঘেঁটে দেখবেন সে যুগের মহিলারা ঘোড়ায় চাপতেন কিনা? মৌর্যযুগে শুনেছি শস্ত্রধারিণী নারী রাজকার্যে নিয়োজিত হতো। আপনাদের পুলিশ বিভাগে যে নারীপুলিশের আমদানী করা হয়েছে, আশ্চর্য নয় সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করার জন্যই।

যাক সেকথা। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ও, তাহলে এই।

বারবিলাসিনীর রূপের মোহে কামার্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলে বসলেন, সেজন্যে কি! আমি থাকতে তোমার বাইরের ঘোড়ার দরকার কি? আমিই ঘোড়া সাজছি, তুমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও।

অন্তরে উৎফুল্লা লক্ষহীরা অদূরে লুক্কায়িত কালিদাসের অবস্থিতির দিকে গোপন কটাক্ষ হেনে, সলজ্জ কণ্ঠে বললো, কিন্তু মহারাজ আসল ঘোড়া চিঁহি শব্দ করে। চিঁহি শব্দ কোথায় পাব?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বেশতো আমিই নাহয় চিঁহি শব্দ করবো।

ব্যস্, বারবণিতা বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে উঠে বসলো। হঠ হঠ করতে লাগলো। আর সাময়িক বিবেকবুদ্ধি রহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য চিঁহি শব্দ করে সারা কক্ষ মুখরিত করতে লাগলেন।

এক সময় এই লীলাভিনয় শেষ হলো। পরম তৃপ্তিতে ভরপুর লাস্যময়ী লক্ষহীরা বিক্রমাদিত্যের অঙ্কশায়িনী হলো।

গৃহে ফিরে বিক্রমাদিত্য এই ব্যাপার নিয়ে নিজের কাছেই লজ্জাবোধ

করতে লাগলেন। তাইতো হট্ করে এমনটা করা কি ঠিক হলো! অবশ্য সেখানে লক্ষহীরা ছাড়া কেউ ছিলোনা। আর লক্ষহীরাকে তিনি ভালওবাসেন, কিন্তু তাইবলে একজন রাজার পক্ষে এতটা নামা কি ঠিক হলো?

সহসা রাজার মনে একটা আলোক রশ্মি উদ্ভাসিত হলো। তাইতো, হঠাৎ লক্ষহীরা এমন বায়না ধরলো কেন? নারী, বিশেষতঃ বিলাসিনী নারী অর্থ কামনা করে। অলঙ্কার কামনা করে। এরকম উদ্ভট বায়না তো আশা করা যায় না। তবে? এমন বাসনা কি লক্ষহীরার নিজের কল্পনা প্রসূত, নাকি অপর কেউ এর পেছনে আছে?

যদি অপর কারও ইঙ্গিতে লক্ষহীরা এরূপ করে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি কে? কে লক্ষহীরার ওখানে যায়!

ভাবতে ভাবতে মহারাজের মনে একটিমাত্র নামই বারবার ঝঙ্কৃত হতে থাকলো। তবে কি কালিদাস! হ্যাঁ, এই একজনই হতে পারে। মহারাজ নিজেই তো তাঁর সঙ্গে লক্ষহীরার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আর কবি কালিদাসের নারী সম্পর্কে দুর্বলতার কথা মহারাজের অজ্ঞাত নয়। আর প্রথম দিনের পরিচয়ের ক্ষণে দুজনের বিমুগ্ধ দৃষ্টি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি এড়ায় নি।

ক্রোধে ঈর্ষায় বিক্রমাদিত্যের সারা শরীর জ্বলে যেতে লাগলো। কিন্তু এ নিয়ে কালিদাসকে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। অপরাধও প্রত্যক্ষ নয়। অনুমান মাত্র।

বুঝলেন লেখক মশাই, প্রত্যক্ষ অপরাধ দর্শনে মন ক্ষিপ্ত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুমান বা সন্দেহ বিষের জ্বালা আরও সাংঘাতিক বলে মনস্তত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন। তার জ্বালা অন্তরকে তুষের আগুনের মতো পুড়িয়ে মারে। সেখানে রাজা প্রজা, বিদ্বান মূর্খ সবাই সমান। মূর্খেরা তবু একটা এস্পার ওস্পার করতে পারে। পণ্ডিতদের বেলায় কইবারও নয়, সইবারও নয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য একবার ভাবলেন; লক্ষহীরাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ নিরসন করবেন।

পরক্ষণেই ভাবলেন, লক্ষহীরা এ ব্যাপারে সত্য সত্যই জড়িত থাকলে

কিছুতেই সত্য কথা বলবে না, বিশেষ করে এই স্বীকৃতির পরিণতি কী হতে পারে তা লক্ষহীরার অজ্ঞাত নয়। বিশেষ করে ভ্রষ্টা নারী মিথ্যা-বাদিনী হয়, একথা মহারাজের অজানা নয়।

সুতরাং বিক্রমাদিত্য নতুন পথ ভাবলেন।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে বিক্রমাদিত্য হাজির হলেন লক্ষহীরার কুঞ্জে। আজ আর লক্ষহীরার মুখমণ্ডল মেঘাবৃত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের কথা উঠলো। নিজের পছন্দ মত আহার, পরের পছন্দমত সাজসজ্জার কথা উঠলো। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বললেন, এই যেমন ধর আমার সভাকবি কালিদাস, ভদ্রলোকের সুন্দর চেহারা, সুরসিক ব্যক্তি। কিন্তু হলে কি হবে, লোকটার মাথায় এক গাদা চুল। এতে যে সৌন্দর্যহানি ঘটছে এ জ্ঞান নেই। কবি মানুষ কিনা, কিসে নিজেকে সুন্দর দেখায় এ সম্পর্কে কোন খেয়াল নেই।

লক্ষহীরা পরম কৌতুকে বললো, তা মহারাজ আপনি বললেই তো আপনার কবি ঐ চুল কেটে ফেলতে পারেন।

মহারাজ বললেন, আমি কি আর না বলেছি, তবে কি জান, আমার পক্ষে তো ও নিয়ে বেশী বলা ভাল দেখায় না। হাজার হলেও সে আমার আশ্রিত। আশ্রিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি পছন্দ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলাও ঠিক নয়।

লক্ষহীরা বললো, তাহলে ?

রাজা বললেন, একটা উপায় আছে, তুমি যদি রাজী হও।

লক্ষহীরা আতঙ্কিত বিস্ময়ে বললো, আমি, আমি কী করতে পারি ?

মহারাজ বললেন, তুমি যদি কালিদাসকে অনুরোধ করো, তাহলে সে তোমার কথা ঠেলতে পারবে না।

লক্ষহীরা শুষ্ক কণ্ঠে বললো, আমি, আমি কালিদাসকে কোথায় পাবো।

বিক্রমাদিত্য মনে মনে হাসলেন। মুখে বললেন, তা তো বটেই, তুমি কোথায় পাবে তাকে। আমি একদিন নিয়ে আসবো। না, আমি এক-দিন কৌশল করে তোমার কাছে পাঠাবো। তারপর তুমি যা বলবার বলবে।

লক্ষহীরা বারবণিতাসুলভ কটাক্ষ হেনে রাজাকে বললো, কিন্তু আপনার কবি আমার মতো গণিকার কথা শুনবেন কেন ?

রাজা লক্ষহীরাকে আদর করে বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য যদি তোমার কথা শুনতে পারি, আর আমার কবি শুনবে না ?

লক্ষহীরা বললো, বারে, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। কিন্তু আপনার কবি তো আমার কেউ নয়।

রাজা বললেন, বেশতো, তুমিও না হয় তাকে—।

কৃত্রিম কোপে লক্ষহীরা বললো, যান, আপনার মুখে কিছু আটকায় না। আমি হতে পারি গণিকা, কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমি দ্বিতীয় পুরুষের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারিনে।

বিক্রমাদিত্য লক্ষহীরার হাত দুটি ধরে বললেন, সে কি আর আমি জানিনে। তবে আমার বড় বাসনা তুমি আমার জন্যে একাজ কর।

লক্ষহীরা অবনতমস্তকে কী ভাবতে লাগলো।

সেদিকে লক্ষ্য রেখে মহারাজ বিক্রমাদিত্য টোপ ফেললেন, অবশ্য এমনি এমনি একাজ তোমাকে করতে বলছি না। একাজ করতে পারলে একটা মোটা পুরস্কার তোমাকে দোব।

এর পর অর্থকামী নারী নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলো না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, বেশ মহারাজ আমি রাজি। আপনি কালিদাসকে পাঠিয়ে দেবেন। দেখি কী করতে পারি !

পরদিন কালিদাস এসে হাজির। জ্যোছনা পুলকিত যামিনী। হৃদয় আবেগে মত্ত। বিশেষ করে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে মনোমত নাজেহাল করতে পেরে মনটাও বেশ খুশী। আরও খুশী মহারাজ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি, এর পশ্চাতে কালিদাসের হাত আছে। কিন্তু একি ব্যাপার বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে লক্ষহীরা গৃহমধ্যে ঢুকছে যে !

কালিদাস বলে উঠলেন,

> অয়ি মন্মথচূতমঞ্জরি ! কমলায়তচারুলোচনে !
>
> অপহৃত্য মনঃ ক্ব যাসি মে কিমরাজকমত্র রাজতে ?

ব্যাপার কি ? না, হে মন্মথচূতমঞ্জরি, হে কমলআয়ত চারুলোচনে আমার

মন চুরি করে কোথায় যাচ্ছ? এখানে কি কোন রাজা বাস করেন না?

অর্থাৎ এটা কি রাজশাসন বিহীন অরাজক রাজ্য নাকি, যে হৃদয় চুরি করলেও তার বিচার হবে না?

ছলনাময়ী লক্ষহীরা একটু এগিয়ে যাবার ভান করতেই কালিদাস তাকে আকর্ষণ করে নিজের বক্ষে টেনে আনলেন। তারপর দুজনায় সরস বাক্যালাপ আরম্ভ হলো। কবির মস্তকটি কোলে নিয়ে সুন্দর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে বললো লক্ষহীরা, কবি তুমি সুন্দর। কিন্তু আরও সুন্দর হতো যদি এই বিচ্ছিরী চুল না থাকতো।

সেকী! অ্যাঁ লক্ষহীরা বলে কি?

আজকাল যেমন সিনেমায় বিভিন্ন কুমারের প্যাটার্ণে চুল রাখা বা কেশবিন্যাসের রেওয়াজ, সেযুগেও কবিদের স্বভাব, আচার আচরণ অনুকরণ করার রেওয়াজ ছিলো।

কালিদাস বললেন, কিন্তু সখি, ছোকরারা যে আমার কেশপাশের প্রশংসা করে থাকে। শুধু তাই নয়, অনেকে এই রকম কেশবিন্যাস করতেও আগ্রহী।

লক্ষহীরা বিরস কণ্ঠে বললেন, গ্যাখো, আমি তো ছোকরা নই। আমার চোখে যেরূপ লাগলো তাই বললাম। ছোকরাদের পছন্দ তারা বুঝুক। আমি তো বুঝি যাকে ভালবাসি তার পছন্দই পছন্দ। আমার চোখেই যদি ভালো না লাগলো, তাহলে অপরের পছন্দ নিয়েই থাকো।

কালিদাস দ্রুতকণ্ঠে বললেন, আরে, সেকী সেকী। তোমার চোখে যদি ভাল না লাগে তাহলে এ চুল রাখার সার্থকতা কী? তবে কি জান, এতদিন ধরে, অনেক যত্নে লালিত এই চুল, হঠাৎ কেটে ফেললে লোকে ভাববে কী! লক্ষহীরা কৃত্রিম অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো, বুঝেছি, লোকে ভাববে কি ভাববেনা সেতো নয়, আসলে তোমার স্ত্রী কী ভাববে এই হচ্ছে তোমার ভয়। তা হবেই তো আমি তোমার কে? আমি তো তোমার সেই বিদুষী ভার্যা নই। আমি এক সাধারণ গণিকা। বেশ সব ভালবাসা বোঝা গেল। হায়, আমি কিনা এর জন্য মহারাজের সঙ্গে পর্যন্ত প্রতারণা করেছি।

সর্বনাশ!

বুঝুন লেখক মশাই, কীরকম ঠ্যালা! এবার শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

বিত্যাবতী চুলোয় যাক, মাথা মুড়িয়ে লোকসমাজে বেরুবে কী করে?

এদিকে যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা হয়। বিশেষ করে পত্নীকে ঠেকানো চলে, কিন্তু পরকীয়া প্রেম, ওরে সর্বনাশ!

সুতরাং হাড়কাঠে গলা বাড়ালেন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মহাকবি কালিদাস। ব্যবস্থা পূর্বপরিকল্পিত। ইঙ্গিত মাত্রেই নাপিত বাবাজী এসে হাজির। অল্পক্ষণের মধ্যে অমন যুবক-যুবতী নয়নমনমুগ্ধকর সুনিবিড় কেশগুচ্ছ সদ্গতি প্রাপ্ত হলো। লক্ষহীরা উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, আহা, মরি মরি, এখন ছাখ দেখি তোমার সৌন্দর্য কতগুণ বৃদ্ধি পেলো?

বলেই বারাঙ্গনা কালিদাসকে চুম্বনে চুম্বনে আকুল করে তুললো। কবি কালিদাস লজ্জার মাথা খেয়ে আর আরসীতে নিজের চেহারাটা পর্যন্ত দেখার কথা মুখে আনতে পারলেন না!

গৃহে ফিরতেই বিত্যাবতী কমলার চোখে পড়ে গেলেন। —এ কি, মাথা মুড়িয়ে এলে কোত্থেকে?

আর কোত্থেকে! সেকথা কি আর মুখ ফুটে বলার উপায় আছে! কালিদাস বললেন, ইয়ে, আজ চন্দ্রগ্রহণ ছিলো কিনা, সেজন্যে মাথা মুড়িয়েছি।

বিত্যাবতী কমলা কী ভাবলেন কে জানে। তবে কাহিনীটি যে তিনি মোটেই বিশ্বাস করেননি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শয়নকক্ষে আরসীতে নিজের চেহারা দেখে মহাকবির তো চক্ষু ছানাবড়া। ইস্-স, কী করেছেন তিনি! একটা বেশ্যার কথায় কিনা অমন সুন্দর চুলগুলোর সর্বনাশ করে এসেচেন।

এই চেহারা নিয়ে কাল বেরুবেন কী করে। রাজসভায়ই বা যাবেন কী করে। পরদিন রাজসভায় না যেয়ে বাড়ীতেই বসে রইলেন কালিদাস। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এত্তেলা পাঠালেন। কী হলো কবি কালিদাসের! অসুখ বিসুখ নয়তো!

সুতরাং পরদিন ধীরে ধীরে রাজসভায় রওনা হলেন কালিদাস। একটু দেরী করেই গেলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা তখন জমজমাট। দূর থেকে কালি-দাসকে দেখেই মহারাজ তো সবই বুঝতে পারলেন। কেমন, এইবার

কবিমশায়, বোঝ ঠ্যালা! কালিদাস সভায় প্রবেশমাত্রেই বিক্রমাদিত্য বলে উঠলেন,

কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডনং কুত্র পর্ব্বণি?

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, কোন পর্ব উপলক্ষে মাথা মুড়ুলেন?

প্রশ্নের ধরণ দেখেই সন্দিগ্ধমনা কালিদাসের যেন কেমন কেমন লাগলো।

তবু কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে বললেন, আজ্ঞে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে চুল কামিয়ে ফেলেছি।

ব্যাপারটা এমনিতেই এমন হাস্যকর যে মহারাজ হো-হো করে হেসে উঠলেন। রাজাকে হাসতে দেখে রাজসভার সকলেই হেসে উঠলো। বররুচি, শঙ্কু কেউ বাদ গেলেন না।

কালিদাসের মনে হলো, মহারাজ যেন জেনে শুনেই এই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। শুধু তাই নয়, সভার সকলেই যেন ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে।

হাস্যরোলের মধ্যেই মহারাজ বললেন, কবির কৈফিয়ৎটা এত হাস্যকর যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। কী বলেন আপনারা? আমার মনে হয় কবি সত্য ঘটনা চেপে যাচ্ছেন। কোন তীর্থে তিনি মাথা মুড়ুলেন তা যদি তিনি বলেন তবেই তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি?

এবার কালিদাসের বিচার বুদ্ধি লোপ পেলো। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তাঁর এই কেশছেদনের ব্যাপারের সঙ্গে মহারাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

যদি তাই হয়, তাহলে নিজে অপদস্ত হবার সঙ্গে রাজাকেও ছেড়ে দেবেন কেন এই ভেবে কালিদাস বলে উঠলেন, তাহলে শুনুন মহারাজ,

যস্মিন্ তীর্থে হয়ো ভূত্বা চিঁহি শব্দং চকার হ।

কোনতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করেছি? যে তীর্থে আপনি ঘোড়া সেজে চিঁহি শব্দ করেছিলেন, সেই তীর্থে।

আর যায় কোথায়! মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে সন্দেহ মনে মনে এত-

দিন করে এসেছিলেন, তা সত্যে পরিণত হতে দেখে, রাজা লাল হয়ে উঠলেন। সভাসদরা একটা রহস্যজনক ব্যাপারের ইঙ্গিত পেয়ে উৎকীর্ণ হয়ে রইলেন্। বররুচি প্রমুখ প্রবীন সভাসদগণ একটা ঝড়ের সম্ভাবনা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য অসীম ধৈর্যশীল ব্যক্তি। বিশেষ করে রাজ-সভাতে এ নিয়ে বাদানুবাদ করা শোভা পায়না তাঁর। কেঁচো খুঁড়তে যেয়ে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা।

মনের রাগ মনে রেখে, হেসে বললেন বিক্রমাদিত্য, বাঃ, কবির ব্যঙ্গ কবিতাও কী অপূর্ব।

সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হলো। কালিদাসও চিন্তিত মুখে গৃহের দিকে এগুলেন। পথে বররুচি বললেন, দেখুন, যদিও কবি হিসেবে আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু বিশ্বাস করুন ব্যক্তিগত ভাবে আপনি আমার সমগোত্রীয়। আজকের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগচে না। এর আগেও আপনাকে বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিয়েছিলাম, আপনি এই অসম প্রতি-দ্বন্দ্বিতা থেকে নিবৃত্ত হোন।

কিন্তু কালিদাসের তখন মরীয়া অবস্থা। বললেন, দেখুন বররুচি,

সরল কুরল কঙ্কাঃ কাক কাদম্ব হংসাঃ
অহিনকুল মনুষ্যাঃ কে ন খাদন্তি মৎস্যান্।
অহমতিতনু জীবী ক্ষীণমীনোপভোগী
জগতি বিদিত মেতম্মৎস্যরঙ্গঃ কলঙ্কঃ॥

সরল কুরল (ঈগল জাতীয় কুরর), কঙ্ক (কাঁক), কাক হাঁস প্রভৃতি, সাপ নেউল মানুষ কে না মাছ খায়। কিন্তু আমি ক্ষীণজীবি ক্ষুদ্রমৎস-ভোজী জগতে মাছরাঙা কলঙ্ক নিলাম।

এর পর আর কি বলা যায়। কে জানে কবি কালিদাসের নিয়তি তাঁকে কোন পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অন্তত কালিদাস তা জানেন না।

দ্বিজুচৌধুরী বলেছিলো, এ পাড়ার কেচ্ছার কথা আর জানতে চেওনা

ভায়া। এখানে যে কত লীলে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে তার সীমে পরিসীমে নেই।

দ্বিজু চৌধুরী এ লাইনে তখন কিছুদিন হয় দালালীতে নেমেছে। কোলকাতার কাছেই এক প্রাক্তন জমিদার বাবু তার মক্কেল। বেশ ভালো পার্টি। দেনা পাওনাও বেশ। ডান হাতে দিলে বাঁ হাত জানতে পারেনা এমন। শুধু নজরখানা উঁচু সুরে বাঁধা। জিনিসটি সরেস হওয়া চাই। পাঁচ হাতে আটাঘাঁটা নাহয়। রুচিপত্তরে আধুনিকা হওয়া চাই। হর্সটেল বাঁধা চুল। হাতের নখগুলো বেশ একটু বাড়ানো সুডৌল। নেচারাল কালার হলে আরও ভালো। ম্যাচ করে কাপড়জামা পরতে জানা চাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আলো আঁধারের দিকে লক্ষ্য রেখে শাড়ি পাল্টানোর কায়দা জানা চাই। সকালে হাল্কা সবুজ শাড়ি ব্লাউজ। দুপুরে হাল্কা হলুদ। বিকেলে একটু ডীপ্ কলার। সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানো শাড়ী। রাত্রে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ভেদে বিভিন্ন রঙের শাড়ি ব্লাউজ। ব্লাউজের কাটিং আধুনিকতম। তবে হ্যাঁ, প্রতিটিই হাত কাটা বুক কাটা হওয়া চাই। ঝুল সামনের দিকে, পেট খোলা। শাড়ী যথাসম্ভব কোমরের নীচে পরতে জানা চাই। সর্বোপরি লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ হওয়া চাই। এক্ষুনি বাঁধা রাখার প্রশ্ন নয়। দু'দশদিন এমনি নগদ পয়সায় ভিজিট করবেন। পছন্দ হলে বাঁধা রাখার প্রশ্ন।

" তা আপত্তি কি আমার। এ বরং একদিকে ভালই হলো আমার। নগদ বিদায় পাবার পথ রইলো।

নিয়ে গেলাম একেবারে আনকোরা ভাড়াটে বাড়ীতে। দুর্গাচরণ মিত্তির ষ্ট্রীটের কাছে যে ব্যায়ামাগারটা আছে ওর পাশে। নতুন ফ্ল্যাটবাড়ীতে কয়েকটি আধুনিকার বাস। শুনেছিলাম, এর আগে এক আধদিন ঢু মেরেছি মাত্র। পথ ঘাট রপ্ত হয়নি।

জমিদার বাবুর মোটরেই গেলাম। উল্টো ফুটপাথে গাড়ী রেখে তো দুতলায় উঠলাম। উঠতেই দারোয়ান সেলাম ঠুকলো। তারপর এক আধুনিক ড্রয়িং রুমে বসিয়ে শ্রীমান নিজের জায়গায় বসলো। যাবার আগে আবার একটা সেলাম ঠুকে গেলো। এবারকার সেলাম অবশ্য দুটো টাকা সেলামী

পেয়ে। তা পাক। আমি হলে দিতুমনা। কিন্তু আমি শ্রীমান দ্বিজু চৌধুরী তো আর খদ্দের নই।

ড্রয়িং রুমে তো বসলাম। বসলাম নতুন কেনা সোফায়। বেশ নরম সোফা। সামনে ছোট গ্লাসটপ টেবিল। তার উপর নানান সাময়িক পত্রিকা। ইংরেজী বাংলা উর্দু হিন্দী সব রকম। অধিকাংশই সিনেমা সংক্রান্ত, যৌবন সংক্রান্ত। বাহারে বাহারে ছবিওয়ালা পত্রিকা। এক কোণা ছোট টেবিলে অতি আধুনিক ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধা। দেয়ালে, না দেয়ালে কোন ছবি টবি নেই। সারা ঘরে একটা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ।

একটু পরেই খানসামা মত একটা লোক ঢুকলো। সেলাম করলো। বললো একটু বসতে হবে। এনগেজড্।

তা আর আশ্চর্য কী? রকম সকম দেখে তো মনে হওয়া স্বাভাবিক, শতখানেক টাকার কম ভিজিট নয়।

সুতরাং বসতে হলো। খানসামা মত লোকটা ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের টিন ও লাইটার খানা এগিয়ে দিলো। লক্ষ্য করিনি ও দ্রব্যগুলো একটু দূরেই ছিলো।

তা ভাল। বেশ ব্যবসা জানে দেখছি। জমিদার বাবু সিগারেট নিলেন না। কিন্তু আমার মনটা হাত বাড়িয়ে দিতে বলছিলো। কিন্তু জমিদার বাবু অনুমতি না দিলে আমাদের নেওয়া বারণ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, তিনি এলেন। এলেন মানে আবির্ভূতা হলেন বলাই বলা। না, রঙ্ যে আহামরি ফর্সা তা নয়। কিন্তু কী বলবো ভায়া, এমন লাবণ্যময়ী খুব কম দেখা যায়। যেমন ছিমছাম চেহারা, তেমনি ছিমছাম সাজ সজ্জা। এক মাথা চুল এলিয়ে, হাতে উল কাঁটা নিয়ে কী বুনতে বুনতে প্রবেশ করলো মেয়েটি। ঢুকবার মুখে একবার দুচোখ মেলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিলো। এমন কাজল কালো অতল আঁখি দেখে যে কোন লোকই কবিতা লিখতে চাইবে।

আমরা বসেছিলাম যে সোফাটায়, তারই একপাশে বসলো। বসে আর কোন কথা নয়, উল বুনতে লাগলো মেয়েটা।

জমিদার বাবু আমাকে ইসারা করলেন কথা বলতে। একটু কেশে

বললাম আমি, ইনি হচ্ছেন—এর জমিদার বাবু। ঘণ্টা খানেক কাটাতে চান। কত পড়বে?

মেয়েটি আর একবার মুখ তুললো। তারপর হাতের কাজ করতে করতে সংযত মৃদু কণ্ঠে বললো, আপনারা আমার সরকারের সঙ্গে কথা বলুন!

ও তাহলে খানসামা বলে যাকে ভেবেছিলাম, সেই হচ্ছে সরকার। ওরে বাবা, তবু যে 'ম্যানেজার' বলেনি এই আশ্চর্য।

সরকার এসে সামনের সোফায় বসলো। তারপর কোন ভূমিকা না করে যন্ত্রচালিতের মতো বললো, প্রতি কেস দেড়শ' টাকা।

—দেড়শ!

—হ্যাঁ, ঐ এখানকার রেট। অবশ্য মদের ব্যয় আমাদেরই।

জমিদার বাবু ফিসফিস করে বললেন, একশ' বল!

বললাম, খুবই বেশী রেট! এ পাড়ায় তো এত রেট কোন বাড়ীতে নেই? ওটা একটু কমালে ভাল হয়।

সরকার বললো, সোয়াশ'র কম আমরা নামতে পারিনে।

বললাম, আমরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত উঠতে পারি।

সরকার মেয়েটার দিকে তাকালো। কী কথা হলো কে জানে? মেয়েটি কিন্তু এক আধবার আমাদের দিকে তাকালেও সারাক্ষণ চুপ করেই ছিলো। কিন্তু সে চুপ করে থাকতে তার অভিজাত্যবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হচ্ছিল না। বরং আমি বলবো এতেই যেন তাকে আরও কী বলে অভিজাত বলে মনে হচ্ছিলো।

সরকার বললো, ওর কমে আমরা নামতে পারিনে।

আমি পঁচাত্তর টাকা পর্যন্ত উঠলাম। জমিদার বাবু উসখুশ করতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় দরজার সামনা দিয়ে যে যুবকটি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগুলো, তাকে দেখে জমিদার বাবু লাফিয়ে উঠলেন।

—একি, সুবল তুই? তুই এখানে?

সর্বনাশ, এ আবার কী কাণ্ডরে মশাই!

শ্রীমান সুবল, ততক্ষণে এক পলক সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে

বলে উঠলো, একি বাবা! ওঃ এরূপ দৃশ্য ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখার যোগ্য ভায়া। কিন্তু দুঃখ আমার কাছে কোন ক্যামেরা ছিলোনা।

বললাম, কেন চৌধুরী তুমি ইতিহাস পড়নি? দিল্লীশ্বর আকবর শাহকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো আনারকলিকে। যুবরাজ সেলিমের তখন উঠতি বয়স। তার নজরে পড়ে গেলো আনারকলি। উভয়ে উভয়কে ভালবাসলো। কিন্তু সম্রাটের অজ্ঞাতে। আনারকলি বাদশাহের মনোরঞ্জনে বাধ্য। ওদিকে সেলিমের অন্তরের আহ্বানের জন্য তার মন উন্মুখ থাকে। অবশেষে ধরা পড়ে গেলো দুজনে। লোকে বলে, আনারকলি ও সেলিমের মধ্যে যে অনুরাগ রয়েছে আকবর তা লক্ষ্য করেছিলেন আরসীতে। তার পরিণতির কথা তো সবাই জানে।

চৌধুরী বললো, হ্যাঁ, তোমরা যে সাম্যবাদ সাম্যবাদ করনা, আমার মনে হয় তার সব থেকে বড় ক্ষেত্র দুটোর একটা হচ্ছে রেসকোর্স, আর একটা হলো এই পতিতালয়। এখানে ধনী গরিব, পণ্ডিত মূর্খ সব সমান। অবশ্য সব সমান হতে হলে একটু পয়সা লাগে। তা পয়সা সংগ্রহ করতে তীর্থযাত্রীদের অসুবিধে হয় না। চুরি করে, ধার করে যেমন মানুষ রেসকোর্সে যায়, এ তীর্থেও তেমনি বাপের বাক্স ভেঙেও আসতে হলেও আসে।

বললাম, তোমার পিতাপুত্রের কাহিনীর শেষ কী হলো চৌধুরী?

চৌধুরী বললো, কেন সাস্‌পেন্সই তো ভালো মশায়? ঐটেই তো আধুনিক টেকনিক! বললাম, সে তো গল্পলেখককে হাতের কাছে পায়না বলে।

চৌধুরী বললো, বাকীটুকু কল্পনা করে নাও ভায়া। না পারো, আর একদিন বলবো। নাও এখন গোটা দুই টাকা দাও দেখি কালই ফেরৎ দিয়ে দোব।

রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ডাক্তার বাবুর চিঠিটা নিয়ে বসলাম। দ্বিজু চৌধুরী বলতো, রেসকোর্স আর বেশ্যাবাড়ী যেয়ে শেষ পর্যন্ত লাভ হয়না কারও—ক্ষতি ছাড়া। দু পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া রেসকোর্স থেকে লাভ করতে পারেনা কেউ। বেশ্যাবাড়ীর ব্যাপারও তাই। বেশ্যার কৃপায় দু দশজন দু পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়েছে এটা সত্যি কিন্তু অধিকাংশ

লোকই ডোবে। তবু আসে, ডুবতে ডুবতে আসে, ডোবার জন্য আসে। কালিদাসের কাহিনী সেই ডোবার কাহিনী। চৌধুরী এলে ডাক্তারবাবুর চিঠিটা দেখাতাম। কিন্তু শ্রীমান কি এত সহজে আর আমার এখানে আসবে। যখন আসবে তখন রেডিও অফিসের চেকের আর ধ্বংসাবশেষ কিছু থাকবে বলে মনে হয়না।

ডাক্তার বাবু লিখেছেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে কথা কাটা-কাটির পর কয়েকদিন কেটে গেছে। কালিদাস যথারীতি রাজসভায় আসেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যও কবির সঙ্গে আবার আগের মত বাক্যালাপ করেন। রঙ্গ রসিকতা করেন। কোনদিন যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো মহারাজ বিক্রমাদিত্য তা বুঝতে দেননা তাঁর ব্যবহারে।

মহাকবি কালিদাসের মনের অস্বস্তি ধীরে ধীরে কেটে গেলো। না, মহারাজ সেদিনের ঘটনাটা রসিকতা হিসেবেই নিয়েছেন।

সুতরাং এখন একদিন লক্ষহীরার কুঞ্জে সুযোগ সুবিধে মতো যেতে দোষ কী? হায়রে তখনও যদি কবি কালিদাস ফিরতেন। তাহলে ভারতবর্ষ আরও অমর কাব্য লাভে ধন্য হতো। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কলঙ্কভাগী হতেন না। বারবনিতা সম্পর্কে এত কলঙ্ক কেউ এমন করে লেপন করতোনা। হয়তো কেউ কেউ বলবেন, এতো অনিবার্য-পরিণতি। এ অভিশাপ তো দেবী সরস্বতীর! কবি কালিদাস মাতৃবন্দনায় পদযুগল থেকে আরম্ভ না করে বরপ্রাপ্তির পর আরম্ভ করেছিলেন, মুখচন্দ্র থেকে। কল্পনা করেছিলেন, নিজের স্ত্রী বিম্বাবতী কমলার পঙ্কজনেত্র,

ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্র!
কর্কশনালমকর্কশ নালম্॥

হে পঙ্কজ নেত্র, কর্কশ পদ্মের নাল, না অকর্কশ পদ্ম কোনটি তুমি ইচ্ছে কর! আর তারজন্যই দেবী সরস্বতীর অভিশাপ বারবণিতালয়ে কালিদাসের নিয়তি। সে কথায় পরে আসছি ভায়া।

লক্ষহীরাও কালিদাসের জন্য মনে মনে উদগ্রীব ছিলো। কে জানে মস্তকমুণ্ডনজাত দুঃখে কালিদাস আর এমুখো হবেন কি না। কাজটা

আসলে তো ভাল হয়নি।

কালিদাস আসতেই লক্ষহীরা পরম আগ্রহে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো। তারপর একথা সেকথার পর দুজনে পরম কামনা ভরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো।

ঠিক সেই সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং বিক্রমাদিত্য। কামনার আবেশে কেউ তাঁর আগমন লক্ষ্য করেনি। উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন কালিদাস বুঝলেন, এই মুহূর্তে আপনি বাঁচিলে বাপের নাম। সুতরাং কালবিলম্ব না করে, নিকটবর্তী জানালাপথে শায়েস্তা খাঁর পথ অনুসরণ করলেন। এক মুহূর্তপূর্বে যে দয়িতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন কবি, এই মুহূর্তে সেই প্রাণ বড়ই অমূল্য বলে মনে হলো।

কমলরাণী একদিন কি কথায় বলেছিলো দ্বিজু চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে, অবৈধ প্রেম ধরা পড়লে পুরুষ যেমন গা ঢাকা দেয়, নারী তা পারে না। মধুকর পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের প্রাণটি নিয়ে পালায়, আর এক বেচারীর যে কি অবস্থা হয় তা দেখার জন্য এক মুহূর্ত দেরী করে না।

কমলারাণী আরও যোগ করেছিলো, ধরা পড়লে, নারীই কেবলমাত্র দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

দ্বিজু চৌধুরী প্রতিবাদ করে বলেছিলো, রেখে দাও তোমার প্রাণেশ্বর। কত প্রেমিকা রীতিমত প্রেম চালিয়ে, প্রেমিকের সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যেয়ে, ধরা পড়ে, বাপের ঘরে এসে তাদের শেখানো মতো কোর্টে বলে বসে, আজ্ঞে ঐ ছেলেটাই আমাকে ফুসলে বের করে নিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, পত্তিকেতে আইন আদালত বিভাগগুলো পড়ে দেখো।

ডাক্তার বাবু লিখেছেন, কালিদাস তো পালিয়ে বাঁচলো। এদিকে লক্ষহীরার অবস্থা বেতস লতার মত থরহরি কম্পমান।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, এ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি তা জান?

তা আর জানে না লক্ষহীরা! সবাই জানে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তবু পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়। অবৈধ প্রণয়ের শাস্তি কি সবাই জানে, তবু সে নিষিদ্ধ ফলে অনেকের আগ্রহ।

লক্ষহীরা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

—মহারাজ আমাকে ক্ষমা করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, ক্ষমা! হ্যাঁ, ক্ষমা আমি করতে পারি, কিন্তু তা একটি মাত্র সর্তে!

—কি সে সর্ত মহারাজ?

—কালিদাসের ছিন্নমুণ্ড যদি আমাকে দেখাতে পারো, তাহলেই তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।

লক্ষহীরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো একথা শুনে।

রাজা বললেন, কি পারবে না?

লক্ষহীরা জড়িতকণ্ঠে বললো, আমাকে অন্য আদেশ করুন মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য দাঁতে দাঁত ঘসে বললেন, অন্য আদেশ হচ্ছে অন্যথায় তোমাকে অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

সর্বনাশ!

আতঙ্কশিহরিতা লক্ষহীরা বললো, মহারাজ কালিদাস ব্রাহ্মণ। আমাকে ব্রহ্মবধ পাতকে লিপ্ত করবেন না।

শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে মহারাজ বিক্রমাদিত্য বললেন, বেশ্যার আবার ধর্মজ্ঞান! তায় আবার ব্রহ্মবধ ভয়! শোন্ গণিকা, যদি কালিদাসের ছিন্নমুণ্ড আমাকে দেখাতে পারিস্ তবে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার। অন্যথায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।

লক্ষহীরার চোখের সামনে লোভ এবং মৃত্যু যুগপৎ খেলা করতে লাগলো। কে পরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেয়। নিজে বাঁচলে তবে তো পরের চিন্তা। আর মুখে যতই বলুক এই পৃথিবীতে মানুষ নিজেকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসে। হ্যাঁ, স্বামী, প্রণয়ী, পিতা, পুত্র সবার চেয়ে। লক্ষহীরাও নিজের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করবে না কেন? বিশেষ করে লক্ষ টাকা পুরস্কার। বারবণিতার কাছে অর্থলোভ বড় লোভ। তাকে জয় করা সহজ সাধ্য নয়। সুতরাং ধর্মভয়, প্রেম কোথায় তলিয়ে গেলো। এক মুহূর্তে আগের নারী, শাশ্বত স্বৈরিনীতে পরিণত হলো।

সাধে কি শূদ্রক বলেছেন,

এতো হসন্তি চারুদন্তি চ বিত্তহতো—

বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং ন তু বিশ্বসন্তি।

তস্মান্নরেণ কুলশীলসমন্বিতেন

বেশ্যা শ্মশানসুমনা ইব বর্জ্জনীয়া॥

এরা বিত্তের জন্য হাসে, বিত্তের জন্য কাঁদে, পুরুষকে বিশ্বাস করায়, কিন্তু পুরুষকে বিশ্বাস করে না। সেজন্য বেশ্যা কুলশীল সমন্বিত নরের নিকট শ্মশান-পুষ্পের ন্যায় বর্জনীয়া।

লক্ষহীরা রাজী হলো। জীঘাংসা তৃপ্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য খুশী মনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরদিন যথারীতি কালিদাস রাজসভায় গেলেন। ভরসা এই, মহারাজ প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোন হৈ চৈ করতে পারবেন না। করলে তা রাজ্ঞী ভানুমতীর কানে যাবে। লোকের কানে যাবে --সেটা খুব গৌরবের নয় মহারাজের পক্ষে।

একদিন যায় দুদিন যায়। কয়েক দিন গেলো। কালিদাস রাজসভায় আসেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের সঙ্গে আগের মতই রঙ্গ-রসিকতা করেন। ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই।

কালিদাস ভাবলেন, তাইতো ব্যাপার কী! তাহলে নিশ্চয়ই মহারাজ তাঁকে চিনতে পারেন নি। আর সন্ধ্যায় অন্ধকারে না চেনাও অসম্ভব নয়। ঠিকই, তা নইলে কি আর এ কয়দিনে বিন্দুমাত্র উষ্মা প্রকাশ করতেন না মহারাজ! তাই যদি হয় তাহলে আর একবার লক্ষহীরার কুঞ্জে যেতে আপত্তি কি? মনটাও লক্ষহীরার জন্য আইঢাই করে উঠছে।

লেখক মশাই, পরকীয়া প্রেমের মজাই নাকি এই, আমাদের পরিচিত এক ভৌমিক মশাই এই প্রসঙ্গে বলতেন, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ পরকীয়া প্রেমের মতো হোক।

হ্যাঁ পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণ শক্তিশালী চুম্বকের চেয়েও তীব্র। হৃদয়-লৌহকে তা বিপুলবেগে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণে পড়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভিজেছেন। আপনাদের বৈষ্ণবকবিরা তা উল্লেখ করেছেন।

ঐ আকর্ষণে বিল্বমঙ্গল ঝড়ের রাতে মৃতদেহকে কাষ্ঠ ভেবে তা আঁকড়ে নদী পার হয়েছিলেন। বিষধর সর্পকে রজ্জু ভেবে তা ধরে পাঁচিল টপকে ছিলেন।

'অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ'—ঐ ঘোড়ারোগে পড়ে আমাদের পাড়ার এক চৌধুরীবাবু রাত্রিবেলা ফিয়াসীর ঘরে যাবার দুর্বার আকর্ষণে বর্ষারাতে পাইপ বাইতে যেয়ে পা পিছলে তিনমাস হাসপাতালে পড়ে রইলেন। বাইরে অবশ্য রটানো হয়েছিলো, সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন। নতুন আনাড়ি চাকরটা নাকি জল তুলতে যেয়ে সিঁড়িতে জল ফেলেছিলো। এজন্যেই তার চাকরী গিয়েছিলো। অবশ্য আমি ডাক্তার হিসেবে জানতাম, হতভাগা চাকরটা ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলো। শুধু তাই নয়, বাবু পড়ে গেলে সেই নাকি প্রথম তাকে ধরে তুলবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করতে গিয়েছিলো।

সেদিন বসন্তোৎসব। কালিদাস একবার বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা করলেন। বিদ্যাবতী কমলা কালিদাসকে এমন সময়ে বেরুতে দেখে বললেন, আজ তুমি বাড়ীর বাইরে যেওনা।

কালিদাস বললেন, কেন বলতো ?

কমলা বললেন, কেন জানিনে, আমার কেমন অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে। তুমি আজ গৃহেই থাকো।

কালিদাস রসিকতা করে বললেন, আরে না, না, এ আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তুমি অনর্থক শঙ্কাতুর হয়ো না।

বিদ্যাবতী কমলার সনির্বন্ধ অনুরোধে কালিদাস গৃহে থাকাই স্থির করলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে কমলা ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন।

এদিকে কালিদাস ভাবলেন, আজ বসন্ত উৎসব না জানি আজ উজ্জয়িনী কেমন অপরূপ সাজে সেজেছে। না জানি কেমন উৎসব পালিত হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি তো বেশী দূর যাবোনা, চাইকি কমলা ঠাকুর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতেই ফিরে আসবো।

কালিদাস বেরুলেন। সত্যই আনন্দমুখরিত রাজপথ। আনন্দোচ্ছল

নরনারী। সারা নগরী আজ অপরূপ সাজে সেজেছে। রঙ লেগেছে সবার মনে। কবি কালিদাসেরও। একটু এগুতেই দূর থেকে দেখলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সপারিষদ উৎসব মঞ্চের দিকে এগুচ্ছেন।

কালিদাস ভাবলেন, তাহলে আজ তো মহারাজ লক্ষহীরার কুঞ্জে যাচ্ছেন না।

সুতরাং।

ভেসে গেলো বিদ্যাবতী কমলার অশ্রুসজল অনুরোধ। নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে এক পা, দু পা করে কালিদাস লক্ষহীরার গৃহাভিমুখে রওনা হলেন।

শ্রীমতী লক্ষহীরা কবিকে দেখে অভ্যর্থনা করলো। কিন্তু সারা মুখে কেমন একটা চাপা বীভৎসতা। কেমন একটা কুৎসিৎ অভিব্যক্তি।

লক্ষহীরা কোনরকমে কালিদাসকে বসতে বলে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করলেন। কালিদাস বসে বসে লক্ষহীরার কথা ভাবতে লাগলেন। লক্ষহীরার আজকের ব্যবহার, তার দৈহিক অভিব্যক্তি সবই যেন তাঁর কাছে অতীব কুৎসিৎ মনে হলো।

নিজের স্ত্রী বিদ্যাবতী কমলার কথা তাঁর মনে এলো। কমলার সঙ্গে তুলনায় লক্ষহীরাকে নরকের কীট বলে মনে হলো। মনে হলো কিসের লোভে কালিদাস অমন সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করে এক বারবণিতার আকর্ষণে এমন পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এর পরিণতি তো ভালো হতে পারে না।

কালিদাস ভাবলেন, না আর নয়। আজই এ ভুলের শেষ হোক। আর এক মুহূর্ত এই পাপপুরীতে নয়।

এই ভেবে কালিদাস গৃহে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তাঁর আর গৃহে ফেরা হলো না। লক্ষহীরা এক শাণিত ছুরিকা নিয়ে এসে পেছন থেকে কালিদাসের পৃষ্ঠদেশে আমূল বসিয়ে দিলেন।

আর্তনাদ করে কালিদাস পড়ে গেলেন। সহসা সরস্বতীর অভিশাপ তাঁর মনে পড়লো। বারবণিতার হাতে কালিদাসের মৃত্যু হবে। আর এই অভিশাপের কথা মৃত্যুর পূর্বে ছাড়া কালিদাসের মনে পড়বে না।

এমনি করে এক পাপিষ্ঠার অর্থলোভে এমন এক মহান কচি অকালে প্রাণ

হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে কালিদাসের কণ্ঠ থেকে যে কবিতা বেরুলো তা হচ্ছে,

সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
বিবেকো নাস্তি মূর্খানাং বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্॥

বেশ্যাদের স্বভাব নেই, সম্পদের স্থিরতা নেই, মূর্খের বিবেক নেই, আর কর্মের বিনাশ নেই।

ওহে লেখক মশাই, কবি কালিদাসের মুণ্ড ছিন্ন করে লক্ষহীরা এরপর কী করেছিলো সে অন্য কাহিনী। সে কাহিনী আপনি জেনে নেবেন। যে কাহিনীটি আপনাকে লিখলাম, কমবেশী এই কাহিনীটিই কালিদাস সম্পর্কে শোনা যায়। আমি একাধিক পুস্তকেও এই কাহিনী দেখেছি। লোক মুখেও শুনেছি।

কবি কালিদাস হুবহু এই শ্লোকগুলো বলেছিলেন কিনা, এ সম্পর্কে একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু খুব সদোত্তর পাইনি। কারণ আমি একই শ্লোকের ভিন্ন পাঠ দেখেছি। কিন্তু এ সবও অন্য কাহিনী। কালিদাস লক্ষহীরার কাহিনীর সঙ্গে তা রকমফের ঘটলেও কাহিনীর ঘটনা সংস্থাপন, নাটকীয় সংঘর্ষ (ক্লাইম্যাক্স) বহু কথিত, বহু শ্রুত কিংবদন্তী। হ্যাঁ, ভালকথা আপনাকে ইতোপূর্বে আমার যে অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলাম তাতে একটু বিদেশী গল্পের মশলাপাতির গন্ধ আছে। তবে রান্নাবান্না একেবারে দেশী মতে। আপনার অবগতির জন্য জানালাম।

রেডিওর টাকা পাবার পর দিন সাতেক আর দেখা নেই দ্বিজু চৌধুরীর। আমিও নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম এ কয়দিন। একটা পত্রিকার সম্পাদনার ব্যাপারে একটু কথাবার্তা চলছিল। পত্রিকাটিতে আগে থাকতেই লিখতাম। পারিশ্রমিক নিয়েই লিখতাম। এবার মালিকের ইচ্ছে পত্রিকাটিকে হাসির পত্রিকাতে রূপান্তরিত করবেন। সুতরাং আমি যদি কম পয়সায় রাজি হই, তাহলে বেশী পয়সা দিয়ে রুই কাৎলা কাউকে আর নেবেন না। এ সম্পর্কে আমাকে ভাবতে সুযোগ দিয়েছিলেন। ঘরে বসে কড়ি কাঠ গুণতে গুণতে তাই ভাবছিলাম

আজকে এই পত্রিকা থেকে এক পয়সা পেলে, কাল আর এক পত্রিকা থেকে দু' পয়সা পাব। তারপর আমার বেতন আরও পয়সা বাড়বে। তারপর তা থেকে আরও পয়সা। এমন কি সেই ছাতুওয়ালা ব্রাহ্মণের স্বপ্ন ভাবতেও আমার আপত্তি ছিলোনা। এমন কি সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে লাথি মারতেই দেখি তা আমার দরজায় লেগেছে, এবং; সেখানে শ্রীমান দ্বিজু চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন।

সাত দিন পর এই তার আবির্ভাব। চুড়িদার পাঞ্জাবী, বেশ চওড়া পাড় সিমলাই ধুতি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। পাঞ্জাবীটার গিলেকরা ভাব ম্লান, ধুতির কোচায়ও ময়লা, সিগারেটটাও দুমড়ানো। অর্থাৎ এক কথায় গতকল্য রাত্রিতে যে বেশ তুরীয় অবস্থা হয়েছিলো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চক্ষু দুটোও কিছুটা শিবনেত্র।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে পকেট থেকে দেয়াশালাই-এর কাঠি দিয়ে দাঁতের মধ্যে লাগা পানের কুচি খুঁচিয়ে তা গিলতে গিলতে চৌধুরী বললো, কী ভাবছেন তো, ব্যাটা দালাল ডুব দিলো কোথায়? আরে মশাই বাইরে ক্ষেপ নিয়ে-গিয়েছিলুম। গানের ক্ষেপ। কাল রাত্রে এসেচি মশাই।

বলে রাখি, চৌধুরীও মুডে থাকলে 'আপনি', বাণী দেবার সময় 'তুমি' বলে সম্বোধন করতো। খেয়াল থাকলে, যাবার আগে ত্রুটি স্বীকার করে যেতো। অনেকটা সেই রকম আর কি, ঐ যেমন কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক আছে না, রাত্রে স্বামীর শয্যাভাগিনী হয়ে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা শয্যা ত্যাগ করে যাবার সময় স্বামীদেবতাকে প্রণাম করে যায়।

চৌধুরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হুঁ।

চৌধুরী বললো, হুঁ মানে? বিশ্বেস হলোনা বুঝি! তা আর আপনার দোষ কি? বেশ্যাবাড়ীর দালালকে আর কে বিশ্বাস করে! তবে সাধ করে কি আর দালালী—পেটের দায়ে ধরেছিলাম।

পেটের দায়েই দালালী ধরে ছিলো দ্বিজু চৌধুরী।

আঙ্গুরবালা তো চলে গেলো। চৌধুরীর তখন পুরো যৌবন। তার চেয়েও বেশী উদ্দামতা। কুসুমকে নিয়ে আঙ্গুরবালার শোক (?) ভোলার

চেষ্টা করেছিলো দ্বিজু চৌধুরী। বেলগাছিয়ার বাসার পাট আগেই চুকেছিলো। প্রথম ক'দিন কুসুমের ডেরায়ই কাটালো। কুসুমও প্রশ্রয় দিলো চৌধুরীকে। দু দশদিন বেশ কাটলো। বন্ধনহীন ঘোড়ার মতোই কাটলো। কিন্তু কুসুম সেয়ানা মেয়ে। সে সিঁড়ি ভাঙতে জানে। উপরে ওঠার চেষ্টাও তার আছে। সুতরাং বেশী দিন তার চৌধুরীকে ভাল লাগবে কেন? বিশেষ করে তদ্দিনে 'প্ল্যাটনিক লভ্' না কী বলে তা উপে গেছে।

চৌধুরী বলেছিলো, না, ছুকড়ীর কায়দা কানুন আছে। ওকে দেখলেই আমার একটা হামলানো পুরুষ্ট গরুর কথা মনে পড়তো। তবে ছুকড়ীর নসিবটা বড় ভালো। কী করে যে তলে তলে দলের ম্যানেজারের নেক নজরে পড়ে গেলো কে জানে? আর একবার যদি পড়লোই তখন আর গানের মাষ্টারকে পাত্তা দেয় নাকি ভায়া।

সুতরাং বেপাত্তা দ্বিজু চৌধুরী একদিন বেপাত্তাই হয়ে গেলো। ইজ্জৎ বাঁচাতে দলই ছেড়ে দিলো। ব্যাটা ভাগ্নেবাবুও ডুব দিয়েছিলো। তা দিক। কিন্তু চৌধুরী এখন করে কি?

এরপর আরও দু'তিনটে দল ঘুরলো চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালক থেকে সহকারী। সহকারী থেকে তবলচী। অর্থাৎ সিঁড়ির এক এক ধাপ নিচুতে নামতে সুরু করলো। মেজাজও খিটখিটে হলো, মদের মাত্রাও বাড়লো। অবশেষে মেয়ে সংক্রান্ত এক রেষারেষিতে মাথা ফাটাফাটি করে যাত্রা কোম্পানী থেকে বেরিয়ে এলো স্থায়ীভাবে। না, আর ওলাইনে নয়।

অবশেষে এক ঘর ভাড়া নিলো। একা নয়, আর দুই মক্কেলের সঙ্গে। সোনাগাছি বাই লেনেরই পাশের গলিতে।

এই সব নিষিদ্ধ গলিতে আগেই যাতায়াত ছিলো। এবার বাড়লো। দু'একটা গানের ট্যুইসানীও জুটলো। পয়সা কম। তবে সে কমতি অন্যভাবে পুষিয়ে নিতো দ্বিজু চৌধুরী।

ভদ্র সমাজে যেমন গান শেখার রেওয়াজ আছে, বেশ্যা পল্লীতেও তেমনি। এদের মধ্যে একদল আছে যারা গান নিয়ে রীতিমত সাধনা করে। আর একদল আছে দু দশখানা 'বারনীং সং' গানের মাষ্টার রেখে তুলে নেয়।

আধুনিক যুগের খদ্দের আধুনিক বরদের মতো বাজারে চলতি দু পাঁচখানা গানও শুনতে চায়। ভদ্র সমাজে অনেক ক্ষেত্রে হাড়ি ঠেলার চাপে গানের পাট লোপাট হয়ে যায়। কিন্তু বারবণিতা সমাজে সস্তায় আসর মাত করার ব্যাপারে গান নাচ দুইই খুব সাহায্য করে। নাচগান জানা কনের কদরের মতো, নাচগান জানা বারবণিতার দাম বেশী। এজন্যে গানের মাষ্টারী করে মোটামুটি পেট চালায় অনেক তথাকথিত গায়ক। ঐ সঙ্গে তবলচীও। ভদ্রপাড়ার গানের মাষ্টার সব সময় এ পাড়ায় গানের ট্যুইশনিতে রাজী হয়না বটে, তবে একেবারে যে আসে না তাও নয়! পয়সা ফেললে কাকের অভাব হলেও (কারণ কাক ঠিক পয়সা খায় বলে জানা যায় না), মানুষের অভাব হয় না।

কমলরাণী বলতো, দেহের ব্যবসা না করেও শুধু রূপ আর গলার জোরে করে খাচ্ছে 'মুজরা' করে এমন বারবণিতার সংখ্যা কম নয়। এরকম অনেকে গল্প ইতিহাসে পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ উর্ণবিংশ শতকের সঙ্গীত জগতে এই সকল বাইজী অনেকের চিত্ত জয় করেছে। উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকাব করেছে। বাঙালী বাইজী সারাভারতে নাম কিনেছে এমন ঘটনাও প্রচুর। এদের পৃষ্ঠপোষক অনেক রাজামহারাজা, ধনী সমঝদার। এখনও অনেক পুরানো ঘি, নতুন ঘিয়ের চেয়ে দামী। তবে রাজামহারাজার সে দাপট কমার সঙ্গে সঙ্গে এদের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা কমেছে এই যা।

সত্যি কথা বলতে কি, ঠুংরী গজল এত জনপ্রিয় করার জন্যে যাদের দান অপরিসীম, তাদের মধ্যে একটা মোটা অংশ এই বারবণিতার ঘরের মেয়ে। বারবণিতা মেয়ে।

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, নাম দু'চার জনের করতে পারতাম, তবে নেহাৎ মানহানির ভয় আছে বলেই নাম চেপে যাচ্ছি মশাই। নইলে দেখতেন, আপনার আশে পাশেই তারা এখনও পরিচিত। দু পাচজন এখনও বেঁচে আছেন। এখনও জনতার পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন। পুরানো দিনের সুখস্মৃতি-মন্থন করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন।

কমলরাণী বলতো, এই আস্তাকুড় থেকে কত পদ্মফুল দেশের সাংস্কৃতিক জগৎকে সুগন্ধে ভরপুর করেছে, তার খবর কজন রাখে দাদা। আর

তারা কত বড় বড় শিল্পীর কাছে নাড়া বেঁধেছেন তাদের কথা হয়তো চিরকাল অজ্ঞাত থেকে যাবে।

চৌধুরী বলেছিলো, এনিয়ে রিসার্চ হওয়া দরকার বুঝলে ভায়া। আর তা হতেপারে তোমাদের মধ্যে যাঁরা এসম্পর্কে চিন্তা করেন, তাঁরা যদি একটু ক্ষমা ঘেন্না করে এঁদের সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন। এখনও এ পাড়ায় অনেক বুড়ি আছে, যারা অনেক খবর রাখে। এখনও অনেক পৃষ্ঠপোষক আছেন যারা এদের সম্পর্কে, এদের সাধনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আরও দেরী হলে অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। যেমন করে আমাদের ইতিহাসের অনেক উপাদান আমরা প্রতিনিয়ত হারাচ্ছি।

গর্বোজ্জ্বল মুখে বলতো কমলরাণী, শুধু কি সঙ্গীত জগতে, দেশের ডাকেও আমাদের এ পাড়ার মেয়েরা সাড়া দিয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম পাদে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমাদের কথা আপনাদের কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করবে কিনা জানিনে, কিন্তু যাঁর ডাকে আমরা ঘর ভুলে, ব্যবসা ভুলে এগিয়ে গিয়েছিলাম তিনি কিন্তু আমাদের বেশ্যা বলে ঘৃণা করেন নি। সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের অনেকে গায়ের গয়না খুলে দিয়ে ধন্য হয়েছে। পিকেটিং-এ যোগ দিয়েছে। শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছে। এ পাড়ার একজন তো তার বাবুর দেয়া গোটা এক বাক্স কাপড় নিজেই তেল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিলো। এ ছাড়া কত স্বদেশীবাবুকে যে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়েছে সে ইতিহাসও হয়তো কেউ জানবে না। কেউ হয়তো বিশ্বসও করতে চাইবে না। লোক হারিয়ে যাবে। কাহিনীতে বিকৃতির শ্যাওলা জমবে। শুধু দু চার জনের মনের মণিকোঠায় তা উজ্জ্বল হয়ে থেকে এক সময় চিরকালের মতো নিভে যাবে।

কমলরাণীকে বলেছিলাম, তুমি এমন কোন কাহিনী জানোনা কমলরাণী ?

কমলরাণী খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলো, জানি বৈকি, জানি। শুনবেন সে কথা ?

চৌধুরী সেদিন কাহিনীটা শুনতে দেয়নি। বলেছিলো, ছাখো ভায়া, রেডিও প্রোগ্রামটা শেষ হোক্ তারপর যত পারো তথ্য সংগ্রহ করো। এখন

অন্য কথায় মন দিলে আমার কাজ গয়ায় যেয়েও উদ্ধার হবে না।

কমলরাণী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলো, ঐ তো মিনসের দোষ। আমি কিছু বলতে গেলেই বাগড়া দেবে। এমনি হ্যাংলা এক পাত্তর ধেনো বিনি পয়সায় খাবার জন্যে সারা বেলা হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে। কোন মেয়ে মানুষের পাদোদক খাবার জন্যে লাইন দিয়ে বসে থাকবে, কখন ওর সময় আসবে। ঝাঁটা মারো অমন লোকের মুখে।

চৌধুরী বলেছিলো, তা মেরো, তবে তার আগে গানের সুরটা তুলে নিতে তো ভুলে যেওনা। ঐ যে ললিতে বিশাখারাও এসে গেছে। তাড়াতাড়ি সেরে নেই বাবা, আবার কখন আয়ান ঘোষেরা এসে ভিড় করবে তার ঠিক নেই।

না, চৌধুরী লাজলজ্জা, আত্মসম্মান সবই খুইয়ে বসেছে। অন্তত সেই মুহূর্তে তাই আমার মনে হতো। কে যেন বলেছিলো, বেশ্যাবাড়ীর দালাল আর কেঁচো এক রকম। দুয়েরই মেরুদণ্ড নেই। নেই মানে থাকতে নেই। থাকলেই বিপদ। কিন্তু দ্বিজু চৌধুরীর দালাল পরিচয় ছাড়াও তো আর একটা গুণ রয়েছে। হতভাগা একটা সুষ্ঠু পরিবেশে এসে একটু সৎভাবে সৎজীবন যাপন করে না কেন?

কিন্তু তখনও জানতাম না, সে উপায় দ্বিজু চৌধুরীর ছিলোনা। না, এজন্যে নয় যে ঐ গোলক ধাঁধায় যে একবার ঢুকেছে সে আর বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। সে কাহিনী আর এক কাহিনী। অন্য সময় বলার কাহিনী।

·

কমলরাণীর নতুনদি স্বর্ণকে আমি কালিদাস-লক্ষহীরার কাহিনী বলেছিলাম। স্বর্ণ বলেছিলো, কিন্তু লক্ষহীরারাই আমাদের সব নয়। আপনাদের সমাজেও এমন অনেক কাহিনী আছে। অনেক বধূ আছে, যারা নিয়মিত স্বামীকে প্রতারণা করছে। এমন নজিরও আছে নাকি ভালবাসার ত্রিকোণদ্বন্দ্বে একজন নিহত হলো, প্রতারিত হলো, আত্মহত্যা করলো। একটা মামলার কথা পত্রিকায়ও পড়ে থাকবেন, সেই বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। যে মামলাতে ভাওয়ালের মেজরাজকুমারের দার্জিলিঙে ১৯০৯ সালের ৮ই মে মৃত্যু ঘটার পর দীর্ঘ বিশ বছর পরে আদালতে হাজির হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন

তিনিই মেজরাজকুমার। কিন্তু অপর পক্ষে মেজরাজকুমারের স্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তিনি এঁকে স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে রাজি হন না। প্রাথমিক পর্যায় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত এই রোমাঞ্চকর মামলা প্রায় দশ বছর ধরে চলেছিলো। নিম্নকোর্টের রায়ে বিচারক এঁকে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র হিসেবে এবং রমেন্দ্র নারায়ণ রায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে পত্নী বিভাবতী হাইকোর্টে আপীল করেন। এক বছর ধরে এই আপীলের শুনানী চলে। অবশেষে আপীল খারিজ হয়ে যায়। বিভাবতী দেবী এরপর ছোটেন প্রিভি কাউন্সিলে। ১৯৪৬ সালে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারেও বিভাবতী দেবী হেরে যান। ভাওয়াল সন্ন্যাসী ভাওয়ালের মেজরাজকুমার বলে গণ্য হন।

এবার বুঝুন রায় মশায়, আপনাদের সমাজেও স্বামীকে অস্বীকার করার মামলা হয়। বিচারকের রায়ে প্রমাণিত হ'তে হয় স্বামী সত্যই স্বামী কিনা। অবশ্য রায়ের পর রাজকুমার বেঁচেছিলেন মাত্র ৪ দিন।

বললাম, কিন্তু তোমার কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় আমার বক্তব্যের উত্তর হলো না সুবর্ণ।

সুবর্ণ বললো, তা হবে কেন, একথা আমরা বলছি যে! বেশ তো লক্ষহীরার কাহিনীই যদি বলেন, তাহলে তার উল্টো চিন্তামণির কথা বলেন না কেন?

বললাম, কোন চিন্তামণি সুবর্ণ?

সুবর্ণ বললো, কোন চিন্তামণি আবার! বিল্বমঙ্গলচিন্তামণি।

কাহিনীটি জানা ছিলো। তবু সুবর্ণর মুখ থেকে শোনার জন্য বললাম, বেশতো কাহিনীটি বিবৃত কর। তুলনা করে দেখি।

সুবর্ণ একটু থেমে, চিন্তামণির কাহিনী বলেছিলো।

ধনী পরিবারের ছেলে বিল্বমঙ্গল। যেমন লম্পট তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। চিন্তামণি রূপসী বারনারী। এপারে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাড়ী। নদীর ওপারে চিন্তামণির কুঞ্জ। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রেমে উন্মত্ত। প্রতিদিন চিন্তামণির গৃহে রাত্রিবেলা তার আসা চাই। বিল্বমঙ্গলের এই উন্মত্ততা যে চিন্তামণির ভাল লাগতো না তা নয়। কোন বারবণিতারই বা না লাগে। বিশেষ করে

সেই পুরুষ যদি অর্থশালী এবং সুপুরুষ হয়। বিল্বমঙ্গলকেও ভালবাসতো চিন্তামণি। তবে অতখানি উন্মত্ত আবেগে নয়। বুদ্ধি বিবেচনা রহিত হয়ে নয়।

দিন যায়। চিন্তামণির প্রেমে মশগুল বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি ছাড়া ধ্যান নেই। চিন্তামণি ছাড়া জ্ঞান নেই। সংসার ভেসে যাক—শুধু চিন্তামণির চিন্তা।

একদিন খুব জল ঝড়ের রাত্রি। বিল্বমঙ্গল তা সত্বেও চিন্তামণির গৃহে যাবেন বলে বেরুলেন। এমন রাতে শেয়াল কুকুরও বেরুয়না। বিল্বমঙ্গল বেরুলেন। খেয়াঘাটে এলেন। কিন্তু এই জল ঝড়ে ঘাটে খেয়া নৌকা নেই। অন্ধকার রাত্রি, সামনে দুকূল প্লাবিনী বর্ষার উন্মাদিনী নদী।

বিল্বমঙ্গল সেই উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওপারে চিন্তামণির কুঞ্জে তাঁকে যেতেই হবে। সৌভাগ্যবশতঃ বিদ্যুৎ চমকালো। কালো মতো কী যেন ভেসে যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই কোন বৃক্ষকাণ্ড। বিল্বমঙ্গল ডুবতে ডুবতে কোন রকমে সেই ভাসমান বস্তু ধরে, অনেক কষ্টে ওপারে যেয়ে উঠলেন। হয়তো আবার এই ভাবেই ফিরতে হবে মনে করে, সেই বস্তুটিকে একটু টেনে তীরে তুলে রাখলেন। তখন তাঁর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই। সারা মন জুড়ে কেবল একটিমাত্র চিন্তা, কখন চিন্তামণির কুঞ্জে পৌছুবেন।

অবশেষে এক সময় ক্লান্ত দেহ নিয়ে চিন্তামণির কুঞ্জদ্বারে হাজির হলেন বিল্বমঙ্গল। কিন্তু সর্বনাশ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ দরজা খুলল না। আসলে চিন্তামণি এই জল ঝড়ের রাত্রে বিল্বমঙ্গল আসবেন না ভেবে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠ তার কানে পৌছয় নি।

তাহলে!

তাহলে কেমন করে এই সুউচ্চ পাঁচিল টপকে ভেতরে যাবেন বিল্বমঙ্গল। আকাশে বিদ্যুৎ আগের মতোই চমকাচ্ছিলো। এখানে সেখানে বাজও পড়ছিলো। সহসা একবার বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে বিল্বমঙ্গল লক্ষ্য করলেন, তাইতো একটা মোটা দড়ি ঝুলানো রয়েছে না! নিশ্চয়ই বিল্বমঙ্গল-অন্তপ্রাণা চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের জন্যই তা ঝুলিয়ে রেখেছে।

সুতরাং সেই অপরূপ রজ্জু অবলম্বন করে পাঁচিল টপকাতে দেরী হলো না

বিল্বমঙ্গলের। দড়িটায় যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে তাও বোঝার মতো মানসিক অবস্থা ছিলোনা তাঁর।

তারপর আর কি! অতরাত্রে বিল্বমঙ্গলকে এমন ভিজে কাপড়ে উদভ্রান্তের মতো উপস্থিত হতে দেখে চিন্তামণির আক্কেল গুড়ুম্। একী চেহারা বিল্বমঙ্গলের। গায়ে ওগুলোই বা কী ক্রীমী কীটের মতো। এত দুর্গন্ধই বা এলো কোত্থেকে। সবচেয়ে বড় কথা বিল্বমঙ্গল পাঁচিল টপকে এলোই বা কী করে?

কেন, চিন্তামণি যে বিল্বমঙ্গলের কষ্ট হবে বলে পাঁচিলের গায়ে দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে।

—আমি দড়ি টাঙিয়ে রেখেছি? চলতো দেখি।

আলো নিয়ে এগিয়ে যেয়ে চীৎকার করে উঠলো চিন্তামণি।

—এই তোমার দড়ি! কী সর্বনাশ একটা বিরাট বিষাক্ত সাপ ঝুলছে তাও তোমার জ্ঞান নেই। ঐ সাপ তোমাকে কামড়াতে পারতো।

স্বর্ণ বলেছিলো; না, তা নাকি পারতো না। আমি এক সর্প বিশেষজ্ঞকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যদিও একটু অস্বাভাবিকতা আছে তবে এর স্বপক্ষে যুক্তি আছে। সাপ কোন কোটরে মাথা ঢুকালে তার লেজ ধরে টানলেও তার কিছু করার ক্ষমতা থাকেনা। মাথা বের করে নাকি কামড়াতেও পারে না। বরং তার গায়ের আঁশ দিয়ে যথাসম্ভব নিজকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যদি সাপ দীর্ঘ হয় এবং প্রায় অর্ধেকটা গর্তে ঢুকে যায় তাহলে তা বেশ ভারী বস্তুও বইবার ক্ষমতা রাখতে পারে। দুর্ভাগ্যের কথা, এমন জেনেও আমি ঐরকম গর্তে ঢোকা সাপের লেজ ধরে টানার সুযোগ পাইনি।

যাই হোক, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তো থ। অ্যাঃ, তাহলে ঐ বিষধর সাপের লেজ ধরে তিনি ঢুকেছেন! কী সর্বনাশ।

কিন্তু তখনও সর্বনাশের বাকী ছিলো। বিল্বমঙ্গলের গায়ের সেই পোকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো চিন্তামণি, তুমি নদী পার হলে কী করে ঠাকুর? খেয়া নৌকা পাবার তো কথা নয়!

তা নয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ চিন্তা সত্যই খেয়া ছিল না। তবু যে

এই উন্মত্ত নদী পার হয়েছি সে শুধু তোমারই প্রেমের টানে। তবে হ্যাঁ, ভাগ্যি ভালো একটা কাঠ ভেসে যাচ্ছিলো, তাতে অনেকটা স্থবিধে হয়েছে। সেজন্যেই স্রোত ও তরঙ্গের টানে বিপদ ঘটেনি।

চিন্তামণি বললো, সেটা যদি কাঠই হবে তবে তোমার দেহে এমন দুর্গন্ধ কেন, আর তোমার গায়ে কাপড়ে এসব গুলো কী?

বিল্বমঙ্গল একটু যেন চিন্তায় পড়লেন। তাইতো কী ধরে এপারে এসেছেন তিনি। তবু বললেন, কাঠই হবে। আমি তো তা এপারে চড়ার উপরে তুলে রেখেও এসেছি।

চিন্তামণি দ্রুতকণ্ঠে বললো, চলতো দেখি কেমন কাঠ সেটা, কী ধরে তুমি এপারে এলে।

বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে নদীতীরে এলো চিন্তামণি। ঝড়বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

নদীর তীরে এসে চিন্তামণির হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার ব্যাপার। কোথায় কাঠ! এ যে একটা মরে পচে ফুলে ওঠা এক মৃতদেহ! আর এ উন্মাদ কিনা তাকেই কাঠ ভেবে নির্বিকার চিত্তে তা দিয়ে নদী পার হয়ে এসেছে। আর এযে কাঠ নয় একটা মরা, তা পর্যন্ত খেয়াল হয়নি!

কী যেন হয়ে গেলো চিন্তামণি। তার পর ধীর শান্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বললো, ছি ছি ছি, ঠাকুর আমার মত একটা গণিকার জন্য তুমি যেরূপ উন্মাদ হয়েছো, এর চেয়ে অর্ধেকও যদি তুমি ভগবানের জন্য করতে, তাহলে তোমার ভগবান লাভ হতো। তোমার মত উন্মাদ যেন আমার ঘরে আর না আসে।

এই প্রত্যাখ্যান বিল্বমঙ্গলের অন্তরে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলো। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর বিবেক বুদ্ধি জাগরিত হলো। সত্যই তো, একটি বারবণিতার জন্য একী করছেন তিনি।

বিল্বমঙ্গল আর গৃহে ফিরলেন না। সেখান থেকেই বেরিয়ে পড়লেন ভগবানের নাম নিয়ে। ঈশ্বর সাধনায়।

এমনি করে দিন যায়। বিল্বমঙ্গলকে দেখা গেলো অনেকদিন পর। সন্ন্যাসীর বেশে। এক সরোবরের সোপানের কাছে দাঁড়িয়ে জল আনতে যাওয়া এক বণিক বধূর দিকে তাকিয়ে থাকতে। জল নিয়ে ফেরার পথে

বণিকবধু সন্ন্যাসী জ্ঞানে বিল্বমঙ্গলকে তাদের গৃহে নিয়ে এলো। গৃহে এনে স্বামী স্ত্রী অশেষ যত্ন করলেন। দম্পতি আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন সন্তান কামনায়।

কী বলবেন বিল্বমঙ্গল ? তিনি কী কামনা নিয়ে এগৃহে এসেছেন !

চাইলেন দুটি লৌহশলাকা। সুতীক্ষ্ণ যেন হয়। কিছুই বুঝতে না পেরে, বণিক এনে দিলেন দুটি লোহার শলা।

বিল্বমঙ্গল সোজা সে দুটো ঢুকিয়ে দিলেন দুচোখে। একটুও হাত কাঁপলো না। একটুও বেদনার্ত হলোনা মুখ।

আতঙ্ক বিস্ময়ে বণিক বাধা দিতে যাবার আগেই এই লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটলো।

আতঙ্কে চীৎকার করে বললেন বণিক, এ কী করলেন প্রভু ?

শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে বললেন বিল্বমঙ্গল, ঠিকই করেছি। বাইরের চোখ বড় বেশী কামনা ভরা। বড় বেশী লুব্ধ করে। এ কু-চক্ষু দিয়ে আমি তোমার স্ত্রীর রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এত দাগা খেয়েও সেই পাপ প্রবৃত্তি যায়নি আমার। আমি ভণ্ড।

বণিকের বিশ্বাস হতে চায়না একথা। বলেন, প্রভু ছলনা করবেন না। বিরূপ হবেন না অধীনের উপর।

বিল্বমঙ্গল বললেন, ছলনা করবো না বলেই তো, বাইরের চোখ বন্ধ করে দিলাম। এবার দেখি অন্তর চক্ষু দিয়ে শ্রীহরি চরণ দর্শন করতে পারি কিনা।

তুমি ভাই আমার হাত দুটি ধরে পথে আমাকে বের করে দাও।

কাঁদতে কাঁদতে তাই করলেন গৃহস্বামী। আবার পথে বেরুলেন বিল্বমঙ্গল।

এরপর বিল্বমঙ্গলকে আমরা দেখি দীর্ঘসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে। এদিকে বিল্বমঙ্গলকে তাড়িয়ে দিয়ে চিন্তামণিরও ভাবান্তর হয়েছে। ঐশ্বর্য-বিমুখতা এসেছে। পার্থিব বিলাসের প্রতি উদাসীনতা এসেছে।

চিন্তামণিও বিল্বমঙ্গলের খোঁজে লোকমুখে সংবাদ পেয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়েছেন।

অবশেষে বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে চিন্তামণির দেখা হয়েছে। বিল্বমঙ্গল তখন সব কিছু পার্থিব ব্যাপারের বাইরে। সেই চরম সিদ্ধলাভের ক্ষণে তাঁর সামনে

আবির্ভূত হয়েছেন পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বিল্বমঙ্গল আমি দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলাম তোমাকে। আমাকে দর্শন কর।

বিল্বমঙ্গল বললেন, আমরা দুজনেই দেখতে পাবতো প্রভু! দুজনেই তোমার কৃপালাভ করবো তো।

পরমেশ্বর বললেন, না, তুমি তোমার সাধনার দ্বারা আমাকে লাভ করেছ। চিন্তামণির সে পুণ্যফল নেই।

বিল্বমল মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও প্রভু। চিন্তামণি আমার সাধন পথের গুরু। চিন্তামণির জন্যই আজ আমি ধন্য। আমার সেই গুরুই যদি তোমাকে না দেখতে পায়, তোমার কৃপালাভে বঞ্চিত হয়, তাহলে আমি তোমার কৃপালাভে ধন্য হতে চাইনা।

চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের পায়ে পড়ে বললো, না না আমি পাপিয়সী, আমার মুক্তি চাইবেন না ঠাকুর।

ভক্তের কাছে চির পরাজয় ভগবানের। আজও তার ব্যতিক্রম হলোনা। ভক্তবৎসল ভগবান বললেন. বিল্বমঙ্গল, তোমার বাসনাই পুর্ণ হোক্।

গল্পটি বলে স্বর্ণ বলেছিলো, এরপরও কি বলবেন বারবণিতা মাত্রেই লক্ষহীরা!

হেসে বলেছিলাম, না আর তা বলি কি করে! অন্তত, এই মুহূর্তে বলা তো নিশ্চয়ই যাবেনা।

স্বর্ণ অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলো, কেন, আমাকে খুব ভয় করেন নাকি?

কমলরাণীর বলা গল্পটাও আমি শুনেছিলান। কমলরাণীর নিজের গল্প নয়। কমলরাণীর আগের বাড়ীওয়ালীর। বাড়ীওয়ালী তখন যুবতী। বাড়ীওয়ালীও তখন হয়নি। বরং এক বাড়ীওয়ালীর অধীনে ভাড়াটে। দু টাকা পাঁচ টাকায় লোক বসায়। স্বযোগ স্থবিধা মতো বেশীও পায়। আদায়ও করে। তবে এ লাইনে পুরানো নয়।

একদিন রাত্রে তার ঘরে এলো উস্কোখুস্কো চেহারার একজন লোক।

রোগা পটকা চেহারা, একমুখ দাড়ি। পরণের কাপড়-চোপরও ভাল নয়। হাতে একটা ছোটমতো থলে। এই রকম চেহারার লোকেরা সাধারণতঃ নিচু শ্রেণীর লোক অথবা ফেরারী আসামী হয়ে থাকে বলে বাড়ীওয়ালীর ধারণা।

নতুন এসেছে তখন এ লাইনে বাড়ীওয়ালী, তেমন কিছু লাভ হবেনা ভেবে একবার ইতঃস্তত করছিলো। এদিকে সেদিন আবার আকাশের অবস্থা ভাল ছিলোনা বলেও বটে, আর মাসের শেষ বলেও বটে খদ্দের পত্রের আমদানী তেমন ছিলোনা।

লোকটা মুখে কিছু বলছিলো না। বলছিলো তার চোখ দুটো। এমন উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ বাড়ীওয়ালী এর আগে দেখেনি।

কিন্তু সে পলকের জন্য। পরমুহূর্তেই লোকটি ইঙ্গিতে বলেছিলো, সে কিছুক্ষণ বসতে চায়।

কি ভেবে শেষ পর্যন্ত ঐ লোকটাকে ঘরে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে লোকটাকে ভেতরে আসতে বললো বাড়ীওয়ালী। দরজা বন্ধ করে মুখ ফেরাতেই দেখে, লোকটা বিছানায় বসে নয়, একেবারে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে।

বাড়ীওয়ালী ভাবলো, কী ব্যাপার খুব টেনে এসেছে বুঝি। কিন্তু তাই বা কৈ। বাড়ীওয়ালীর পাশে যখন দাঁড়িয়েছিলো, নিশ্চয়ই তখন মদের গন্ধ নাকে আসতো।

বাড়ীওয়ালী দু তিনবার ডাকলো।

"ও বাবু শুনছেন? ও মশাই শুনছেন?"

কিন্তু না, কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

বোঝ ঠ্যালা! এখন সামলাও। এগিয়ে এসে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই মনে হলো গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তবে কি লোকটা অসুস্থতা নিয়েই বেরিয়েছে! তা যদি বেরুলোই তবে এখানেই বা মরতে এলো কেন? কী আপদ! এখন এই আপদ নিয়ে কী করে বাড়ীওয়ালী, আমাদের চপলামাসী? বাড়ীর কর্ত্রীকে ডাকবে, না, খিতমৎগার লোচনাকে ডেকে বের করে দেবে। ডাকতেই যাচ্ছিলো চপলামাসী। হঠাৎ পেছনে গোঙানী শুনে, চোখ ফিরিয়ে আর ডাকতে গেলোনা মাসী। বুকের জামাটা একপাশে

সরে গেছে। মুখের তামাটে রোদে পোড়া দাড়িগোঁফওয়ালা মুখ দেখে আগে বুঝতে পারেনি মাসী। এখন দেখলো, সুন্দর ধবধবে বুক। ইস্পাতের মতো নিটোল। ঝকঝকে। শক্ত। এমন লোককে তাড়াতে বাধলো চপলার।

এ লাইনে নতুন বলে, তখনও বাড়ীওয়ালী চপলামাসীর মন পাষাণ হয়ে ওঠেনি। মনের কোমল অংশটা মরে যায়নি।

কিন্তু সেই যে শুলো মানুষটা, পুরো চারদিনের আগে তার হুঁস হলোনা। আর এই চারদিন চার রাত্রি এই অচেনা অজানা লোকটার বমি কেচেছে, ঔষধ খাইয়েছে। নিজের রক্ত জল করা পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েছে।

এদিকে চপলামাসীর বাড়ীওয়ালী মুখঝামটা দিয়েছে দিনরাত।

—ঐ ঘাটের মড়াটাকে নিয়ে মাগীর যত আদিখ্যেতা। তুই কি ভেবেছিস্ ও কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর, পথ হারিয়ে তোর ঘরে এসেচে। রাজপুত্তুর না ছাই। কোন আস্তাকুড়ের ভিখারী, মরতে এসেচে এখানে। আজ রাত যেমন তেমন, কাল সক্কালবেলা যদি ওকে বের করে না দিস্ তাহলে আমি চাকর দিয়ে ওকে টেনে রাস্তায় ফেলে দেবার ব্যবস্থা করবো তা জেনে রাখিস্।

চপলামাসীর চোখ ফেটে জল পড়েছে। পড়া স্বাভাবিক নয়, তাও পড়েছে। কেঁদে বলেছে, তোমার তুটি পায়ে পড়ি মাসী, অমন করে বলোনা। বের করে দিলে কোন ভাগাড়ে মরে থাকবে কে জানে।

বাড়ীওয়ালী গলা আরও এক ডিগ্রী উঁচিয়ে বলেছে, তাতে তোর কিলো মুখপুড়ী অ্যাঁ। ও কি তোর আর জন্মের ভাতার যে ওর জন্য নাওয়া খাওয়া পরিত্যাগ করে ঘরের মাগের মতো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে? হ্যাঁ, বুঝতাম কিছু মালকড়ি আছে, তবুও না হয় বুঝতাম। তাওতো বলছিস্ সঙ্গের থলেটাও টিপেটুপে দেখেছিস্ হাল্কা।

হ্যাঁ, তা দেখেছিলো চপলামাসী। কিন্তু না, খুলে টুলে দেখেনি। কেন যে দেখেনি কে জানে।

বাড়ীওয়ালী বললো, বলি, এই যে কটা দিন ধরে বাড়াবাড়ি কচ্ছিস চপলি, লোক না বসালে খাবি কি? ভাড়ার টাকা, আমার কমিশন এসব দিবি কোত্থেকে লো?

চপলামাসী বলেছিলো, সে ভগবান ঠিকই ব্যবস্থা করে দেবেন মাসী, তুমি ভেবোনা। কিচ্ছু ভেবোনা মাসী। কেবল চাকরটাকে দিয়ে আর একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়ে দাও মাসী, জ্বরটা বোধহয় এবার ছাড়বে, ঘাম দিচ্ছে তো খুব!

বাড়ীর অন্য মেয়েরা ফিস্ ফিস্ করে একে অন্যকে বলেছে, লোকটা ওর বিয়ে করা সোয়ামী নয়তো লো! ঠিক খুঁজে খুঁজে নিজের বউয়ের কোলে মরতে এসেচে!

দু একজন একথায় সেকথায় চপলামাসীকে এ রসিকতাও করেছে। চপলামাসী ম্লান হাসি হেসেছে। কোন উত্তর দেয়নি।

পাঁচদিনের দিন সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলো লোকটা। জ্বরও ছেড়ে গিয়েছিলো। চপলামাসী একবাটি বার্লি তৈরী করে এনে খাইয়ে দিয়ে যত্ন করে গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, কেমন লাগছে এখন?

লোকটা উত্তর দিয়েছিলো, ভালো।

তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চপলামাসীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো, তুমি, আমার জন্য যা করেছো; আমার মা বোন হলে এরচেয়ে বেশী করতো না। কিন্তু একয়দিন তোমাকে না জানি কত অসুবিধেয় ফেলেছি, না জানি কত বিরক্ত করেছি, সেজন্য আমি দুঃখিত বোন।

লোকটা পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়েছিলো। এক পা এগিয়ে এসে (এটুকু আসতেই লোকটা একটু পড়ে যাবার মতো হয়েছিলো) চপলামাসীকে বলেছিলো, আর তোমার অসুবিধে ঘটাবোনা বোন, আজই আমি চলে যাবো।

- চপলামাসী জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি কি এখানেই থাকো, নাকি তুমি মফঃস্বলে থাকো।

লোকটা হেসে বলেছিলো, সব ঠাঁইই আমার ঘর, সবাই আমার আপন। আচ্ছা চলি আমি।

চপলামাসী আকুলকণ্ঠে বলেছিলো, কিন্তু তোমার শরীর তো এখনও কাহিল, বরং কাল ভাত খেয়ে তারপর যেও।

কিন্তু না লোকটা থাকেনি। কোন অনুরোধই রাখেনি। আমাদের

চপলামাসী সেজন্য কেঁদেছিলো। কীজন্য কেঁদেছিলো তা সে নিজেই জানে না। এ লোক অর্থশালী কিনা সন্দেহ আছে। এ লোক দেহবিলাসী নয় তা সে একয়দিনেই বুঝেছে তার হাল চালে কথাবার্তায়। কিন্তু পঞ্চশরের লীলাই অদ্ভুত। সে কোন রীতিনীতি ফরমুলার ধার ধারেনা।

যাবার সময় বিছানার নিচ থেকে আর একটা ছোটথলে বের করলো লোকটা। কোন ফাঁকে সেটা ওখানে রেখেছিলো লোকটা কে জানে।

মুখে বলেছিলো, তোমাকে প্রতিদান দেবার মতো কিছুই নাই আমার।

এই বলে তার ছোট থলেটা থেকে একগাছা সোনার চুড়ি বের করে বলেছিলো, আমার আর এক বোন এই চুড়িগাছা আমার পাথেয় হিসাবে দিয়েছিলো। আমার এই বোনটিকে তা আমি দিয়ে গেলাম।

চুড়িগাছা নিলে বাড়ীওয়ালী চপলামাসীর একয়দিনের ক্ষতি পুরণ হতো। চপলামাসীর বাড়ীওয়ালীর দাঁত খিচুনীর সমুচিত জবাব দেওয়া হতো। আদাড়েপাদাড়ে লোক যে তার ঘরে আসে না তার জানানি দেওয়া যেতো। অনেকদিন থেকে একটা 'আমি তোমারই' লেখা সোনার চিরুণী করার ইচ্ছে ছিলো চপলামাসীর, চুড়িগাছা ভেঙে তা করা যেতো। এমনকি চুড়িগাছা নিলে আরও সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু করা যেতো হয়তো।

কিন্তু না, চপলামাসী তা নেয়নি।

কিন্তু কৈ অন্য সময় হলে তো নিতো। মায়ের বাক্স ভেঙে সোনার গয়না চুরি করে সোজা বেশ্যাবাড়ী এসে ঢুকেছে। ক্যাশ নয় 'কাইণ্ড' দিয়ে পারিশ্রমিক (?) দিয়েছে (দ্বিজু চৌধুরী হলে বলতো, পারিশ্রমিকটা উল্টো পুরুষকে দেবার যে কবে থেকে রেওয়াজ হবে!)। চপলামাসী সে সব ক্ষেত্রে হাত পেতে নিতে তো বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখায় নি। কেউই সাধারণতঃ দেখায়ও না।

না, সব সময় যে আপত্তি করেনা তা নয়। চোরাই মাল রাখার দায়িত্ব অনেক। একটু পাকাপোক্ত মন নাহলে, শক্ত ধাত নাহলে হজম করতে সাহস হয় না। তবে একবার সাহস হয়ে গেলে আর ঘাবড়ায় না বড় কেউ। কারণ ওগুলো গালাবার পার্টি আছে। চালাবার পার্টি আছে। মস্তানরা আছে। বাঁধা খদ্দের আছে। স্যাকড়া আছে। সুতরাং টাকার চেয়ে

ঐ সব নেয়াই কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো। ছোকরা খদ্দের, আলমারী ভাঙা খদ্দের দেনা পাওনার ব্যাপারে যথাসম্ভব উদারই হয়ে থাকে। তবে পুরানো ঘুঘু যারা, তারা ন্যাকড়া বাড়ি চেনে, কেননেওয়ালা আদমী চেনে।

কিন্তু সে আর এক কেচ্ছা।

কমলরাণী বলেছিলো, বাড়ীওয়ালীমাসী মানে চপলামাসী তো কিছুতেই নেবে না। লোকটাও ছাড়বে না।

অবশেষে লোকটা বললো, আমার কথা রাখো ভাই। এতে তোমার ঋণ শোধ হবে না। কিন্তু আমার আর কিছু দেবার নেই বোন।

চপলামাসীর ছুচোখ দিয়ে জল নেমে এসেছিলো।

এর কদিন পরই চপলামাসীর বাড়ীওয়ালী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেছিলো, হ্যাঁলো চপলি, কাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলি দ্যাখগে যা!

চপলামাসী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বলেছিলো, কেন কালতো এসেছিলো যারা, তারা প্রায় সবাই তো পুরানো খদ্দের।

একজন অবশ্য নতুন খদ্দের ছিলো। বেশ নাড়ুগোপাল, নাড়ুগোপাল চেহারা। ইস্কুল ছেড়ে নাকি কলেজে ঢুকেছে। বলছিলো, কাকে নাকি ভালোবাসতো। পাশের 'বাড়ীর একটা অন্যজাতের মেয়েকে। সে মেয়েটা ভরসাও নাকি দিয়েছিলো। কিন্তু সময় মতো বাপ মায়ের কথায় সুপুত্রী হয়ে, বাপমায়ের পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করেছে। সেই 'অনুরাগে'ই তার এখানে আসা। বিশ্বের নারী জাতির উপর তার ঘেন্না হয়ে গেছে। অথচ বুঝলে মাসী, আমাদের বোধহয় 'নারী জাতি' বলে মনে করে না ওরা।

বাড়ীওয়ালী ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলো, তোর ঐ পাঁচালী রাখ্ চপলি। কালকের কথা নয়। তোকে দারোগাবাবু ইনিস্পেকটরবাবু ডাকছেন। সেই যে কদিন তোর ঘর মজিয়ে গেলো লোকটা?

চপলা মাসী আতঙ্কে চমকে উঠে বললো, হ্যাঁ, তাই কি? কী হয়েছে তার? কী করেছে সে!

—আর, কী করেছে! সেই লোকটা নাকি একজন নামকরা স্বদেশী-

ওয়ালা। জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে। দমাদম পিস্তল বোমা ছুঁড়তে ওস্তাদ। ওরে বাবা, আমি কোথায় যাবো গো! এমন লোককে না কি. তুমি চার চারদিন ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলে বাছা! ওরে বাবা, আমার এখন কী হবে গো। তা বাছা, যাও ঠ্যালা সামলাওগে এখন! বুড়ো হাবড়া আমাদের কথা তো তোমরা শুনবে না!'

চপলামাসীর মনে পড়লো, লোকটা জ্ঞান ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলো, কেউ তাকে খুঁজেছিলো কিনা?

চপলামাসী বলেছিলো, কে খুঁজবে? কোন বন্ধু?

লোকটা বলেছিলো, বন্ধু, তা বন্ধুই বলতে গেলে।

সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার চক্ষু দুটো এক পলকের জন্য কেন যেন জ্বলে উঠেছিলো।

আজ চপলামাসী বুঝতে পারলো, বন্ধু বলতে কাদের কথা বলেছিলো লোকটি। আর তার চোখ দুটোই বা অমন জ্বলে উঠেছিলো কেন?

এরপর ইনস্পেক্টরবাবু, দারোগাবাবু তন্ন তন্ন করে চপলামাসীর ঘর তল্লাশ করেছিলো। হাতের ছাপ নখের ছাপের সন্ধান করেছিলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো চপলামাসীকে। ওঃ, সে কী জেরা। বাপের নাম ভুলিয়ে দেবার মতো জেরা।

লোকটার চেহারা কেমন? উচ্চতা কত? নাকের ডান পাশে লাল জড়ুল ছিলো কিনা? ডান হাতের নিচে একটা ক্ষত চিহ্ন ছিলো কি? কী বলতো! কোথায় গেলো এ সম্পর্কে কিছু বলেছিলো কিনা? জ্বরের ঘোরে কোন কথা বলেছিলো কি? কী কথা! এমনি হাজারো প্রশ্ন। হাজার সন্দেহ। প্রতিটি উত্তর হাজার কিলোওয়াট-এর রিসিভার দিয়ে ধরার চেষ্টা যেন। খুনীর গায়ের গন্ধ ধরে যেমন ব্লাড হাউণ্ডের অগ্রগমনের প্রচেষ্টা।

কিন্তু না, চপলামাসীর এক কথা, সে তাকে জানে না। সে কোন কথাই বলেনি। জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিলো, তারপর জ্বর ছাড়তেই পগার

পার। তবে হ্যাঁ, চারদিন ছিলো একথা সত্যি। দারোগাবাবু নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেছিলেন, ওঃ, একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছু করতে পারলাম না স্যার!

দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন। ইন্‌সপেকটর বাবু বলেছিলেন, সুস্থ থাকলে, দশবিশটা পুলিশকে থোড়াই কেয়ার করে বটে, কিন্তু এবার সে অসুস্থ ছিলো, চার চারটে দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলো। আর আমরা কিনা কোথায় কোথায় চষে বেরিয়েছি। একবারও সন্দেহ করিনি, অমন শরীর নিয়ে অমন জলঝড়ের রাতে সাত মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে এসে উঠেছে।

তারপর আর একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলো, তার কোন জামা কাপড় রুমাল টুমাল কিছু ফেলে গেছে কিনা?

চপলা মাসী উত্তর দিয়েছিলো, কিছু ফেলে যায়নি হুজুর। কিচ্ছু না!

চুড়িগাছার কথা চপলা মাসী বলেনি। বুক দুরদুর করলেও ফাঁস করেনি।

ইনস্পেক্টর বাবু বলেছিলেন, বুঝলে সামন্ত, অসুস্থ শরীর নিয়ে নিশ্চয়ই বেশী দূর পালাতে পারবে না। এ পাড়াটা তন্নতন্ন করে খোঁজো। আর এ পাড়ার সব ক'টা দালালকে থানায় ডেকে পাঠাও। এ পাড়ার ইনফরমার গিয়াসুদ্দিন বেটাকেও তলব দাও। ব্যাটাকে আমি একহাত নোব। এক্ষুনি সব কর। মনে রেখো, বিপ্লবী অরিন্দম সরকারকে ধরতে পারলে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কারই শুধু নয়, প্রমোশন একেবারে বাঁধা। যেমন করে পারো ধরা চাই-ই।

কিন্তু না, সে যাত্রায় নাকি তারা নাগাল পায়নি বীর বিপ্লবী অরিন্দম সরকারকে।

চপলা মাসী তুলসী তলায় মাথা খুঁড়তো গোপনে। আহা, আগে যদি জানতেম তুমি এমন লোক, তাহলে এমন দেবতাকে সেবা করার সুযোগের কি এমন অপব্যবহার করতাম।

চপলা মাসী সেই চুড়িগাছা ভাঙেনি; বিক্রীও করেনি। এখনও সেটা মাসীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডে অক্ষয় হয়ে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে আর একটি

নাম। সে নাম, সেই বীর বিপ্লবীর। কিন্তু আর কোনদিন তাঁর সংবাদ মাসীর কানে আসবে না।

দালালী ধরেছিলো দ্বিজু চৌধুরী। শুধু গানের মাষ্টারী করে পেট চলতো না। বাবু ধরে আনতো, কমিশন পেতো। মদ গাজা ভাঙের ভাগ পেতো। কোকেন দেওয়া পানের ভাগও কোন কোন সময় পেতো না তা নয়। আবার দরকার হলে, ডাকলে ডুকলে তবলা বাজাতো। ফাই-ফরমাসও খাটতো। কোন সময় বাবুর, কোন সময়ে বিবির। তবে ওসব করাতে হলে, দু এক পাত্তরের লোভ দেখাতে হবে। নইলে শর্মা দ্বিজু চৌধুরী কারও পোষ্যপুত্র নয়, হ্যাঁ।

এমনি করে এবাড়ী সেবাড়ী যাওয়া আসা করতে করতেই এক বাড়ীতে আঙ্গুরবালার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো। হ্যাঁ সেই আদি অকৃত্রিম আঙ্গুরবালা। দ্বিজু চৌধুরীর বিয়ে করা ইস্তিরী। সাতপাকে বাঁধা বউ।

আঙ্গুরবালাও দ্বিজু চৌধুরীকে দেখেছিলো। কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে। লেখকদের তো ঐ এক বিপদ মশাই! সব ঘটনার সুতো আস্তে আস্তে বুনে তুলতে হয়। একবারে লাফিয়ে জালে কাঠি পরাবো তার উপায় নেই। বড় বড় কর্তারা পারেন।

সুতরাং আমাকে আঙ্গুর ফলের কাহিনীই আগে বলতে হচ্ছে।

সেই যে শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমান দ্বিজু চৌধুরীর ঘর ত্যাগ করে (ঘরই বটে! বরং ঘড়া বলা চলে। একটি দড়ি হলে যে ঘড়া নিয়ে জলে ডুবতে ইচ্ছে করে।) শ্রীল শ্রীযুক্ত ভাগ্নেবাবু ওরফে সুধু চন্দ্রের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তার পরের কাহিনী। যে অবস্থায় ভাগ্নেবাবু আঙ্গুরবালাকে নিয়ে গিয়েছিলো, তাকে অশুদ্ধ ভাষায় পিরীত বললেও শুদ্ধ ভাষায় প্রেমই বলে। এরকম প্রেমের পর সুখে ঘর কন্না করেছে, করছে এমন নজির কম নয়।

দ্বিজু চৌধুরীর দলের এক মহিলাই তার নৃত্যসুন্দর স্বামীর দুর্ব্যবহারে অতীষ্ট হয়ে, পূর্বপ্রণয়ী, না পূর্ব প্রণয়ীও নয়, দাদার বাবুর সঙ্গে সঁকন্যা বেরিয়ে এসে বিয়ে থা করে সুখে ঘর সংসার করছে। ছেলে পিলেও হয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এখনও স্বামী-স্ত্রী এক অফিসেই চাকরী

করে। অবসর সময়ে গান গায় এখানে সেখানে। সুখেই আছে।

কিন্তু না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। সুখ নেই আঙ্গুর বালার কপালে। আঙ্গুরবালা তো প্রেমের পাত্রী ভাগ্নে-বাবুর। পিরীতের মেয়েমানুষ মাত্র। সে পিরীত নতুন পুতুলের কাঁচা রঙের মতো। জল লাগলেই রঙ্ ধুয়ে, বীভৎসতা বেরিয়ে পড়ে। পড়েও ছিলো।

বছর খানেক আঙ্গুরবালাকে রেখেছিলো ভাগ্নে বাবু! প্রথম প্রথম আদর সোহাগেই রেখেছিলো।

মাৎসরে, পোনাওরে, হ্যানরে, ত্যানরে কতকিছু। কেবল শিল্পী হবার সুযোগটা আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে যা পিছিয়ে যাচ্ছিলো।

কিন্তু কর্ম তো নাকি কর্তারই ইচ্ছেয়। সুধু ঘোষ প্রতিদিনই একবার করে স্তোক দিতো। এই, আজ বাসন্তী-অপেরা, কাল জয়ন্তী অপেরায় ঢুঁ দিলুম। নিজদের কোম্পানীতে তো আর নিয়ে তোলা যায় না। সেখানে ব্যাটা আয়ান ঘোষ রয়েছে যে! সুধু ঘোষই আর যায়না সেখানে, তা আঙ্গুরবালা! এমনি করে পাঁচ ছ' মাস যায়। আঙ্গুর তখন অন্তঃসত্ত্বা। একদিন ঐ প্রস্তাব করতেই, সুধু ঘোষ মুখ খিঁচিয়ে কুৎসিৎ কণ্ঠে বলে উঠলো, ইয়ের পার্ট থাকলে তো দেবে। তা না হয় তাই বলি। মাগীর যেন আর তর সইছে না চেহারা দেখাবার।

সেই দিন দ্বিতীয়বার স্বপ্নভঙ্গ হলো আঙ্গুরবালার।

কিন্তু তখনও আরও অনেক কিছু দেখার বাকী ছিলো আঙ্গুরের। সুধু ঘোষকে জানার যেটুকু বাকী ছিলো তাও জানা হয়ে গেলো।

পর দিনই লোক নিয়ে এলো সুধু ঘোষ। কিন্তু তার আগের দিন রাত্রে আবার আগের মতো ভালমানুষ।

তখন মাথার ঠিক ছিল না। দাতুর সাথে মন কষাকষি চলছে। আঙ্গুরবালাকে যে কুৎসিৎ কথা বলেছে সেজন্য আঙ্গুরবালা যেন কিছু মনে না করে ইত্যাদি।

আঙ্গুরবালা প্রথমে মান করেই ছিলা। কিন্তু মেয়ে মানুষের মান, একটু আদর সোহাগেই ভুলে যায়। বিশেষ করে এমন অবস্থায় কি করতে পারে আঙ্গুরবালা। যদিও এখনও সারা গায়ে জানান দেয়নি, তবু তো সে সন্তান

ধারণ করতে চলেছে। আর সে সন্তান ঐ সুধু ঘোষেরই। এখন কি তার ঐসব ধরলে চলে।

সুতরাং আপোষ হয়ে গিয়েছিলো। প্রেম ভালবাসায় কথাবার্তা হয়েছিলো। অনেক হৃদয় বিদারক কথাবার্তা চলেছিলো। দাম্পত্য কলহ, তা দাম্পত্য বৈকি, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হয় এতো জানা কথা! কথা হলো পরদিনই অমরাবতী অপেরার বড়বাবুকে নিয়ে আসবে সুধু ঘোষ বাসায়। আঙ্গুরবালা যেন একটু সেজে গুজে থাকে, সেই মুর্শিদাবাদ শাড়ীখানা পরে। আর একটু যেন আদর যত্ন করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলো, আদর যত্ন না করলে কি আর আজকালকার এই সব দেবতারা তুষ্ট হন! বড় হতে চাওতো, আদর যত্ন কর! তা তোমার ঐ সিনেমার লাইনই বল, আর অন্য লাইনই বল।

কিন্তু তখনও কি জানতো আঙ্গুরবালা আদর যত্ন বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলো সুধু ঘোষ! বড়বাবু যা বলেন মন দিয়ে শোনো, আখেরে কাজ দেবে, একথারই বা অর্থ কী!

পরদিন সন্ধ্যার পর বড়বাবুকে নিয়ে এলো সুধু ঘোষ। বড়বাবুই বটে। কলপ দিয়ে কালো করা চুল। অত্যাচার জর্জ্জরিত চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। কুচিয়ে পরা ধুতি। গিলে করা পাঞ্জাবী। গায়ে ভুরভুরে আতরের গন্ধ। চেহারা বছর পঞ্চাশেকের উপর।

আঙ্গুরবালা বিকেল থেকেই সেজেগুজে বসেছিলো। সুধু ঘোষের নির্দেশ মতো পাতলা শাড়ীখানা পরেছিলো। গলাকাটা হাতকাটা ব্লাউজ গায় দিয়েছিলো। চুড়ো করে চুল বেঁধেছিলো।

বড়বাবু ঢুকেই বলেছিলেন, বাহ্ হিরোইন হবারই তো উপযুক্ত হে ঘোষ। আমি তো এতটা আশা করিনি হে!

সুধু ঘোষ বলেছিলো, আজ্ঞে এখন আপনার দয়া। যদি একটা রোলে চান্স দেন। তাছাড়া শুনেছি সিনেমা লাইনেও আপনার হাত আছে।

এক ঝলক মদের গন্ধ উগরে বলেছিলেন বড়বাবু, সে তোমাকে ভাবতে হবে না ঘোষ। আমাকে খুশী করতে পারলে, সবই হবে। তোমারও। হবে

আবার সেই খুশী করার ব্যাপার!

বড়বাবু বললেন, চা তো খেলাম, এবার একটু এ্যাকটিং দেখিয়ে দাও তো দেখি। কেমন গলা, গলার দানা কেমন, ফ্রীনেস্ কেমন এসব একটু দেখে যাই!

তাই দেখতেই নাকি আসা বড়বাবুর। বড়বাবু হবার ঝামেলাই তো এখানে।

সুতরাং বড়বাবুর ডানদিকের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বেরুলো। কী? না, পরবর্তী বইয়ের একটা সীন।

একজন নারী ও একজন পুরুষ। পুরুষ আবার বয়োবৃদ্ধ। তা হোক, শুধু ঘোষকে চালানো যাবে।

নাও, আরম্ভ করা যাক্। বড়বাবু প্রম্প্ট করতে লাগলেন।

বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যাভিচারী জমিদার এক প্রজার কন্যাকে বলপূর্বক আটকে রাখবেন, মেয়েটি নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য তাঁর বাহুবন্ধন ছিন্ন করে পালাতে চেষ্টা করবে। এমনকি জমিদার বাবুকে মরিয়া হয়ে ঘা কতক বসাবেও।

সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে আঙুরবালাকে গরীব প্রজার কন্যার ভূমিকায় নামার জন্য কেবল মাত্র একটি কাপড় পরেই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হলো। কিন্তু অভিনয়ে তেমন ফীলীংস্ এলোনা যেন। অন্ততঃ বড়বাবুর মতো একজন রসবোদ্ধার কাছে।

অথচ কথা যখন দিয়েছেন বড়বাবু, তখন যেভাবেই হোক, আঙুরকে তো তৈরী করতেই হবে। সুতরাং সে সম্পর্কে আজকের মতো এমন শুভ তিথি নক্ষত্র আর কোথায়! কাজে কাজেই শ্রীমান ভাগ্নে বাবুকে বলতে হলো, আপনি বরং নিজে ও-রোলটা করুন বড়বাবু আমি বরং আপনার জন্যে একটু মিষ্টি টিষ্টি নাহোক নোনতার ব্যবস্থা দেখি। মিষ্টির সঙ্গে তো আবার ঐ সবের নাকি ভাদ্রবধূ সম্পর্ক।

ভাগ্নেবাবু বেরিয়ে গেলেন। এবার শ্রীমতী আঙুরবালা বড়বাবুর নির্দেশ মতো এগিয়ে এলো। বড়বাবু ব্যাভীচারী জমিদারের মতো সজোরে আকর্ষণ করে আঙুরকে একেবারে বুকের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে এলেন। পেটে চোট লাগবে বলে আঙুর বাধা দিতে যেয়েও বাধা দিতে পারলোনা। বসনও সামলাতে পারলোনা।

তবু নাট্যাংশের নির্দেশমতো সে ছাড়িয়ে আসতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু এবার কিতাক বহির্ভূত সংলাপ বেরুলো জমিদার বাবুর মুখ থেকে। ত্রিশ টাকায় আরও বেশী করে কিন্তু অঙ্গে বুকে লেপ্টে আসে ডারলিং!

বলেই একেবারে সজোরে আঙ্গুরবালার বিস্ফারিত অধরে চুম্বন করলেন। কে জানে নাটকে ঐ রকম নির্দেশনা ছিলো কিনা!

আঙ্গুরবালা ছিটকে দূরে সরে এলো। তারপর বড়বাবুর উদ্যত থাবা থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা রুটি বেলা বেলন তুলে বললো, আর একপা এগুলে এইটে আপনার মাথায় ভাঙবো জমিদার বাবু, সাবধান!

বড়বাবুর মাথা দুর্ভাগ্যক্রমে বেলনের বাড়ি খাবার মতো শক্ত নয়। আর নাটক বহির্ভূত হলেও, অভিনয়টি এত ন্যাচারেল যে বড়বাবুও বেশ একটু হকচকিয়ে গেলেন বৈকি?

পরক্ষণেই চীৎকার করে ডাকলেন, এই ব্যাটা ঘোষ, এই কথা ছিলো নাকি অ্যাঁ। শালা নগদ ত্রিশ টাকা নিয়ে 'ব্রীচ্ অব ট্রাষ্ট'!

ভাগ্নেবাবু এক পলক পর্দা ঠেলে মাথা গলিয়েই মাথাটা বের করে নিলো। ওরে বাবা এযে একেবারে জবরদস্ত অ্যাক্‌টিং।

সেই ভাগ্নেবাবুর শেষ আবির্ভাব। তারপর আর তার টিকি দেখতে পায়নি আঙ্গুরবালা।

আবার সেই দাঁতে দাঁত চেপে অনাহারের রিহার্শেল।

বাড়ীওয়ালী সহানুভূতি সম্পন্না। বললেন, তা বাছা, তুমি তো আর ওর বিয়ে করা বউ নও। ন্যাকামীকরে আর লাভ কী। আমি তো সবই জানি। অত সতীপনা দেখালে কি চলে বাছা। তাও হতো যদি সোয়ামীর ঘর ভেঙে না আসতিস্। তার চেয়ে যা বলি শোন্। পেটের কাঁটাটা খসিয়ে আমাদের লাইনে আয়। আমাদের এখানে তো প্রকাশ্যে বেবুশ্যেপনা চলবেনা। আমরা হলেম হাফগেরস্ত।

হাফগেরস্ত কথাটা সেদিন প্রথম শুনেছিলাম। অনেক পরে, হাফগেরস্ত সম্পর্কে আরও অবশ্য কিছু শুনেছি। জেনেছি। সে এক এলাহি কাণ্ড।

বাইরে থেকে কিছুটি বোঝার উপায় নেই এদের দেখে। একেবারে ভদ্দর

লোকের ঠাঁট চলা চলতি। সোয়ামী পুত্তুর, মেয় বউ নিয়ে সংসার। কিন্তু রোজগেরে লোকের সংখ্যা কম। সুতরাং রাতের বেলা দিনের বেলা বাড়তি রোজগারপাতি। স্বামী জানে স্ত্রীর কাণ্ডমাণ্ড। বাপ জানে মেয়ের কাণ্ড। কিন্তু সবাই জানিনে জানিনে ভাব 'পরকাশ'।

ফলে দেড়শ' টাকা রোজগেরে মানুষের কন্যেও একশ' টাকা দামের শাড়ী পরলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সপ্তাহে পাঁচদিন সিনেমা দেখতে গেলেও চমকাবার উপায় নেই। ছোড়দা, মেজদা, রাঙাদা, পাড়াতুতদাদার ভিড়ে বাড়ী গমগম করবে। সেজেগুজে একা একা বাড়ীর মেয়েরা যখন তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাইরে বেরুবে। শেষ শো'তে সিনেমা রেস্তোরাঁ করে রাত বারটা একটায় বাড়ী ফিরবে।

অভিভাবক একটু আধটু লোক দেখানো গালমন্দ যে না করবে তা নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাপ ভাইও জানে ঐ বাড়তি রোজগারটুকু না থাকলে সংসারে হাড়ি চড়বেনা দুবেলা। লোকলৌকিকতা চলবে না। সমাজে তথাকথিত ভদ্র পরিচয় দেওয়া যাবে না। সব সময় যে বউ মেয়ে স্বেচ্ছায় এ পথে পা দেয় তা নয়। অনেক সময় অভিভাবক নিজেই খদ্দের জোগাড় করে আনে। নিজে বাবা বাছা করে পছন্দমত শীকার ধরে এনে বাড়ীর সোমত্ত মেয়ে, বউয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়। পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে এক পাষণ্ড বাপের এই রকম এক কাহিনী বেরিয়েছিলো। এক পার্কের অন্ধকারে দূরে অবস্থানরত পিতার চক্ষুর উপরে কন্যা এই রকম এক শিকারীর কাছে দেহ বিক্রয় করছে।

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, এক চায়ের দোকানে খেতাম কিছুদিন। দু একদিন পর পরই দেখতাম, পাড়ারই একটা ফুটফুটে বাচ্চা চায়ের দোকানের এক খদ্দের, ব্যক্তিগত জীবনে এক নিম্ন পর্যায়ের, অবাঙ্গালী দুধওয়ালার কাছে ফিসফিস্ করে কী চাইতো। চাইতো টাকা। মুখে বলতো, অমুকদা বাবা পঁচিশটি টাকা চেয়েছে। অমুকদা বাবা দশটা টাকা চেয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতাম, দুধওয়ালা কুৎসিৎ চেহারার সেই লোকটা প্রতিবারই টাকা দিতো। পঁচিশ চাইলে যে সব সময় পঁচিশই দিতো তা নয়। কিন্তু দিতো। কিন্তু কেন যে

দিতো তা তখনও বুঝতাম না।

বাচ্চাটার বাপের অবস্থা যে বেশী ভাল নয় তা জানতাম। কিন্তু এই লোকটাই বা যখন তখন টাকা ধার দেয় কেন তা জানতাম না।

জানলাম আরও কিছুদিন পর। যেদিন ঐ বাচ্চার এক নম্বর বোনটি দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। কুমারী মেয়ে। বয়স কুড়ি পঁচিশের কম নয়। দেখতে শুনতেও ভালো।

কিন্তু তবু মেয়েটা আত্মহত্যা করলো কেন? কেন করলো তা শোনা গেলো আরও পরে। পুলিশী হাঙ্গামা মিটে যাবার পরে। মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। আর সেজন্য দায়ী ঐ দুধওয়ালা অবাঙালীটি।

এই হাফগেরস্তরা অন্য উপায়েও রুজি রোজগার করে থাকে শুনেছি।

কমলরাণী বলতো, এই হাফগেরস্তদের জন্য আমাদের খদ্দের পাতি কমে যাচ্ছে। আর কমে যাচ্ছে ম্যাসেজ হোমগুলোর জন্য।

হাফগেরস্তদের ব্যাপার না হয় বুঝি। কিন্তু ম্যাসেজ হোমগুলো কী দোষ করলো তা বুঝিনি।

বরং যতদূর জানি, ম্যাসেজ ক্লিনিকগুলোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শরীর ও মনের শুশ্রূষা করা হয়। দেহের পুষ্টিসাধন করা হয়। আর সেখানে যারা কাজ করে তারা এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

কমলরাণী হেসে বলেছিলো, সে হচ্ছে দু'দশটা ক্ষেত্রে। দেখেননি এই কোলকাতাতেই শ'য়ে শ'য়ে ম্যাসেজ ক্লিনিক খোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। কোলকাতায় তখন দুটো জিনিস প্রায় প্রতি পল্লীতে দেখা যেতো, একটা হচ্ছে চীনা ডাইং ক্লিনিং আর একটা হচ্ছে ম্যাসেজ বাথ।

এইসব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ম্যাসেজ ক্লিনিকগুলোর অধিকাংশ স্থানেই অঙ্গ-সংবাহনের নামে অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি চালানো হতো। অধিকাংশ ম্যাসেজ ক্লিনিকের পরিচালকের কোন ডাক্তারী ডিগ্রী নেই। থাকলেও অবশ্য তেমন কিছু যেতো আসতো না। কারণ নামের শেষের ঐ সব ডিগ্রী সত্য সত্যই তারা অর্জন করেছে কিনা এ বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে। আর ট্রেণ্ড নার্সদের কথা বলছেন? ওখানকার অধিকাংশ নার্স সাপ্লাই হতো আমাদের পল্লীর মতো সব পল্লী থেকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলাম, বল কি?

কমলরাণী বলেছিলো, আজ্ঞে হাঁ্যা। এই যে আমার পাশের ঘরের পাশের ঘরের মেয়েটা, ওর নাম বেবী। বেবিকেতো আপনিও দেখেছেন। ঐযে যার মেয়েটা খুব ফর্সা দেখে আপনি একদিন চমকে উঠেছিলেন। ও আসলে ইচ্ছে করেই যুদ্ধের সময় এক সাহেবকে ঘরে বসিয়েছিলো। ওর ঐ মেয়ে সেই সাহেবের বেটি। আপনার ঐ দ্বিজু চৌধুরী বলে—জানেনা না, বড় হলে অনেকের মাথা ঘোরাবে মেয়েটা।

মনে পড়লো। হঁ্যা, বেবি নামের মেয়েটাকে আমি দেখেছি। বছর ত্রিশেক বয়েস হবে। দেখতে বেঁটে মতো। তবে শরীরের গঠন ভালো।

`কমলরাণী বললো, ঐ বেবি বউবাজারের এক ম্যাসেজ ক্লিনিকে চাকুরী করতো। নার্স। পোষাক আষাক সব কিছুতে ফিটফাট। এখনও লক্ষ করে দেখবেন, মেয়েটা তেমন সাজগোজ করেনা, কিন্তু সব সময় ফিটফাট থাকে। কোন কিছু নাড়াচাড়া করলো কি এটা ওটা মুছলো, অমনি হাতে সাবান দেবে। ওর ঘরে এক ছিটে ময়লা পাবেন না।

বললাম, ম্যাসেজ ক্লিনিকের কথা বল ?

কমলরাণী বললো, হঁ্যা, বেবি যে ম্যাসেজ বাথে চাকুরী করতো, সেখানে আরও অনেক মেয়ে চাকুরী করতো। আমি তো জানি বেবি নার্সিংএর কোন পাঠই নেয়নি। নিতেও হয়না ওদের। তবে পুরুষ ভোলাবার ট্রেনিংতো আমরা এখান থেকেই পেয়ে থাকি। এতো আমাদের অশিক্ষিত পটুত্ব।

ঐ সব ম্যাসেজ বাথে যারা আসেন, তাদের অনেকেই ভাবের ঘরে চুরি করতেই আসেন। আমাদের পাড়ায় অনেক শুচিবাইগ্রস্ত দেহকামীতো লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে আসতে পারেন না। তারা ঐ সব ম্যাসেজ বাথে যায়। এ সম্পর্কে তাদের অনেকের ধারনা, প্রথমতঃ, ওখানে যারা কাজ করে, তারা চৌদ্দ হাত ফেরতা নয়। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ট্রিটমেণ্টএর নামে ধোঁকা দেওয়াও সোজা। কোথায় যান ? না, বেশ্যাবাড়ী চলচি। একথা শুনতে কেমন লাগে ? কিন্তু যদি বলে, 'এই একটু ম্যাসেজ নিতে যাচ্ছি'।

ব্যস্, তাহলে আর কোন দোষ নেই। বরং বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব আসবে শ্রোতার। ম্যাসেজ বাথে যারা যায় তাদের আর একটা সান্ত্বনা, বেশী পয়সা লাগে বলে, রাম! শ্যামাদের ভিড় নেই।

বেবিদের ম্যাসেজ ক্লিনিকে প্রতি পাঁচ মিনিট ম্যাসেজ নিতে হলে পাঁচ টাকা দিতে হতো। কিন্তু পাঁচ মিনিটের ম্যাসেজ অনেক তথাকথিত রোগীর (?) চলবে কেন ? ফলে পাঁচ মিনিট অনিবার্য কারনেই দশ মিনিট, পনেরো মিনিটে দাঁড়াতো। দাঁড়াও, আরও যারা বেশী রোগী (?), পয়সাওয়ালা রোগী অবশ্য ; তারা আরও বেশী সময় নেয়। ম্যাসেজ নিতে এসে অত ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকানো কি ভালো। না তাতে খদ্দের সম্পর্কে ক্লিনিকের মালিকের ধারনা ভালো থাকে !

এই যে পাঁচ মিনিটকে পনেরো মিনিট করার কায়দা, এটা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা এই সব তথাকথিত নার্সদের কৃতিত্ব।

বেশীক্ষণ খদ্দের আটকে রাখতে পারলে স্বাভাবিক ভাবে ম্যাসেজ ক্লিনিকের বেশী রোজগার। সুতরাং যে নার্স (?) যত বেশীক্ষণ খদ্দের আটকে রাখতে পারবে তার তত বেশী সুনাম। চাকুরীর নিরাপত্তা। বেশী মাইনে, বেশী কমিশন।

একবার বেবিদের ওখানে এক কাণ্ড ঘটলো। এ ধরণের ঘটনা পত্রিকায়ও বেরুত। একবার এক পুরোনো খদ্দের এসে বায়না ধরলেন, তার কম্পার্টমেণ্টে যেন একজন নতুন কাউকে পাঠান হয়।

তাই পাঠান হলো। মাত্র কয়েকদিন আগে এক রিফ্যুজি মেয়ে অন্য কোন কাজ না পেয়ে ম্যাসেজ ক্লিনিকে চাকুরী নিয়েছে। নার্সিং একটু আধটু জানে। দেখে শুনে মালিক চাকুরী দিয়েছে। কাজ টাজও অন্য নার্সদের কাছ থেকে যেন শিখে নেয় একটু। আর হেড নার্সের কাছ থেকে যেন ডিউটি বুঝে নেয়।

ভালকথা। শিখে নিলো মেয়েটি। লজ্জা টজ্জা যেন না করে। খদ্দের যেন আচার ব্যবহারে খুশী হয় এই আরকি ?

খদ্দের আসবে জামা কাপড় এপার্টমেণ্টেই ছাড়বে। একটা লম্বা তোয়ালে তার হাতে দিতে হবে। তিনি তা ফেরতা দিয়ে পরবেন। তারপর উঁচু করে পাতা গদিওয়ালা টেবিলে শুয়ে পড়বেন। নার্স তাকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ম্যাসেজ করবে। বেশ হাসি খুশী, ফিটফাট থাকবে। লক্ষ্য থাকবে পাঁচ মিনিটের ম্যাসেজ যেন পনেরো মিনিট অন্ততঃ

নিতে ইচ্ছে জাগে খদ্দেরের। এ আর কঠিন কি? প্রথম প্রথম কঠিন মনে হলেও দু' দশদিন গেলে রপ্ত হয়ে যাবে। সবারই যায়।

কিন্তু সে মেয়েটির খদ্দের পাঁচ মিনিটের আগেই মালিককে নালিশ করে গেলো, নতুন নার্সটির ব্যবহার একেবারে 'কোল্ড'। বড় বেশী যান্ত্রিক।

একটু পরেই ডাক পড়লো মালিকের ঘরে।

মেয়েটি এসে হাজির হলো। মালিক খুব করে বকলেন মেয়েটাকে। এসব কী শুনছি। কাষ্টমার এতবড় ঐতিহ্য সম্পন্ন ম্যাসেজ ক্লিনিকের নার্স সম্পর্কে কমপ্লেন করে গেলেন। মেয়েটি বাধ্য হয়ে মুখ খুললো।

লজ্জার মাথা খেয়ে বললো, কী করবো বলুন, ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই কোথায় ম্যাসেজ নেবেন তা নয়। তার বদলে আপত্তিকর কথা, আপত্তি-কর আচরণ করতে চায়।

নার্সটি অনেক কষ্টে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে।

কাহিনী শুনে অন্য নার্সরা মুখ টিপে হেসেছে। মালিক বলেছেন, আমি ওসব কথা শুনতে চাইনে। খদ্দেরকে খুশী করা তোমার ডিউটি। খদ্দের যা চাইবে, তাই করতে হবে বৈকি? অত সেন্টিমেন্টাল হলে কি এখানে চাকরী চলে! না, এরকম করলে ক্লিনিকের 'গুডউইল' বজায় থাকে।

এরপর সেই খদ্দেরের সঙ্গে মেয়েটিকে আবার ঘরে যেতে নির্দেশ দেয় মালিক।

মেয়েটি মরিয়া হয়ে বলে উঠে, তার আত্মসম্মান বোধ আছে। সে আর এখানে চাকরী করবে না।

বললাম, বাঃ, খুবই সৎ সাহস তো মেয়েটার!

কমলারাণী হেসে বলেছিলো, হ্যাঁ, প্রথম প্রথম দু একজন এরকম সাহস দেখায় বৈকি। কিন্তু বাড়ীতে হাড়ি না চড়লে, তারাই রেষ্টোরেন্টের সেলস্ গার্ল হয়, ম্যাসেজ ক্লিনিকের নার্স হয় অন্য উপায় না পেয়ে।

বললাম, এ মেয়েটির পরিণাম জান কমলরাণী।

কমলরাণী হেসে বললো, জানি বৈকি? বেবি বলেছিলো, মেয়েটি তিন চারদিন পর নিজেই আবার ফিরে এসেছিলো। এর পর নাকি তার ম্যাসেজ নিতে এসে কোন খদ্দের আধঘণ্টার আগে কম্পার্টমেণ্ট থেকে

বেরুতো না। আরও পরের কাহিনীও শুনেছি রেবীর মুখে, শেষ পর্যন্ত নাকি মেয়েটি অনেক কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে ম্যাসেজ বাথ থেকে বিতাড়িত হয়।

সবশেষে কমলরাণী বলেছিলো, সরকার এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে বহু ম্যাসেজ ক্লিনিক তুলে দিয়েছে। ঐ সময় যে সব কেচ্ছা বেরুত খবরের কাগজে, পত্র পত্রিকায়, তার কোন কোন কাহিনী আমাদের পাড়াকেও লজ্জা দেয়।

আঙ্গুরবালাকে এ পাড়ায় দেখে বিস্মিত হয়নি দ্বিজু চৌধুরী। এতদিন এ পাড়ায় ঘুরে তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিলো। একবার চেনা পথ হারালে মানুষ যেমন কুপথ বিপথে ঘুরতে থাকে এবং ভাগ্য ভালো না থাকলে যেমন আর চেনাপথে ফিরে আসতে পারেনা, বারবণিতাদের সম্পর্কেও একথা পুরোপুরি খাটে। একবার পা পিছলে পড়লে, অথৈজলে হাবুডুবু খেতে হবেই। সাঁতার জানা না থাকলে তো কথাই নেই।

আঙ্গুরবালাও হাবুডুবু খেয়েছিলো। আঙ্গুরবালাও আর চেনা পথের চেনা রেখা খুঁজে পায়নি।

হাফগেরস্ত বাড়ীওয়ালীর ওখানে বেশীদিন টিঁকতে পারেনি আঙ্গুরবালা।

বাড়ীওয়ালী অবশ্য জপিয়ে জাপিয়ে আঙ্গুরবালাকে 'দিক্ষিত' করে নিয়েছিলো। তারই পরামর্শে কী সব খেয়ে পেটের কাঁটাটিও খসাতে পেরেছিলো।

বাড়ীওয়ালী বলেছিলো, ত্যাখ বাছা, যে ব্যবসার যে রীত্। যে বাপ লাথি মেরে চলে গেছে, তার বোঝা বয়ে সারাজীবন ধুঁকে ধুঁকে মরবি ছুঁড়ী! আর একবার শরীর ভাঙলে, বুক ভাঙলে খাবি কী করে।

আঙ্গুরবালা সহজে রাজী হয়নি।

বাড়ীওয়ালী বলেছিলো, ত্যাখ্, আমাদের কাছে যৌবন এক অমূল্য সম্পদ। শোন তাহলে এক কাহিনী বলি। আমার এক বোন তখন উত্তর কোলকাতার এক হাসপাতালে। পেটে যেন কী হয়েছে। যা খায় পেট ব্যথা। আমিও মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। ওদের ঘরের সামনেই প্রসূতি বিভাগ। টাকা দিয়ে থাকতে হয়। একদিন যেয়ে শুনি একটি

সৌন্দর্যের রাণী এসেচে, বাচ্চা হওয়াতে। মেয়েটাকে দেখলাম। আঠার উনিশ বছরের মেয়ে। সুন্দরীই। প্রেম করে বিয়ে করেছে। ছোকরাটাকেও দেখলাম। মেয়েটার থেকে এক আধ বছরের ছোটই হবে বা। বড় ঘরের ছেলে। ছেলের মাকেও দেখেছি, রাজেন্দ্রাণীর মতো চেহারা।

কয়েকদিন পর বোনকে দেখতে গেছি। শুনি বাচ্চাটা কাঁদছে। অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদছে। টাকা দিয়ে রাখা আয়াটা কিছুতেই সামলাতে পারছে না। কান্না থামাতে পারছে না।

বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চাটাতো খুব কাঁদুনে হয়েছে দেখছি!

বোন বললো, কাঁদবে না! বউটা তো মাই খেতে দেয় না।

বললাম, সে কি? কচি বাচ্চা, আর বউটাও তো দেখছি বাচ্চা নয়। জানিনে বাবু আজকালকার মেয়েদের লজ্জা!

বোন হেসে বললো, লজ্জা নয় দিদি। আসলে ইচ্ছে করে ও মাই দেয় না। বুকের বাহার নষ্ট হবে যে! রোজ বরফ এনে বুকে ঘসে, আরও কত কাণ্ড!

—বোঝ ঠ্যালা! শুধু কি তাই। ভদ্দর ঘরেও দেখছি, অন্তঃসত্বা হলেও করসেট বেঁধে পেটের গড়ন ঠিক রাখে। পাছে পার্টিতে যেতে, অতিথি আপ্যায়ণ করতে দৃষ্টি কটু হয়! এরপর আর আঙ্গুরবালার কিছু বলার থাকতে পারে কি?

বাড়ীওয়ালী ভরসা দিয়ে বলেছিলো, তোর কিছু ভাবতে হবেনা বাছা। হাজার পথ বেরিয়েছে আজকাল। হোমোপ্যাথি করতে পারিস। গাছগাছড়ার সাহায্য নিতে পারিস। অ্যালোপ্যাথি করাতে পারিস্। দু'মাসের 'বিপদ' খসাতে কি আর ফ্যাসাদ আছে নাকি বাছা! ওতো জল খাওয়ার সামিল। পয়সা থাকলে নার্সিং হোমেও যেতে পারিস।

শেষ পর্যন্ত তাই করেছিলো আঙ্গুরবালা। না, বাড়ীওয়ালী এবিষয়ে এক্সপার্ট। বলতো, জীবনে বোধ হয় 'শ' তিনেক কেস সামলে দিয়েছি বাছা। ভাল রোজগার। নইলে কি আর একটা বাড়ী কিনতে পারতাম।

এরপর সব দায়িত্ব বাড়ীওয়ালীই নিয়েছিলো। মেয়েটার উপর একটা কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া মোটামুটি ভদ্রও। মুখে চোখে এখনও

চোয়াড়ে ভাব আসেনি।

তা হাল্কা কাজই দিয়েছিলো বাড়ীওয়ালী। আঙ্গুরবালাকে কুমারী মেয়ে সাজিয়ে নিজে বিধবা মায়ের কাপড়চোপড় পরে বিভিন্ন মন্দিরে নিয়ে যেতো। বার ব্রত, পূজা পার্বণতো আর হিন্দুর ঘরে কম নয়। আর সে সব উপলক্ষ্যে মন্দিরে মন্দিরে, গঙ্গার ঘাটে, এখানে সেখানে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিও আসেন বৈকি ? দু দশজন বকধার্মিক-ও আসেন।

এঁদের চিনতে অভিজ্ঞ চোখের ভুল হয়না। তা ছোকরাই হোক, বুড়োই হোক। তারপর এটা সেটা উপলক্ষ করে দু'চারটে কথাবার্তা। নরম দেয়াল দেখলে পেরেক ঠোকার চেষ্টা। চোখ ইসারা। তারপর, 'যদি অনুগ্রহ করে একটু পৌঁছে ভান, দারোয়ানটা এখনও এসে পড়েনি. বা গাড়ী আসেনি, একা সোমত্ত মেয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে' ইত্যাদি, ইত্যাদি ছলনা। তখনও যদি টোপ না গিলে থাকে 'শিকার', তাহলে নেহাৎ মানবতা বোধেও সাহায্য করতে এগুবে। বাড়ী পৌঁছে দেবে ! স্পোর্টসম্যান সুলভ স্পিরিটেই দেবে। শিভালরীর তাগিদেই দেবে।

আহা, বেচারা মা মেয়ে সত্যিই বিপদে পড়েছে।

কোথায় একটা গল্প পড়েছিলাম, এক ট্যাক্সির আরোহী গাড়ীর মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগ আবিষ্কার করে, ঐ শিভালরীর তাগিদেই তা পৌঁছে দিতে যেয়ে টোপ গিলেছিলো। আসলে পরিচিত ট্যাক্সিতে ঐ ভ্যানিটি ব্যাগের তিনি ভ্যানিটি ব্যাগটি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে শিকার পাকড়াতো মেয়েটি। ঐ টোপে মাছ গাঁথলে, শাঁসালো মাছ অবশ্যই, তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে বেশ কিছুদিন রুজি রোজগার চলতো।

তারপর আবার ট্যাক্সিতে ভ্যানিটি ব্যাগের টোপ রাখা হতো ! বলাবাহুল্য ট্যাক্সিওয়ালার এ ব্যাপারে কমিশন থাকতো। আর এক কথা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে একটা চটকদার নিজের ফোটো (যৌবনবতী তো বটেই) রাখতে ভুলতো না কিন্তু।

মন্দিরে (মেলায় খেলায়ও), এই বিশেষ শ্রেণীর ভক্তিমতীদের ব্যাপার স্যাপারও ঐ একই পর্যায়ের। তা সে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউর কোন মন্দিরই হোক, আর মধ্যভারতের, উত্তর ভারতের কোন মন্দিরই হোক। অবশ্য এই বিশেষ

শ্রেণীদেরও দুটো উপশ্রেণী আছে। একদল আছে পুরোপুরি নাম লেখানো বারবণিতা, অপর শ্রেণী এই হাফগেরস্ত।

এদের যারা শিকার তাদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। নসিবে তেমন তেমন লেগে গেলে সারা জীবন পায়ে পা দিয়ে কাটাও কে বাধা দিচ্ছে। তবে বনেদী যারা তারা কে বারবণিতা, কে হাফগেরস্ত (অবশ্য হাফগেরস্তরাও যে কী তা ঈশ্বরই জানেন), ঠিক চিনতে পারে।

তারা পছন্দও করেন এই সব তথাকথিত হাফগেরস্ত কুমারীদেরই। গণিকালয়ে যাবার চেয়ে কম ক্ষতিকারক এই হাফগেরস্ত ঘরে যেতে অনেক পুরুষই নাকি পছন্দ করে।

কিন্তু আঙ্গুরবালার কপালে এ সুখও বেশী দিন সয়নি। এ লাইনে যথেষ্ট রোমান্স আছে। অ্যাডভেঞ্চারও বটে। প্রতিটি পর্বেই একটা চিত্তশিহরণকারী উত্তেজনা। এ অভিজ্ঞতা আঙ্গুরবালার ছিলোনা। কোনদিন এ লাইনে নামবে তাও ভাবেনি। কিন্তু জীবনটা এমন যে, কাল কী হবে কেউ তা জানেনা।

একটা বিখ্যাত বিদেশী বইয়ের একটা কাহিনী পড়েছিলাম। এক ভিনদেশী নাবিক এলো এক দ্বীপে। এক ছোট খামার-বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর কাছে আশ্রয় পেলেন। তার বাড়ীতে এক শাশুড়ী, এক মেয়ে। গৃহকর্ত্রী ঠিক যুবতী না হলেও, বিগতা যৌবনা নয়। স্বামীটি বাইরে বিদেশে আছেন। শীঘ্রই বাড়ী ফেরার কথা। পত্নী পতি গর্বে গর্বিতা। আশ্রিত নাবিকটি যুবক। তার কাছে গৃহকর্ত্রী মহিলা বহুবার স্বামীর কথায় পঞ্চমুখ হতেন। এমনি করে বেশ কিছু দিন যায়। ঠিক যেদিন স্বামী গৃহে ফিরবেন তার আগের দিন পতির আগমণ প্রতীক্ষারতা নারী পদস্খলন করলেন।

প্রথম প্রথম বাড়ীওয়ালী আঙ্গুরবালাকে নিয়ে সব কিছু হাতে নাতে শিখিয়ে পড়িয়ে শিকার ধরে আনতো। রোজগার পাতি মন্দ হতো না।

কিন্তু একদিন এক ছোকরা হাকিমকে পাকড়াতে যেয়েই বিপদ ডেকে আনলো। সে ভদ্রলোক আঙ্গুরবালার অনুরোধে তাকে নিজের গাড়ী করে পৌঁছে দিয়েছিলো অতরাতে। সত্যিই তো একজন ভদ্রকুমারী মেয়ে রাত্তিরবেলা হঠাৎ বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে যে-কোন জগৎসিংহই এগিয়ে আসবে বৈকি ?

কিন্তু এমন একজন সুপুরুষ গাড়ীওয়ালা বাবু দেখে আঙ্গুরবালার আর তর সয়নি।

ছোকরা হাকিম একটু বিস্মিত হয়েছিলেন আঙ্গুরের রকম সকম দেখে। পরিণতিতে আঙ্গুরবালার বাসায় পৌঁছেও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঐ সঙ্গে আঙ্গুরের ঠিকানাপত্র নামধাম টুকে নিয়ে পরদিন যে সোজা আদালতে সোপর্দ করে দেবেন তা কি করে জানবে আঙ্গুরবালা।

দ্বিজু চৌধুরীকে বলেছিলাম, এই সব থেকেই কি ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্টের সৃষ্টি হয়েছিলো নাকি হে চৌধুরী?

চৌধুরী বলেছিলো, হবেও বা। আইন কানুন তো মাঝে মাঝেই হচ্ছে। হলেই কি আর অপরাধ কমে ভায়া। প্রিভেনটিভ্ ডিটেনশন হয়েছে বলেই কি সমাজবিরোধী মনোভাব তেমন কমানো গেছে? আসলে আইন থাকলেই একশ্রেণীর লোকের আইন ভাঙার নেশা জাগে। আর এক শ্রেণীর লোক জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে তার পৃষ্ঠপোষকতা করে।

ইম্মর‍্যাল ট্রাফিক আক্টের কথা বলছো, তাতেও কি ফাঁক নেই? লোকালয়ে বেশ্যাবাড়ী থাকবে না। স্কুল কলেজ, ভদ্রপল্লীর কাছে থাকবে না। রাস্তায় লোক টানাটানি চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারজন্যে নির্দিষ্ট অভিযোগ চাই। জনসাধারণের সহযোগিতা চাই। কিন্তু ক'জন যেচে এইসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। তা নইলে হাটে বাজারে প্রকাশ্যে মদের দোকান, গাঁজার দোকান হয় কী করে? সিনেমার নোংরা বিজ্ঞাপন কী করে বেরয়। ঋতুবন্ধের হাতুড়ে বিজ্ঞাপন কী করে বেছে বেছে পাবলিক ইউরিন্যাল, ল্যাম্পপোষ্টে সাঁটা থাকে! 'আপনি যাহাকে চান, তাহাকেই পাবেন' প্রভৃতি শিহরণ জাগানো যাদু রুমাল, যাদু আয়না, যাদু চশমা, ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধির বিজ্ঞাপন নামকরা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় কেন, গাঁজা জেনেও। তিন টাকায় ফর্সা হবার লোশন নিলে একহাজার রকমারী জিনিস ফ্রী দেওয়া হয়, এসব ফাঁকী-বাজি বিজ্ঞাপন বেরয় কী করে। আমাদের দেশে আইন আছে কিন্তু আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নাকি? প্রকাশ্যেই যখন ক্ষমতাবানরা আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, বেশ্যাবাড়ীর অন্ধকারে কী ঘটে তার কটার কথা

পুলিশের কানে যায়, আদালতের সামনে আসে!

আঙ্গুরবালার নামে থানা থেকে সমন এলো। বাড়ীওয়ালী বললো, তোমার বাছা কিচ্ছু হবে না। তুমি হীরে কাচ চিনতে পারলে না এ্যাদ্দিনেও। কতদিন বলেছি, মন্দিরে যেয়ে খুব ভক্তিমতী, ভক্তিমতী ভাব দেখাতে হয়। নিজে উপয়াচক হয়ে ইসারাপত্র করতে নেই নিশ্চিন্ত না হয়ে। এখন বোঝ ঠ্যালা।

আঙ্গুরবালা বলেছিলো, কী করে জানবো মাসী। কতবার বললাম, সঙ্গে চল, তা গেলে না, বললে তোমার কে জামাই এসেছে। এদিকে আমার যে তর সয়নি কেন তা যদি জানতে!

বাড়ীওয়ালী বললো, আর তো জেনে কাজ নেই। হিন্দু মুসলমান হলে শুনেছি গরু খায় বেশী। তা বাছা ঘাবড়াস্ নে, আমাদের খদ্দের বিপিন উকিল আছে। খরচপত্তর তেমন কিছু লাগবে না।

তা লাগেনি আঙ্গুরবালার। ওকালতনামা, হাজিরা দিতে একটাকা সাড়ে বারো আনা। উকিলের ফী দুটাকা। পেস্কারবাবুকে একটাকা। আর কিছু এদিক ওদিক। সব নিয়ে দশটাকাও নয়। জামিনেও খালাস করেছিলেন উকিলবাবু। শতকরা আটআনাতেই রাজী হয়েছিলেন। যে হাকিমের কোর্টে মামলা ট্রান্সফার হয়েছিলো, তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ হলে কী হবে! চোখের দৃষ্টি বেশ প্রখর। বেশ লোলুপ। জামিন পাবার সময় বেশ করে লক্ষ্য করেছিলো আঙ্গুরবালা। আর মন্দিরে টন্দিরে যে ধরণের 'চোখমারা' শিখেছিলো তারই একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে দিয়েছিলো মরিয়া হয়ে।

কিন্তু তাতেও বিপিন উকিল শেষরক্ষা করতে পারেন নি। ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে বলে জোর আরগুমেণ্ট করেও সুবিধে হয়নি। সরকারী উকিলের জেরার মুখে খেই হারিয়ে ফেলেছিলো। ফলে বৃদ্ধ হাকিম মশায় সাজা না দিয়ে পারেন নি। তবে প্রথম অপরাধ বলে সাজাটা কম দিয়েছিলেন। কে জানে আঙ্গুরবালার ঢলঢলে মুখখানি দেখে বুড়ো হাকিম সাহেবের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছিলো কিনা!

জেল হয়েছিলো এক মাসের।

জেলের মধ্যেই আরও অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছিলো আঙ্গুরবালার। সেখানেই দেখা হয়েছিলো বীরভূমের হরিদাসীর সঙ্গে।

সাবাস্ মেয়ে হরিদাসী। মেয়ে কয়েদীদের নমস্যা। বাঃ বাঃ, কয়েদ খাটতে হয়তো হরিদাসী মাহাতোর মতোই হতে হয়।

আঙ্গুরবালা সেই প্রথম দেখলো, আরে, জেলখানায়ও তো কয়েদিদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে, কৌলিন্য আছে!

যারা খুনখারাবি করে মোটা কয়েদ খাটছে তারাই কয়েদী সমাজে কুলীন। আলুবেগুন চোর যারা তারাই ব্রাত্য।

হরিদাসী খুন করে জেলে এসেছিলো। কী ব্যাপার? না, অন্ধকার ঘরে নিজের সোয়ামীকে শালীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছিলো। দেখে স্বাভাবিক ভাবেই রাগ সামলাতে পারেনি। চুপি চুপি এক টাঙ্গা এনে অন্ধকারেই সোজা কোপ। একটার গলা সবটা কেটেছিলো। দু' নম্বরটাও দু ফাঁক। হরিদাসী বলেছিলো, নে, এবার সগ্গে যেয়ে জোট বেঁধে থাক্‌গে যা!

এটুকু করলেই হরিদাসীর এত খাতির হতো কয়েদিনী মহলে। হরিদাসী আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলো। কাটা মুণ্ডু দুটো ভাল করে ধুয়ে মুছে, একটা গামছায় মুছে সোজা থানায় যেয়ে হাজির হয়েছিলো।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, প্রেমের জন্য মেয়েরা সব কিছু করতে পারে কিনা জানিনে, সতীন কাঁটা তুলতে, কাঁটার সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে এরা হেন কাজ নেই যা পারেনা। হরিদাসী ছোট আদালত থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেনি। উকিলের নির্দেশ, আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। তবে হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছিলো এটা ঠিক। কিন্তু কী জন্যে? স্বামীর জন্যে। লোকটাকে জব্বর ভালবাসতো হরিদাসী।

এই হরিদাসীই আঙ্গুরবালাকে পুরুষ মানুষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দান করেছিলো। তাদের প্রেম সম্পর্কে, লোভ সম্পর্কে অনেক বাণী দিয়েছিলো।

একমাসের জেল আবার জেল। বরং এই একমাস বসে খেয়ে আঙ্গুরবালার গতরখানা আগের চেয়ে অনেক তেল চিকচিক হয়ে উঠেছিলো।

জেল থেকে বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই বুড়ো হাকিম সাহেবের বাড়ীতে যেয়ে হাজির হয়েছিলো। বলেছিলো, হুজুর জেল দিলেন, এখন খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। বাইরে তো আর কেউ জেল খাটা মেয়েকে কাজ দেবেনা।

একটু প্রগলভতা হয়েছিল বৈকি? কিন্তু ব্যবহারে শালীনতার পাঠ শিখলো কোথায় আঙ্গুরবালা! কে শেখালো তাকে।

কিন্তু বয়সকালের প্রগলভতা অনেকের কাছে মানায়ও তো! বুড়ো বিপত্নীক হাকিম মহাশয়েরও সহ্য হয়েছিলো। ঝিগিরি দিয়েছিলেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তবে শর্ত এই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ঝি হলেও একটু সেজে গুজে থাকতে হবে। হাজার হলেও একজন হাকিম সাহেবের বাড়ীর ঝি!

তাই ছিলো আঙ্গুরবালা। আন্তরিকভাবেই বৃদ্ধের যত্ন আত্তি করতো। বুড়োও করতো। বলেছিলেন, রিটায়ার করলে কাশীবাস করবেন। বাঙালী টোলায় একটা বাড়ীও নাকি আছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই।

একবার বুড়ো নিয়েও গিয়েছিলেন পুজোর বন্ধে। কিন্তু বুড়ো এক দিনের জন্যেও মন্দিরে যেতে দেয়নি। বিশ্বনাথের গলিতে একদিন অবশ্য গিয়েছিলো, কিন্তু ঢুণ্ঢুগণেশ, অন্নপূর্ণা মন্দির বা বিশ্বনাথ দর্শন করার জন্য নয়। মোড়ের যে দোকানটায় ভাঙের সরবৎ বিক্রী হয় ঐ দোকানে। ভাঙের সরবৎ সেই প্রথম খাওয়া আঙ্গুরের।

তখন কিছু বোঝেনি। মজা বুঝেছিলো বাসায় এসে। সে কি বুড়োর হাসি। হাসি আর থামেনা। কে বলবে একজন জাঁদরেল হাকিম। যাঁর কথায় একজনের মুণ্ডু গড়াগড়ি যেতে পারে (হাকিমরা মুণ্ডু নেবার অধিকারী কিনা তখনও আমি জানতাম না। আঙ্গুরবালার বৃদ্ধ জজসাহেব ছিলেন না তো!) সে হাকিম সাহেব কিনা গা গতরের জামা খুলে নৃত্য। আঙ্গুরবালার অবস্থাও তার চেয়ে মোটেই ভাল ছিলোনা।

কিন্তু এত সুখ আঙ্গুরবালার নসীবে নাকি সয় নি।

কোলকাতা ফেরার কয়েকদিন পরই বৃদ্ধ পরপার যাত্রা করেছিলেন।

এত বয়সে এসব নৃত্য সহ্য হবে কেন?

স্বর্ণ নিমন্ত্রণ করেছিলো কার্তিকপূজায়।

কমলরাণী শুনে মুখ টিপে হেসেছিলো। কারণ বুঝিনি। জিজ্ঞেস করলাম, হাসচো যে কমলরাণী?

কমলরাণী বললো, এমনি।

না, এমনি নয়। নিশ্চয়ই কারণ আছে।

তা আছে। কিন্তু তা আমার কাছে না শুনে, আপনার ঐ বাটপার বন্ধুর কাছে শুনবেন। ওতো একজন এ পাড়ার অথরিটি। কিন্তু আমার এখানে একদিন খেতে হবে। না, কার্তিকপূজায় নয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়। কী ঘেন্না করবেন না তো! মুখে বোন বলা সোজা, কিন্তু ফোঁটা নিতে ইজ্জতের গলায় দড়ি পড়বে না তো!

হেসে বললাম, না, এক'দিনের জন্য আর ইজ্জত না হয় শিকেয় তুলে রাখবো।

কমলরাণী ম্লান হেসে বললো, হ্যাঁ শুনেচি আপনি দিল্লীতে একটা চাকুরী নিয়ে চলে যাচ্ছেন!

বারবনিতা পল্লীতে সেই আমার কার্তিকপূজা দেখা। শুধু বারবনিতা পল্লীতে কেন, এর আগে ভদ্রপল্লীতেও আমি প্রত্যক্ষভাবে কার্তিক পূজা দেখিনি। আমাদের দেশের বাড়ীতে আমাদের গ্রামতুতো সম্পর্কের এক জ্যাঠামশায়, কার্তিক পূজা করতেন। পূজা আমি দেখিনি। পূজার পর তাঁর ঘরে কার্তিক ঠাকুরের ময়ূরচড়া বিরাট মূর্তিটি আমার বরাবর দৃষ্টি আকর্ষণ করেচে। ঐ বিরাট আকৃতির কার্তিক ঠাকুর দেখে ছোটবেলায় আমার মনে হয়েছে মা দুর্গার সঙ্গে এসে কার্তিক ঠাকুরের প্রাধান্য কম হলেও, আলাদাভাবে কার্তিক ঠাকুর কেউকেটা নয়।

যেমন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে এলে থানার দারোগার প্রতি তেমন সম্মান না দেখান হলেও আলাদা ভাবে মফঃস্বলের দারোগাবাবু একজন কেষ্টবিষ্টু এও ঠিক তেমনি।

শুনেছিলাম বারবণিতা পল্লীতে কার্তিক পুজা একটি বিশেষ পর্ব। বিশেষ অর্থে শ্রেষ্ঠ পরব। অতি শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এ পুজা করে গণিকারা।

কার্তিক পুজার প্রতি বারবণিতাদের কেন এতো ভক্তি একথার জবাব পেয়েছিলাম স্বর্বর্ণর মুখে। স্বর্বর্ণ বলেছিলো, কার্তিকের মতো খদ্দের লাভের জন্যই এ পুজা। আচার আচরণ উপকরণ সবই ভদ্র গৃহস্থের মতো। উপকরণ উপচারও তাই।

সকাল থেকেই চান করে উপোস করেছিলো স্বর্বর্ণ। আগের দিন সংযম করেছিলো।

আমি যখন স্বর্বর্ণর ঘরে গেলাম তখন সে পূজার জোগাড় করছে। সারা ঘরে আলপনা দিচ্ছে। হ্যাঁ, রুচির বলিহারী যেতে হয় স্বর্বর্ণর লক্ষী-শ্রী যুক্ত আলপনা দেখলে। প্রতিমা তখনও আনা হয়নি। একটু বেলায় পূজা।

বললাম, এ পূজায় কী কী লাগে স্বর্বর্ণ।

স্বর্বর্ণ বললো, প্রচুর। একটি বড় পুজার যাবতীয় বস্তুই বলতে গেলে।

বললাম, তবু?

স্বর্বর্ণ বললো, সিঁদুর একথান, পুরোহিতের বরণ একজোড়া ধুতি, আংটি সোনার বা রূপোর, যজ্ঞোপবীত, কুশআসন, তিল ধরুন এক তোলা, হরিতুকী ২ টি, পঞ্চগুঁড়ি, লাল হলুদ প্রভৃতি বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। পঞ্চশস্য যেমন যব গম ধান মুগ রাই। পঞ্চগব্য যেমন গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত। পঞ্চরত্ন যেমন প্রবাল, মুক্তো, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক। না, না ঘাবড়াবেন না রায়মশায়। এতেও পয়সা বেশী লাগবেনা। দশকর্মা ভাণ্ডারেই পাবেন।

বললাম, বল কি স্বর্বর্ণ! রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে নয়?

স্বর্বর্ণ হেসে বললো, না। আজকাল আবার সবকিছুরই বিকল্প ব্যবস্থা আছে।

বললাম, বেশ বেশ, আর কি কি লাগে?

স্বর্বর্ণ বললো, আর সব চোখের সামনেই দেখচেন। পঞ্চপল্লব, বরণ-ডালা। মাটীর ঘট। কুণ্ড হাঁড়ি, ওর ভেতরে মেটে প্রদীপ রয়েছে। ওটি মঙ্গল প্রদীপ। ঐ দেখচেন আতপ চাল এক সরা। অবশ্য আতপ চাল আরও লাগবে। নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলী প্রভৃতিতেও লাগে। একটি

দর্পণ। এটি চার পয়সা দামের হলেও চলে। একটি সশীর্ষ ডাব। তীর চারটে। ঘটাচ্ছাদনের গামছা। পুষ্পসজ্জা যেমন ফুল, বেলপাতা, তুলসী, দূর্বা, আতপচাল, হরিতকী।

একটি আসনঅঙ্গরীয়। মধুপর্কের বাটী, বাটিতে আছে দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, আখের চিনি। এ পাশে দেখছেন বড নৈবেদ্য চারটি, ছোট চারটি। তীর ধনুক, একখানা খড়্গ, লৌহের প্রতীক দা, ছুরী একটা।

কার্তিকঠাকুরের চারখানা ধুতি। ময়ূরঠাকুরের চারখানা।

হেসে বললাম, ময়ূরঠাকুরও আজকাল ধুতি পরেন নাকি ?

স্বর্ণ বললো, ঠাকুরদের লীলা মাহাত্ম বোঝা কি আমাদের সাধ্য। রামায়ণে আমিতো সুগ্রীব হনুমানের কাপড পরা মূর্তি দেখেছি। লেজটা অবশ্য বেরিয়ে থাকা। আজকালকার হনুমানেরা অবশ্য তাও ঢেকে রাখে।

বললাম, নিলে তো একহাত ! তারপর বল ?

স্বর্ণ বললো, আসলে চারবার পূজা হয় বলেই চারখানা ধুতির ব্যবস্থা। বিকল্পে একখানা করে। আমিও একখানা করেই যোগাড় রেখেছি।

এ ছাড়া বিষ্ণুপূজার ধুতি। চাঁদমালা চারটে। পুষ্পমালা চারটে। থালা একটা। ঘটি একটা। খেলনা একপ্রস্থ। মাদুর বালিশ একটা করে। হোমের সাদা বালি, হোমের কাষ্ঠ, গব্যঘৃত আধসের, নিখুঁত বিল্বপত্র আটাশটে। কুশ একগোছা। কুশাহুতির জন্য পান সুপারী, পাকাকলা, ভোজ্য তিনটি, ভোগের দ্রব্য, পূর্ণপাত্র যেমন একটা পিতলের থালায় আতপচাল পানসুপারী দেখছেন ?

সবশেষে পুরোহিত ঠাকুরের দক্ষিণা।

বললাম সেটা কত ?

স্বর্ণ বললো, কেন পুরোত হবার লোভ হয় নাকি রায়মশায় ? পৈতেটা আছে তো ?

পুরোহিত দিয়ে পূজা করা হয়ে থাকে। এ পাড়ায়ও পুরোহিত আছে? ভদ্রপল্লীতে কার্তিকপূজা করেন বাচ্চা-কাচ্চা হয়না যাদের তারা। অনেকে স্বামীর মন পাবার প্রার্থনার জন্যও পূজা করে থাকেন।

পূজো সাধারণতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনেও হয়। দ্বিতীয় দিন

সকাল বেলা। বিকেলে বিসর্জন। কেউ কেউ বিসর্জন না দিয়ে রেখে দেয় কার্তিক ঠাকুরকে।

স্বর্ণ বললো, রায়মশায় একটু ঘুরেও আসতে পারেন, আর যদি দয়া করে বসেন তাহলে পরম সুখী হই। অবশ্য যদি আমাদের এই ক্ষুদ্রানুষ্ঠান আপনার বিরক্তির কারণ না হয়।

বললাম, বিরক্তির কারণ হলে আসবো কেন?

স্বর্ণ বললো, মন রাখতে।

বললাম, কিন্তু তোমাদের না হলে যে আমাদের ভদ্রগৃহস্থদেরও চলেনা, এটা তো তোমার মত বিদুষীর না জানার কথা নয়!

স্বর্ণ বললো, বিদুষী, অমুক তমুক, এত সব প্রশংসা বাক্য মুখে নিয়ে এলেন কেন হটাৎ। আমাদের ছাড়া আপনাদের ভদ্রগৃহস্থদের চলেনা, কথাটার ব্যখ্যা প্রয়োজন রায়মশাই।

বললাম, দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে দেখতে পাই, 'ইদং স্নানীয়োদকং গাং গৌর্য্যৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণে অন্যান্য উপকরণের ন্যায় বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা-স্পৃষ্টবারি সিঞ্চনেও মহামায়ার মহাস্নান ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং যে মাটীতে মহামায়ার স্পৃহা সে মৃত্তিকার প্রাপ্তিস্থান কোথায়?

স্বর্ণ হেসে বললো, এই কথা! সেতো আপনাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-ঠাকুররাও বলে গেছেন রায়মশায়। তাঁরা তো আর এক ডিগ্রী এগিয়ে ছিলেন। তাঁরা মানবের হিতের জন্য বিধান দিলেন, যাত্রাকালে যাদের স্মরণ করলে যাত্রা শুভ হবে তাদের মধ্যে বারবণিতাও একটি। তাইতো যাত্রামঙ্গলে দেখতে পাই

> ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি—
> দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমাল্য পতাকা।
> সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
> দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥

দেখলেন তো রায় মশাই ধেনুবৎস, বৃষ গজ তুরগ, দিব্য স্ত্রী পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ নৃপ পুষ্পমাল্য পতাকা, প্রভৃতি জীবন্ত, জড় পদার্থের……সঙ্গে এই অভাগিনীদের দর্শন করে যাত্রা করলে যাত্রা নাকি শুভ হয়। অবশ্য আমাদের দর্শনতো সহজ-

লভ্য নয়, সেজন্য বিকল্প হিসেবে আমাদের নামকীর্তন করে, আমাদের কথা অপরের মুখে শুনে যাত্রা করলেও চলবে। তাতেও সরকারী চাকুরী, মন্ত্রীত্বের, ইলেকশন প্রভৃতি ইপ্সিত বস্তু লাভে অসুবিধে হবেনা।

তবে কি জানেন, আজকাল ঋষিবাক্য ক'জন ম্লেচ্ছই বা মেনে চলে বলুন। এমনকি আপনাদের অনেক শুভকার্যেই যে আমাদের উপস্থিতি মঙ্গলজনক তার একটা উদাহরণ তো আপনিই দিলেন। অমন যে আপনাদের আদর্শ প্রজানুরঞ্জন রামচন্দ্র তাঁরও অভিষেক ক্রিয়ায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। অলঙ্কার অবশ্য মহারাজ দশরথের রত্নাগার থেকেই দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাই বলে, এ ভেবে বসবেন না যেন সালঙ্কারা-বেশ্যা ছিলো বলেই রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া ভণ্ডুল হয়েছিলো।

বললাম, না তা ভাববো কেন ?

সুবর্ণ বললো, কিন্তু আপনাদের অনেকে ভাবেন। তা যাক্, এই যে পুরুত মশাই এসে গেছেন। আমিও তৈরী।

পুরুত মশাই বলে ব্যক্তিটিকে আমি এর আগেও এ পাড়ায় দেখেছি। ধেনো খেয়ে মাতলামি করে নর্দামায় গড়াগড়ি দিতে এর নাকি জুড়ি নেই, একথা বলতো দ্বিজু চৌধুরী।

কিন্তু তাই বলে পূজার বেলায় তার গাফিলতি দেখলাম না। অবশ্য মন্ত্র যা পাঠ করলেন তাতে আমার শ্রুতিতে বাঁধলেও সমবেতা বারবণিতা কুলের কিন্তু বিন্দু মাত্র অশ্রদ্ধা দেখলাম না।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কাহিনী মনে পড়লো। এক পরম বিদ্বান পুত্রের বিবাহ। বিবাহ পল্লীগ্রামে। পুরোহিত যিনি তিনি প্রাচীন ব্যক্তি। যুবকটির বাপপিতামহের আমলের। তেমন লেখাপড়া জানা নয়।

বিয়ের সময় মন্ত্র পড়াচ্ছেন পুরোহিত মশাই। উচ্চারণে ভুল, মন্ত্রে ভুল। বিদ্বান পুত্র প্রতি পদে আপত্তি করতে লাগলেন। এক সময় বলে বসলেন, এই মন্ত্র তিনি পাঠ করবেন না, এ বিয়ে অসিদ্ধ।

পুরোহিত মশাই অশিক্ষিত হতে পারেন কিন্তু কূট বুদ্ধিতে কম নয়।

রেগে মেগে বললেন, দু পাতা ইংরেজী পড়ে তুমি বাপু এ বিয়েকে অসিদ্ধ বলছো, কিন্তু আমার পড়া মন্ত্র যদি অশুদ্ধই হবে, তবে তোর বাপের বিয়েও

তো আমিই দিয়েছিলাম। তাহলে সেই অশুদ্ধ বিয়ের ফল স্বরূপ তোর মতো পণ্ডিত ছেলে হলো কী করে র‍্যা। বলে কিনা, আমার মন্ত্রপড়া বিয়ে অসিদ্ধ। পুরুত মশাই পূজা শেষ করলেন।

সুবর্ণ ও অন্যান্য মেয়েরা ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করলো। দক্ষিণা দিলো।

এরপর কার্তিকপূজায় ব্রতকথা পড়ার পালা। ব্রতকথা পডলো সুবর্ণ। এত সুন্দর মার্জিত কণ্ঠে এত সুন্দর উচ্চারণভঙ্গী, এতটা আমিও আশা করিনি। কমলরাণী ঠিকই বলেছিলো, নতুনদি আমাদের গোবরে পদ্মফুল।

সুবর্ণ পড়লো কার্তিকের ব্রতকথা।

একবার ঋষি নারদ মথুরায় এলেন বসুদেবের কাছে। কংসের অত্যাচারে বসুদেবের পুত্রাদি বিনষ্ট। বসুদেব মর্মাহত। দেবকীও। পাদ্য অর্ঘ দিয়ে বসুদেব নারদকে বসতে অনুরোধ করলেন। মহর্ষি উপবিষ্ট হলে, বসুদেব বললেন, কংসের নির্মমতায় দেবকীর একটি পুত্রও দীর্ঘজীবী হতে পারছেনা। কী করলে দেবকীর পুত্রগণ দীর্ঘায়ু হতে পারে তার উপায় বলুন দেবর্ষি !

দেবর্ষি নারদ বললেন, আপনি একটি ব্রতকথা শুনুন বসুদেব। আপনার প্রশ্নের উত্তর তার মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

মহর্ষি বললেন, প্রাচীনকালে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার নাম হচ্ছে সুভগ। সুভগের পত্নী দক্ষিণা। দক্ষিণাও স্বামীর মতো ধর্মশীলা। পতি পরায়ণা। সুভগের সচ্ছল অবস্থা। পতিব্রতা স্ত্রী। গৃহ লোকজনে পরিপূর্ণ। এককথায় পরিপূর্ণ সুখের সংসার। কিন্তু হলে কী হবে। সুভগের মনে শান্তি নেই। কারণ? কারণ সুভগ পুত্রহীন। সন্তানহীন। সমস্ত সংসার তাই সুভগ-দক্ষিণার কাছে অসার।

একদিন মনদুঃখে সুভগ স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেলেন। না, সংসার আর ভাল লাগেনা দুজনের। একদিন যায়, দুদিন যায়, তৃতীয় দিনও অতীত হলো। এ তিনদিন গাছের ফল খেয়ে কাটিয়েছেন দুজনে। বৃক্ষতলে শয়ণ করেছেন।

চতুর্থদিন তাঁরা একজায়গায় উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন, কতিপয় রমণী এক সরোবরতীরে এক দেব প্রতিমা স্থাপন করে পূজা ও ব্রতপালন করছে। স্থানটি ধান্যাঙ্কুরশোভিত। প্রতিমাটি একটি অষ্টদল পদ্মের উপর স্থাপিত।

মহামতি সুভগ সস্ত্রীক সেখানে এগিয়ে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা

কিসের পূজা করছেন ? ইনি কোন দেবতা ?

পূজার্থিনীরা বললেন, আমরা কার্তিকপূজা করছি।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন, এঁর পুজো করলে কোন অভিষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে দয়া করে বলুন ? নারীগণ বললেন, পুত্রকামনা করে বৃশ্চিকসংক্রান্তিতে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। যেখানে পুজো করা হয়, সে স্থান ধান্যাঙ্কুর শোভিত হবে। তদুপরি অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করতে হবে। সেই পদ্মের উপর কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমা স্থাপন করতে হয়।

দক্ষিণা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিমা কী দিয়ে নির্মাণ করতে হবে ? অন্য আচারইবা কি, দয়া করে বলুন।

রমনীগণ বললেন, অবস্থানুসারে প্রতিমা সোনা, রূপা, তামা বা মাটী দিয়ে তৈরী করা যায়। প্রতিমার সামনে ঘটস্থাপন করে, ঘটের মধ্যে গণেশ, বাসুদেব; ব্রহ্মা, হরগৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, লোকপাল, নবগ্রহ ও ময়ূরের পুজো করতে হয়। এঁদের অর্চনা করার পর কার্তিকেয়র ধ্যানপূর্বক ষোড়শোপচারে পুজো করতে হয়। অবস্থা দৃষ্টে পুজোর রকমফের হতে পারে। সবশেষে লোহার খড়্গের পুজো করতে হয়। এইভাবে চারবার পুজো করার বিধান রয়েছে।

দম্পতী জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিমা রক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি ?

রমনীগণ বললেন, না, পরদিন সকালে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া উচিত।

দক্ষিণা জিজ্ঞাসা করলেন, অন্যান্য বিধি সম্পর্কে কিছু বলুন।

পূজারিণীরা বললেন, যিনি পুজো করবেন, তাঁকে উপোস করতে হবে। গান বাজনা নাচ প্রভৃতি দ্বারা দেবতার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। এইভাবে চার বছর ব্রত উদ্‌যাপন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ব্রত পালন করলে দীর্ঘজীবী পুত্র-পৌত্র লাভ হয়। পরিণামে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলে যেমন মোক্ষ লাভ হয়, দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় যেরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, দীপ্তিময় সূর্যের আরাধনার ফলে যেমন আরোগ্য লাভ করা যায়, তেমনি দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র পূজা করলে সুসন্তান লাভ হয়ে থাকে।

পূজারিণীদের কাছে সব কথা শুনে মহাভাগ সুভগ ও পতিব্রতা দক্ষিণা হৃষ্টমনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর যথাবিধি আচার আচরণ ও

উপকরণের দ্বারা দক্ষিণা ভক্তিভরে কার্ত্তিকেয়র পূজা করলেন। এই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে দেখতে দেখতে তাঁর গৃহ পুত্র পৌত্রাদি, ধনেজনে, সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো। সুখে সমৃদ্ধিতে জীবন অতিবাহিত করে দক্ষিণা স্বীয় পতিসহ পরমলোক প্রাপ্ত হলেন।

ব্রতকথা বর্ণনা করে মহর্ষি নারদ মহামতি বাসুদেবকে বললেন, হে বাসুদেব, দেবকীকে দিয়ে তুমি কার্তিকেয় ব্রত অনুষ্ঠান করাও। আমি বলছি এর ফলে তুমি ঈপ্সিত ফললাভ করবে। দুর্বৃত্ত কংস তোমার সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না। আর সে পুত্র দীর্ঘায়ু হয়ে দুষ্ট দমন করবে। শিষ্টের পালন করবে।

অপূর্ব, অপূর্ব! সেই সন্তানই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রতকথা শেষে সবাই প্রতিমার সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করলো। আমি শুদ্ধ চিত্তে এই কাহিনী শুনে ও ভক্তিমতী দেখে নিজকে যেন ভুলে গিয়ে ছিলাম। এই মুহূর্তে একবারও আমার মনে হয়নি আমি একটা বারবণিতা পল্লীতে বসে কার্তিকপুজো দেখছি।

সুবর্ণ হেসে বললো, একি পাথর হয়ে গেছেন যে রায়মশায়! নিন প্রসাদ নিন! তাকিয়ে দেখি অন্য সকলে কখন ঘর থেকে চলে গেছে। সুবর্ণ প্রসাদের থালা নিয়ে আমাকে প্রসাদ দেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তার মুখে প্রসন্ন হাসি, সারা শরীরে এক অপূর্ব পবিত্রতা। কমলরাণী সত্যই বলেছিলো, নতুনদি আমাদের গোবরে পদ্মফুল। পদ্মফুলই বটে!

বুড়ো হাকিম সাহেব তো মারা গেলেন। আঙ্গুরেরও কপাল পুড়লো। এরপর আবার পথ। কিন্তু যে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, সে বদ্ধ খাঁচায় থাকবে কী করে। আর দুতিন ঘাটে জল খেয়ে, একেবারে এ পাড়ায়। না, আর ছ্যাচড়ামী নয়, একেবারে নাম লিখিয়ে।

কিন্তু তাহলেই তো হলোনা! আশ্রয় চাই, নিরাপত্তা চাই। কয়দাকানুন জানা চাই। এ লাইনে এসে দেখলো আগে যা শিখেছে সব ভুল। সব আনাড়িপনা। আর ঢোকাই কি সহজ নাকি!

নতুন বাড়ীওয়ালীর কাছে যখন এলো তখনকার পরীক্ষা পাবলিক সারভিস্ কমিশনের পরীক্ষাকে হার মানায়। থিওরেটিক্যাল, প্রাকটিক্যাল, ভাইবা-ভোচী সব! থিওরেটিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে নানা রকম প্রশ্নাবলী। কোথাকার মেয়ে, বাঙালী না ভিনদেশী। অ্যাংলো না খোট্টা! ঘটি না বাঙাল! ঘর ছেড়েছো কেন? সোয়ামী ঝামেলা করবে নাতো? ফিরে যাবে নাতো? পার্টিটার্টির মেয়ে নওতো বাপু! পুলিশের স্পাই। সখ করে আসনিতো। সইতে পারবে তো এতো ঝামেলা। মদ ভাঙ্ চলেতো! ঘেন্না পিত্তি আছে নাকি? মেজাজ কী রকম? খিটখিটে নয়তো। আত্মসম্মানজ্ঞান কীরকম। পূর্ব অভিজ্ঞতা কী আছে? সাজসহায় 'ন্যাক' আছে কীরকম? বয়স কমাতে জানতো। দরকার হলে ফ্রক পরে কচি খুকী সাজতে পারবেতো বাছা? না, না মনে কিছু করোনা, অনেক খদ্দের আবার ফ্রক পরাই পছন্দ করে কিনা? তাদের ধারণা তুমি যথাসম্ভব নতুন। অভিনয়-টভিনয় করা অভ্যাস আছে তো কখন মান করতে হবে, কীভাবে দু'পয়সা বেশী রোজগার করতে হবে তা জানতো! যখন তখন ইচ্ছেমত হাসতে, কাঁদতে পারবেতো! গান বাজনার অভ্যেস আছে তো! নাচ? নাচটাচ কিছু জানা আছে! এমনি তরো হাজার জিজ্ঞাসা। আরও অনেক গোপন প্রশ্ন, গোপন ইঙ্গিত। না, তাতে ঘায়েল করতে পারেনি আঙ্গুরকে। চটপট উত্তর দিতে পেরেছিলো। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় আরও কঠিন সমস্যা। ম্যাডিক্যাল পরীক্ষার মতো আর কি! কিন্তু সে সমস্যার সমাধান আঙ্গুরবালা নিঃসঙ্কোচে করে ফেলেছিলো। বাড়ীওয়ালী পর্যন্ত তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। খুশীও হয়েছিলেন। না, দেহের গঠন ভালোই আঙ্গুরবালার। এ মেয়ে লাইনে থাকলে একদিন সাইন্ করবে।

এরপর থেকেই সুখের মুখ। কিন্তু না, ইতিমধ্যে দু'জন বাড়ীওয়ালী পাল্টে নতুন বাড়ীতে এসেছে আঙ্গুরবালা। দু'টাকা থেকে চার টাকা, চার টাকা থেকে আট টাকা দর্শনী বাড়িয়েছে। তারপর আরও বেশী। বিশ পঁচিশ। সময় সুযোগ বুঝে ত্রিশ চল্লিশ। মফঃস্বলের ডাক্তাররা যেমন সিরিয়াস্ কেসে টাকার ফুরণ করে যায়, ঠিক তেমনি।

এখানেই দ্বিজুচৌধুরীর সঙ্গে আঙ্গুরবালার দেখা।

পরের ঘরে নিজের বউকে দেখলে মনের ভাব কেমন হয়, সে মনস্তাত্বিক আলোচনা দ্বিজু চৌধুরীর সঙ্গে আমার হয়নি। দ্বিজু চৌধুরীও নিজের থেকে তা আমাকে বলেনি। তবে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি সম্ভবতঃ হৃদয় বিদারকই হয়েছিলো। কোলাকুলি তো নয়, চুলোচুলি। দ্বন্দ্ব হলেও তা ব্যতিহার বহুব্রীহি নাকি একে বলা হয়। চুলে চুলে টানাটানি করে যে যুদ্ধ। ব্যাকারণবিদ্‌রা বলতে পারবেন।

তবে কেউ অতিথি খদ্দেরকে কিচ্ছুটি বুঝতে দেয়নি। দ্বিজু চৌধুরীও নয়, আঙ্গুরবালাও নয়। যথারীতি দরাদরি হয়েছিলো। মোটা টাকায় আঙ্গুরবালা লোক বসাতে রাজী হয়েছিলো। মদ চলেছিলো, গানবাজনা চলেছিলো।

তারপর এক সময় মদে চুর হওয়া বাবু আর তার দালাল সিঁড়ি ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে স্থানোপযোগী গান গাইতে গাইতে কেটে পড়েছিলো।

এক মাতালের কাহিনী শুনেছিলাম। এক ভদ্রলোকের ছেলে। দলে পড়ে মদ খেতো। শেষ পর্যন্ত মদেই খেয়েছিলো তাকে। নর্দমায়, মাঠে ঘাটে পড়ে থাকতো।

একদিন রাত দুপুরে সিঁড়ি বেয়ে টেনে হিঁচড়ে উঠছে। জননী আনন্দে চীৎকার করে স্বামীকে ডেকে বললেন, ওগো, দ্যাখো দ্যাখো, আমাদের অমুকের অনেক উন্নতি হয়েছে গো! আগে মাঠে ঘাটে পড়ে থাকতো, এখন টেনে হিচড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারছে।

পরদিন দুই বিদ্যুৎভরা মেঘে সংঘর্ষ হয়েছিলো। সে সংঘর্ষ যেমন চাপা, তেমনি তীব্র।

আঙ্গুরবালা দ্বিজু চৌধুরীকে সোজা দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু কী করবে দ্বিজু চৌধুরী! আইন আদালত, ব্যভিচারের মামলা! না, কিছু করার উপায় রাখেনি চৌধুরী। কোন দাবী করার মতো দাবীই কি অবশিষ্ট রেখেছে!

আঙ্গুরবালাকেও তো এমনি পথ দেখিয়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী। বলেছিলো, শালা বেবুশ্যে-মাগী। ফিরে এসে যেন আর তোকে না দেখি!

পতির আদেশই তো পালন করেছে আঙ্গুরবালা। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী

চৌধুরাণীর প্রফুল্লকে……

তবে মজার কথা, বিধাতা পুরুষও বেশ রসিকতা জানেন। তা নইলে আবার একই তীর্থে দুজনের দেখা হবে কেন?

কিন্তু তাই বলে কি এ অস্বাভাবিক? তাই বা বলি কী করে? ভদ্রঘরে কি দেখিনা, সারা জীবন প্রেম করার পর প্রেমিকা অন্য পুরুষকে বিয়ে করে পরের ঘর করছে। পূর্ব প্রেমিক হয়তো ঘুরে ফিরে তার বাড়ীতেই বাজার সরকারী অথবা ছাত্র পডাবার চাকুরী নিয়েছে।

রস সাহিত্যিক অরবিন্দ মুখোজ্যে মশাই (এখন খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক) একটা কবিতা, সোনারতরী নামে এককালে প্রকাশিত হাসির পত্রিকায় দেখেছিলাম, তার শেষ লাইনদুটো যদ্দূর সম্ভব এইরূপ,

'ধনীর দুলাল হরণ করিল মারিয়া টাকার থাবা তার,

প্রিয়ার পুত্র মামা বলি ডাকে, হতে পারিতাম বাবা তার।'

এর চেয়ে আরও হৃদয় বিদারক কবিতা মুখোজ্যে মশাই লিখেছিলেন, যুগান্তরে।

'ওগো আমার সই

তোমায় পেলাম কই,

তোমার বিয়ে হলো যেদিন

কোমর বেঁধে আমি সেদিন

পরিবেশন করেছিলাম

ছ্যাচড়া এবং দই।'

সে তুলনায় দ্বিজু চৌধুরী আঙ্গুরবালার সাক্ষাৎ কি বেশী মর্মান্তিক?

সুবর্ণর ওখানে কার্তিকপূজার দিন রাত্রে যেতে পারিনি। পারিনি মানে যাইনি। সুনীল বাড়ুয্যে দাদা বলতেন, দিনের বেলা যাও দোষ নেই ভায়া, কিন্তু রাতের বেলায় কখখনো ওপাড়ায় গেছো কি মরেছো।

কিন্তু একথা সুবর্ণকে বোঝানো মুস্কিল।

বললো, কেন শুনেন নি, এ দিনটেতে আমরা মদ পর্যন্ত স্পর্শ করিনে।

বললাম, কী করে শুনবো বলো? আমি তো এ পাড়ার বিষয়ে অথরিটি নই?

অবশেষে স্ববর্ণের অভিমান ভেঙেছিলো।

স্বাভাবিক ভাবে বলেছিলো, ঠিক আছে অজ্ঞানতাবশত বলেই রাগ তুলে নিলাম। বসুন চা করে আনি। না কি কমলরাণীর ওখানে ওপর্ব চুকিয়ে এসেছেন ?

বললাম, না, ওটি বাসায়ই চুকেছে। যদিও 'না' করলে বিপদ আছে তাই চেপে যাচ্ছি।

সুবর্ণ চা করতে পাশের কামরায় গিয়েছিলো। আমিও টেবিলের উপর থেকে একটা কিছু টেনে নিয়ে পড়তে যেয়ে একটা খাতা টেনে নিলাম। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টোতে যেয়ে চমকে উঠলাম।

তাজ্জব! হ্যাঁ আশ্চর্যই। সুবর্ণর লেখা প্রবন্ধ। গোটা গোটা মুক্তোর মতো হরফে লেখা। একটি বিনোদিনী। অপরটি তারাসুন্দরী সম্পর্কে।

আরও উল্টোতে দেখলাম, উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকে বিভিন্ন মঞ্চাভিনেত্রী সম্পর্কে টুকিটাকি পয়েন্টস্।

তন্ময় হয়ে পড়েছি। লেখার স্টাইল তেমন ভালো নয়, কিন্তু আন্তরিক। সবচেয়ে বড় কথা তথ্যমূলক।

এর কিছু অংশ সুবর্ণ এর আগে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলো। কিছু অংশ নতুন।

আমি নিজে বিনোদিনী সম্পর্কে বেশী কিছু জানতাম না। এততো নয়ই।

কখন যে সুবর্ণ চা নিয়ে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলো আমি লক্ষ্য করিনি। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে লজ্জিত কণ্ঠে বললো, খাতাটা দিন। ও দেখতে হবে না।

চমকে উঠে বললাম, দেবো, তবে বাসায় নিয়ে পড়ে দেবো।

সুবর্ণ বললো, ওঁদের সম্পর্কে ওগুলো আমার কথা নয়। এখানে সেখানে এবই সেবইয়ে যা নজরে পড়েছে টুকে রেখেছি মাত্র। এ একধরণের ছেলেমানুষী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খাতাটি নিরাপদ দূরত্বে রেখে বললাম, বেশতো আমি তোমার বুড়োমানুষী দেখতে তো চাইনে সুবর্ণ।

সুবর্ণ কী ভাবলো জানিনে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, বেশ, একটা কথা রাখতে হবে কিন্তু।

—কি ?

—আর কাউকে দেখাতে পারবেন না কিন্তু !

বললাম, কথা দিলাম।

ছেলেবেলায় গঙ্গাবাঈজী নামে নৃত্যগীতপটিয়সীর কাছে বিনোদিনীর গান বাজনা শেখা। বিনোদিনী সম্পর্কে সুবর্ণের সংগ্রহের মধ্যে দেখলাম। বিনোদিনী থিয়েটারে আসেন পূর্ণচন্দ্র নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে। এখানেই গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে স্বীয় শিষ্যা করে নেন। যতদূর জানা যায়, বিনোদিনীর প্রথম বই শত্রুসংহার নাটক। এই বইয়ে দ্রৌপদীর এক সঙ্গিণীর ভূমিকায় নামেন বিনোদিনী।

কিন্তু বিনোদিনী সার্থক অভিনয় করলেন এর পরের বইয়ে। 'হেমলতা' বইয়ে হেমলতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হলেন বিনোদিনী। দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে বরণ করে নিলো এই উজ্জল ভবিষ্যৎসম্পন্না অভিনেত্রীকে।

বিনোদিনীর মনোরমার ভূমিকা সম্পর্কে অপরেশবাবুর মন্তব্যের সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য দেখলাম। 'স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, আমি মনোরমার চরিত্র বইতেই লিখেছিলাম। কখনও মনে করিনি যে, মনোরমাকে প্রত্যক্ষ করবো।

আজ মনোরমাকে দেখে আমার মনে হল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখছি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য বইতেও বিনোদিনী অভিনয় করেছেন। আয়েষার ভূমিকায় বিনোদিনী যেমন অনবদ্য অভিনয় করেছেন, তিলোত্তমা রূপিণী বিনোদিনী তেমনি দর্শক চিত্ত জয় করেছেন। বিনোদিনী লিখিত 'আমার জীবন' পুস্তকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র বসু কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে এ প্রকৃত 'মৃণালিণী'র মনোরমা। বিনোদিনীর গান ও অভিনেত্রীর সকল ভূমিকা গ্রহণেরই উপযুক্ত—যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, রাজরাণী হইতে ফতী

পর্যন্ত সকল ভূমিকায় উপযুক্ত।" ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই গিরিশচন্দ্র দুর্মুখ রায়ের সহায়তায় 'স্টার' এর প্রতিষ্ঠা করলেন। স্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে। বিনোদিনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্পর্কে স্নুবর্ণর সংগ্রহ তালিকায় রয়েছে, দক্ষযজ্ঞ নাটকের কথা। সতীর ভূমিকায় বিনোদিনী। ধ্রুব চরিত্র নাটকের স্নুরুচি বিনোদিনী। নলদময়ন্তীতে দময়ন্তীরূপিণী বিনোদিনী। এরপর চৈতন্যলীলা। চৈতন্যলীলায় চৈতন্যরূপী বিনোদিনীর কথা আগেই শুনেছি অবশ্য। বিনোদিনী গঙ্গাস্নান ও হবিষ্য করে এই ভূমিকায় নামতেন। এখানেই ঠাকুর বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, তোর চৈতন্য হোক। এই আশীর্বাদ বিনোদিনীর জীবনে পরম সম্বল হয়ে দেখা দিয়েছিলো। অমৃতলাল লিখেছেন,

বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়,
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হ'লেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণ পায়।

গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী পছন্দ করতেন। বিষবৃক্ষের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা হলো। গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা গ্রহণ করলেন, রামতারণ সান্যাল দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা। শ্রীশ হলেন মহেন্দ্র বসু, সূর্যমুখী কাদম্বিনী, আর কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় বিনোদিনী।

দুর্গেশনন্দিনীতে গিরিশচন্দ্র জগৎসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ওসমান হলেন মহেন্দ্র বসু। বিনোদিনী আয়েষার ভূমিকায় আসর মাত করে দিলেন। বিমলার ভূমিকায় কাদম্বিনী, বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী।

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার গিরিশচন্দ্র লিজ নিয়েছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী-র কাছ থেকে ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত হয় ১লা ডিসেম্বরে। 'মেঘনাদ বধে' গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্র ও মেঘনাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমৃত মিত্র হন রাবণ। মন্দোদরী সাজেন কাদম্বরী দাসী, চিত্রাঙ্গদা ও মায়ার ভূমিকায় নামেন লক্ষ্মীমণি দাসী। শচী সাজেন বসন্তকুমারী। খোঁড়া কুসুমকুমারী রতি বাসন্তী।

নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসার অভিনয় করে ক্ষেত্রমণি। আর প্রমীলার ভূমিকায় শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী (দেবী নয়। হেমেন্দ্র কুমার রাজশেখর বসু মশায়ের মত উল্লেখ করেছেন এক জায়গায়, 'সিনেমাওয়ালীরা দেবীর জাত মেরে দিয়েছে)।'

'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে ১৮৭৮ সালের 'সাধারণী' বিনোদিনী সম্পর্কে লিখেছিলো "অভিনেত্রীরা সকলেই ভাল, প্রমীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

অবশ্য ঐ সঙ্গে একটু কটাক্ষ যে না করেছিলো তা নয়। লিখেছিলো, 'নাট্যমঞ্চ হইতে অপসৃত হইবার সময় অভিনেত্রীরা একটু কোমল ভাবাবলম্বন করেন, আমাদের এই ইচ্ছা। প্রমীলা যে ভাবে লাফাইয়া যান, তাহাতে রামায়ণের সার্থকতা হয় বটে, কিন্তু একটু রসভঙ্গ হয়।"

শোনা যায় এই ভুবনবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরির এলোকেশী নামে এক সধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভ্রষ্টাচার নিয়ে লেখা 'মোহান্তের এ কি কাজ' নামক নাটক দেখতে এসে ভিড়ের জন্য টিকিট পান না। এমন কি চার টাকার টিকেট আট টাকায় পর্যন্ত বিক্রী হচ্ছিল। নিজে অপমানিত বোধ করে জেদ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলেন।

বলা বাহুল্য "সাধারণীর নাট্যসমালোচনা নাট্যজগতের অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত।"

'মেঘনাদ বধে'র কিছুদিন পরই গিরিশচন্দ্র কবি নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ কাব্য মঞ্চস্থ করেন। কাজটি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক।

এখানে ক্লাইভের ভূমিকা গ্রহণ করেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। বেগম সাজেন লক্ষ্মীমণি দাসী। বিনোদিনী ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হন।

বিনোদিনীর মনোরমা সম্পর্কে সাধারণীতে যে সমালোচনা বেরয় গিরিশচন্দ্রের লেখা ভূমিকা তার সার্থক প্রমাণ। সাধারণী লিখেছিলো,... মনোরমার অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহা হইয়াছিল। কখনও মনোরমার হৃদয়ে বালিকা উন্মাদিনীর ছায়া, কখনও বা প্রৌঢ়ার ভাব ব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণে কৃতকার্য্যতা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলাম।...বঙ্গীয় রঙ্গভূমে অভিনেত্রীদিগের মধ্যে যে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইবে, তাহা আমাদের পূর্ব্বে

কখনই বিশ্বাস হয় নাই।”

কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত বদলের পর হাত বদল হতে থাকে।

এই সব থিয়েটার কেন ঠিকমত চলতো না এ সম্পর্কে হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত মশায় তাঁর ‘ভারতীয় নাট্যমঞ্চে’ বিনোদিনীর উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন।

বিনোদিনী বলেছেন, ‘লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া এক বাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দেখিতেছি, কি সব জিনিষটা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না ; এত বিক্রয় সত্বেও কেন যে ধনী সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেন তাহা আমি বলিতে পারিনা। লোকে বলিত এই যায়গাটা হানা যায়গা। এই স্থানের ভূমিযত্র অনুকূল নহে।’

অবশ্লেষে থিয়েটারের বাড়ী কিনলেন প্রতাপ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারী। গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার হতে রাজী হলেন। আবার দল গঠিত হলো। একারকার বই সুরেন্দ্র মজুমদারের ‘হামির’।

হামিরে লীনার ভূমিকায় নামলেন বিনোদিনী। পান্নার ভূমিকায় বনবিহারিনী। কমলা সাজলেন কাদম্বিনী।

কিন্তু হামির বেশী দিন চললোনা।

এরপর দু একটা এবই সেবই করে নাটকের অভাবে পুরোনো পলাশীর যুদ্ধ মঞ্চস্থ করলেন গিরিশচন্দ্র। সঙ্গে জুড়ে দিলেন ‘মায়াতরু’।

হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ফুলহাসির গানে ও কথায় বিনোদিনী বড় বাহবা পায়। Reis ও Rayyat কাগজেও বাহির হয়—এই রকম ভূমিকায় In this light role Binodini is simply charming.

বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, বিনোদিনীর কণ্ঠে ‘নাজানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।’ গানটি শুনে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

এর কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক লিখলেন। আনন্দ রহো। এটাই তাঁর প্রথম নাটক।

‘আনন্দ রহো’ তে লীলার ভূমিকায় নামলেন বিনোদিনী। কিন্তু এ নাটকে অর্থাগম হলোনা। গিরিশচন্দ্র অবশেষে নতুন নাটক লিখলেন রাবণবধ।

গিরিশচন্দ্র নিজে রামের ভূমিকায় নামলেন। ক্ষেত্রমণি একা করলেন

চারটে পার্ট। মন্দোদরী হলেন কাদম্বিনী। সীতার ভূমিকা নিলেন যশস্বিনী বিনোদিনী।

এই রাবণ বধের উল্লেখ করে বিনোদিনী লিখেছেন, 'রাবণ বধের সময় হইতে থিয়েটারে স্থান সঙ্কুলান হইত না।'

গিরিশচন্দ্র ও তাঁর নাটক পেয়ে ন্যাশনালের যখন জমজমাট, এমনি সময় গিরিশবাবুর সঙ্গে প্রতাপ জহুরীর মনোমালিন্য ঘটলো। ঘটলো বিনোদিনীকে নিয়েই। গিরিশবাবু বিনোদিনীকে কন্যাসমা স্নেহ করতেন। একবার বিনোদিনী অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন। জহুরী বললেন, বেতন দেওয়া হবে না।

এ নিয়ে গিরীশবাবুর সঙ্গে প্রতাপ জহুরীর কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। গিরিশবাবু ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের' কিছুদিন পরে জহুরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন।

বিনোদিনীও সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার ছেড়েছিলেন। ক্ষেত্রমণি, গঙ্গামণি বাঈ এরাও ছাড়লেন।

ভালবেসে বিনোদিনী দাগাও পেয়েছিলো। প্রতাপ চাঁদ জহুরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন গিরিশচন্দ্র। বিনোদিনীও। উভয়েরই চিন্তা একটা নতুন থিয়েটার খোলা যায় কিনা?

বিনোদিনীর বাবু এই সময় এক ধনী যুবক। সুদর্শন। সর্বোপরি অবিবাহিত। কিন্তু তার ইচ্ছে নয় বিনোদিনী দশের আকাঙ্খার ধন হয়। দশজনের নয়ন তৃপ্ত করে।

ইচ্ছে বিনোদিনী থিয়েটার বাতিক ছাড়ুক। তার একার হয়ে থাকুক। যত টাকা চায় সেজন্য তা তিনি দেবেন।

বিনোদিনী বললে, কিন্তু তার শিল্প সাধনা,—তা ছাড়বে কী করে।

যুবক বললেন, বেশতো, পয়সা নিয়ে তাহলে সে থিয়েটার করতে পারবেনা।

বিনোদিনী কী করে। পরামর্শ চায় মায়ের কাছে। গুরু গিরিশচন্দ্রের কাছে।

মা বলেন, বলিস কি। আজ না হয় এবাবু আছে। কাল যদি না থাকে! তখন আখের গুছোবি কী করে?

গিরিশ বলেন, তাহলে ওকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়। সে যে প্রতি অঙ্গে জড়িয়ে আছে।

তাহলে উপায় ?

উপায় অবশ্য আছে। মাইনে নেবার কথা গোপন করতে হয়। কিন্তু তাই কি পারা যায়। যদি জিজ্ঞেস করেন ? মনের মানুষের কাছে মনের কথা গোপন করবে নাকি ! হলেই বা দেহ ব্যবসায়িনী। কিন্তু বেশ্যা বিনোদিনীর প্রেমের মর্যাদা কি দিয়েছিলো সেই প্রেমিক। দেশে ফিরে যেয়ে বিয়ে করে বসলো। খোঁজও নেবার প্রয়োজন বোধ করলোনা, তার আশাপথ চেয়ে আর একজন দিন গুনছে।

এরপরই স্টার থিয়েটারের সৃষ্টি।

'ষ্টার' থিয়েটার পত্তনের ব্যাপারে বিনোদিনীর সক্রিয় অংশ ছিলো। ত্যাগও ছিলো। গুর্মুখ রায় নামে এক শিখ যুবক বিনোদিনীকে দেখে আত্মবিস্মৃত হয়। থিয়েটারের মালিক হলে বিনোদিনীকে পাওয়া সহজ হবে, এই ভেবে তিনি একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে রাজী হন। গুর্মুখের ইচ্ছে ছিলো, থিয়েটারের নাম হোক বিনোদিনী থিয়েটার বা বি, থিয়েটার। প্রস্তাবটা তিনি বিনোদিনীর মাকেও দিয়েছিলেন।

গিরিশবাবুর এ ব্যাপারে মত ছিলোনা বলেই থিয়েটারের নাম হয় ষ্টার থিয়েটার। হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত মশায় বলেন, এ সম্পর্কে গিরিশবাবু বিনোদিনীর মাকে বুঝিয়ে বলেন,

'বিনোদিনীর মা, আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি, আমরা অন্যের ঘাড়ে বোঝা রাখিয়া থিয়েটার চালাইব। আমার নাটকের নায়িকার পার্ট বিনোদ ছাড়া অন্য কেহ তো পারিবেনা। আর থিয়েটার নিয়া ঝঞ্ঝাট বড় খারাপ। চালাইতে না পারিলে তোমার বাড়ীখানা পর্যন্ত নিয়া টানাটানি পড়িবে।' বিনোদিনীর মা মেয়েকেও নিবৃত্ত করেন।

তা না হয় করলো। কিন্তু বিপদ বাধালো পূর্বপ্রণয়ী। তাকে তো ছাড়তে চায়নি বিনোদিনী। শুধু থিয়েটারের মোহে মেনে নিয়েছিলো। একদিন সে এসে হাজির। বলে, গুর্মুখ রায়কে ছাড়তে হবে। দশহাজার টাকা দোব। বিশ হাজার দোব।

আবার সেই টাকার লোভ। লোভ দেখানো। বিনোদিনী দরজার পথ দেখালো প্রেমিক কে! গুর্মুখ রায়কে সে কথা দিয়েছে। তাই নাকি কোষবদ্ধ অসি ঝলসে উঠলো যুবকের হাতের। মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করলো বিনোদিনী। টেবিল হারমোনিয়ামে কোপ পড়লো। এবার মরিয়া হয়ে উঠে দুহাত জড়িয়ে ধরলো বিনোদিনী।

অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন, 'বিনোদিনী বললে, আমাকে খুন করার বীরত্ব কী। আমার কলঙ্কিত জীবন শেষ হয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। তোমার কী হবে? একটা বারাঙ্গনাকে হত্যা করে ফাঁসি যাচ্ছ তাতে কী মুখোজ্জ্বল হবে তোমার? তোমার স্ত্রীর? তোমার পরিবারের?'

যথাসময়ে ৬৮ নম্বর বিডন ষ্ট্রীটে 'ষ্টার থিয়েটার (১) খোলা হয়। 'দক্ষযজ্ঞ' এ থিয়েটারের প্রথম বই।

গুর্মুখ রায় 'স্বজাতির তাড়নায়' থিয়েটার ছেড়ে দেন। গিরিশবাবু, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু মশায়দের স্বত্বাধিকারী করে দেন।

এরপর 'ষ্টারে' চৈতন্যলীলার অভিনয়ে দেশব্যাপী নব ভাবের বন্যা বয়ে নিয়ে এলো। স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেখতে এসে বারবার সমাহিত হন। কর্ণেল অলকট্ সাহেব চৈতন্য লীলায় বিনোদিনীর ধর্মভাব দেখে অতীব বিস্মিত হন এবং অসাধারণ প্রশংসা করেন। হেমেন্দ্রবাবু লিখেছেন, গিরিশচন্দ্রের গৌরাঙ্গ মূর্তির ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা। পুরুষ প্রকৃতি একসঙ্গে জড়িত।' এই মহাপুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহ-বিধুরা রমণীর আভাষ পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত।'

বিনোদিনীর অভিনয় দেখে, অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। রামকৃষ্ণদেবও গিরিশকে কোলে

---

(১) এই ষ্টার থিয়েটার এখন নেই। এর উপর দিয়ে যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) চলে গেছে। থিয়েটার বাড়ীটা ছিলো বিডন ষ্ট্রীটের উত্তর পারে। বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের প্রায় উল্টো দিকে।

তুলিয়া লইলেন এবং বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করিলেন 'তোর চৈতন্য হোক।'

নাট্যাচার্য অমৃত বসু এই চৈতন্যলীলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। গীতা ও চৈতন্য চরিত্রের বিভিন্ন সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় অভিনয় দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় গ্রন্থকারের পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "গৌর তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

স্ববর্ণর সংগ্রহে এর পর কিছু কিছু মন্তব্য রয়েছে। তারপর পূর্বসূত্র ধরে লিখেছে, স্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদ চরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস, প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন ইত্যাদি নাটক বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সব নাটকেই বিনোদিনীর বাঁধা ভূমিকা।

স্ববর্ণ লিখেছে, বিনোদিনীর বৈশিষ্ট্য ছিলো, কী সিরিঅ্যাস্, কী কমিক রোল্, উভয় ভূমিকায়ই বিনোদিনী আসর মাৎ করতেন। মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে ফতীর ভূমিকা দেখে লোকে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে। 'বিবাহ বিভ্রাটে' অমৃতবাবুর মিঃ সিং এর ভূমিকা ও বিনোদিনীর বিলাসিনী কারফর্মার ভূমিকা দর্শকচিত্ত চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছে। অবশ্য সর্বাপেক্ষা ভাল অভিনয় করেন ক্ষেত্রমণি ঝির ভূমিকায়। ক্ষেত্রমণির অভিনয় দেখে ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসন বলিয়াছিলেন যে বিলাতেও এরূপ শক্তিশালী অভিনেত্রী সর্বত্র পাওয়া যায়না।

ষ্টারের 'বিল্বমঙ্গল' এক কথায় অপূর্ব। 'গঙ্গাবাঈর পাগলিনীর গানে, ক্ষেত্রমণি থাকমণির প্রকৃষ্ট অভিনয়ে এবং বেলবাবুর সাধকের আর তুলনা ছিলনা। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তার তো কথাই ছিল না। বিল্বমঙ্গল হইতেন অমৃত মিত্র, চিন্তা বিনোদিনী।'

এরপর স্ববর্ণ বিনোদিনীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে লিখেছে, সমাজের অন্য নারীর মতোই ঘর বাঁধার সাধ বিনোদিনীরও ছিলো। এ সম্পর্কে বিনোদিনীর নিজের উক্তি উল্লেখ করেছে স্ববর্ণ। বিনোদিনী বলেছেন, 'পতিপ্রেমের সাধ আমাদের আছে, কিন্তু কোথায় পাইবো। কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে

হৃদয় দান করিবে।' বিনোদিনী হৃদয় দান করেছিলেন। একটা কন্যা সন্তানও লাভ করেছিলেন। কিন্তু সুকুমারী দত্তের মতই তার মেয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে যেয়ে সমাজের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। যারা তাঁর অভিনয় জীবনকে শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে সুনজরে দেখেন নি।

বড় দুঃখে বিনোদিনী বলেছেন, "বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে?"

স্টারে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হবার সময় থেকেই বিনোদিনীর সঙ্গে গিরিশ বাবুর মন কষাকষি সুরু হয়। গিরিশবাবু সত্য সত্যই বিনোদিনীকে কন্যাসমা স্নেহ করতেন। বিল্বমঙ্গলে চিন্তার ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দর্শকচিত্ত জয় করলো। 'ভাব সম্মত ও প্রকৃষ্ট' হলেও, সঙ্গীত ও অভিনয়ে গঙ্গারই প্রশংসা হলো বেশী।

আগে থেকেই কোন কোন ব্যাপারে বিনোদিনীর অভিমানে গিরিশবাবু ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন। এবার বিনোদিনীর যেন স্পষ্টই মনে হলো গিরিশচন্দ্র ইচ্ছে করেই বিনোদিনীর ভূমিকাটির এমন রূপ দিয়েছেন, যাতে বিনোদিনী আরও ভালো করার সুযোগ না পায়।

এই সময় বিনোদিনীর বাবু ছিলেন, এক 'রাজা' খেতাবধারী এক ধনবান ব্যক্তি। তাঁরও ইচ্ছে ছিলোনা বিনোদিনী থিয়েটারে অভিনয় করে।

এই দুই কারণে বিনোদিনী থিয়েটার ছেড়ে দেন। পরিপূর্ণ খ্যাতির মধ্যে এমন একজন অভিনেত্রীর অভিনয় জীবন এখানেই শেষ হয়।

বাংলা নাট্যমঞ্চ, বাঙালী দর্শক এমন একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে অকালে হারায়। বিনোদিনী সত্যই দর্শকচিত্ত-বিনোদিনী।

এর পর বিনোদিনী সংসার ধর্ম করলেও ধর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

হেমেন্দ্র বাবু লিখেছেন, 'বিনোদিনী দীর্ঘকায়া ছিলেন। নিজেই রূপ সজ্জা

খুব ভাল করিতে পারিতেন। আর অভিনয়ও খুব ভাল করিতেন। পত্রিকা সম্পাদকগণ তাহাকে তখন Prima Donna of the Bengali Stage আখ্যা দিয়া অভিনয়ের প্রশংসা করিতেন।' হেমেন্দ্র বাবুর কথায়, 'অভিনয়ে আজ পর্য্যন্ত তাহার সমকক্ষতা কেহ করিতে পারে নাই।'

থিয়েটার ছাড়ার পরও বিনোদিনী দীর্ঘদিন জীবিতা ছিলেন। থিয়েটার আর সিনেমা শিল্পী (তখন অবশ্য সিনেমা শিল্পের কথাই ওঠেনা) একবার মঞ্চ বা পর্দা ছাড়লে কেউ বড় তাঁদের খোঁজ খবর রাখেনা। আজকালকার মতো পুরোনো শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা বা সভাসমিতি ডেকে মানপত্র দেবার রেওয়াজও ছিলোনা। Out of sight, out of mind, চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল। আর এজন্যেই বিনোদিনীর শেষ জীবনের সব কথা জানা যায়না।

তবে এটা সত্যি তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন। গিরিশবাবু তাঁকে, শুধু তাঁকে নয় অনেককে, বহু ইংরেজী বই থেকে অভিনয় সম্পর্কে বহু কথা পড়ে শুনাতেন। বিদেশী অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী, অভিনয় ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এদেশে যে সব বিদেশী বই অভিনীত হতো, তার বিশেষ বিশেষ পার্ট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গিরিশচন্দ্র শিষ্যশিষ্যাদের ঐ সব অভিনয় দেখিয়ে নিয়ে আসতেন।

W. S. Gilbert নামে এক ব্যক্তি Pigmalion and Galatea নামে এক ইংরেজী অপেরা লেখেন। কোলকাতার থিয়েটার রয়েলে তা অভিনীত হয়। Galatea-র ভূমিকায় নামেন মিস্ ফ্যানী এনসন নামে এক মহিলা। তিনি কোমল ভাব দেখাবার ব্যাপারে অপূর্ব পারদর্শিনী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিনোদিনী ও রামতারণ প্রভৃতি অনেককেই এই অপেরা দেখিয়ে আনেন। 'মোহিনী প্রতিমা' নামে যে নাটক গিরিশবাবু মঞ্চস্থ করেন তাতে এই বইয়ের ছাপ আছে। সাহানার ভূমিকাটিও Galatea-র ভাবধারায়। এতে বিনোদিনী অভিনয় করেন। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব শিক্ষাগুণে বিনোদিনী এমন প্রতিভাময়ী হতে পেরেছিলেন। অবশ্য ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, বিনোদিনী খণি মধ্যস্থিত হীরক, গিরিশচন্দ্র তাকে সংস্কার করে তার দ্যুতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বিনোদিনী নিজেও গিরিশচন্দ্র ও তাঁর শিক্ষাদান সম্পর্কে বলেছেন, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশগুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম তখন আমার মনে হইত না যে, আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র।'

বিনোদিনীর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজেও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বলেছেন 'রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।'

বিনোদিনীর বিদ্যালয়গত বিদ্যা বেশী ছিলোনা, কিন্তু পড়াশুনা ছিলো। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রেখে গেছেন। নাট্যমঞ্চ ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য।

গিরিশবাবু বরাবরই বিনোদিনীকে স্নেহ করেছেন। অনেক পরে (১৯০৭ সালে) একদিন তারাসুন্দরী বলছিলেন, তারা যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, তাদের নিশ্চয় আর উদ্ধার নেই।

গিরিশবাবু তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, এমন কথা বলোনা তারা, তোমার বিনি মাসীর কথা শোন নাই? ঠাকুর চৈতন্যের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে ওরে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—মা তোর চৈতন্য হোক।

এমন সময় অবিনাশবাবু বললেন, বিনোদিনী এখন গোপালের সেবায় তৎপর আছেন।

গিরিশবাবু কথাটি শুনে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা সকলেই মনে রাখবে তিনি দীননাথ, তিনি কাকেও বিমুখ করবেন না।

তিনকড়ি দাসী গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মশায়, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমাদের পাপার্জ্জিত অর্থে কি কোন সদ্ব্যয় হতে পারে?

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, নিশ্চয়ই হতে পারে।

স্নবর্ণ এর নীচে বড় বড় করে লিখেছে, আমাদের জীবনও ব্যর্থ নয়। আমাদের অঞ্জলিও ঠাকুর গ্রহণ করেন। তা নাহলে, সেই পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের ছবি তখনকার দিনে অধিকাংশ রঙ্গালয়ে থাকতো কেন? ঠাকুর পতিত-পাবন বলেই তো!

স্বর্ণর খাতা বন্ধ করে আমিও সমস্ত অন্তর দিয়ে বলে উঠলাম, কে বলে তোমাদের জীবন ব্যর্থ স্বর্ণ! নিশ্চয়ই তোমাদের অঞ্জলি ঠাকুর গ্রহণ করবেন। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের কথা কি মিথ্যে হতে পারে!

বারবণিতাদের ভালবাসাবাসির খেলায় মজতে নেই। ওতে মজলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবু যে কেউ পড়েনা তা নয়। সাবধানী যারা তাদেরও একটি আধটি ভালবাসার মানুষ থাকে।

দ্বিজু চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। সেই যে গিলেকরা পাঞ্জাবী গায় দিয়ে একদিন 'টুকু' দিয়ে গেলো, তারপর কদিন আর দেখা নেই।

হঠাৎ সেদিন দুপুরের পর এসে হাজির।

গম্ভীরভাবে সেই টাকা কয়টি আর লেখার টাকার তাগাদা দিতেই, চৌধুরী বলে উঠলো, আরে দাদা চেকটাই এখনও ভাঙাতে পারিনি। নিজেরতো অ্যাকাউন্ট নেই ব্যাঙ্কে, তাই পরিচিত এক ভদ্রলোকের নামে 'এনডোরস্' করে দিয়েছি। ক্যাশ হয়ে এলেই তোমার টাকাটা আগে দিয়ে তবে অন্য কথা।

জানি মিথ্যে কথা। তবু এমনভাবে বলবে যে সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস করার উপায় রাখবে না।

বললাম, সে কদ্দিনে ঘটবে চৌধুরী?

চৌধুরী বললো, কদ্দিন আর, হপ্তাখানেক! ভালোকথা, সেদিন কাতিক পুজার রাত্রে গেলেন না যে বড়!

বললাম, কেন তুমিও কি নিমন্ত্রিত ছিলে নাকি চৌধুরী?

চৌধুরী বললো, আরে মশায় আমরা হলুম গিয়ে ঢাকের বায়া। আর ওদিনের নিমন্ত্রণে সব নিরামিষ স্ফূর্তি।

—বলকি চৌধুরী?

চৌধুরী বললো, সব জায়গায় নয়। কিন্তু ঐ যে তোমার স্বর্ণ ছুঁড়িটা, এ ব্যাপারে খুব সিরিয়াস্। নিজে মাল টানবে না। বলে কিনা, টাকা দিচ্ছি তোমরা বাইরে খেয়ে নিও। বল দেখি ভায়া হোস্টেস্ যদি না খায় তাহলে কি আর স্ফূর্তি জমে! কী বল ভায়া।

বললাম, তাই নাকি?

চৌধুরী বেদনার্ত কণ্ঠে বললো, অবশ্য সারা রাত ধরেই গানবাজনা চলেছিলো। এসেছিলোও আরও কজন মক্কেল। সবই বন্ধু বান্ধব। পিয়ারের লোক। ওদিন তো আর টাকা দিয়ে লোক বসায়না ওরা! ওদিন কেবল গান বাজনা ফূর্তি! তা জমেছিলো খুব। একটাই তো উৎসব আমাদের ওপাড়ার।

বললাম, সবাই বুঝি পূজো করে চৌধুরী?

চৌধুরী বললো, আরে না। যারা পারে তারা করে। বারোয়ারীভাবে এক এক বাড়ীও করে, আবার আলাদাও করে। অবশ্য কোন পেয়ারের বাবু রসিকতা করার জন্য প্রতিমা কিনে মুটে দিয়ে 'ফিয়াসী'র বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কেউ কেউ আবার মনের মেয়েমানুষের কষ্ট হবে বলে 'উদ্যোগ আয়োজন'ও ঐ সঙ্গে পাঠায়,.মায় পুরুত পর্যন্ত। তারপর ধীরে সুস্থে সেজে গুজে ইয়ার বক্সী নিয়ে রাতের বেলা কুঞ্জে এসে দেখা দেন। তারপর চলে সারারাত ধরে হৈ হুল্লড়, মদ্ ভাঙ্। সে দৃশ্যই দেখলে না ভায়া! কী দেখলে তাহলে আজব সহর কোলকাতার!

তা সত্যি মস্ত বড় সুযোগটা এমন করে ফস্কে গেলো দেখে একটু আপশোস্ যে না হলো তা নয়। না হয় সুনীল ব্যানার্জির নিষেধটা একদিনের জন্য অমান্য করতুমই! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলে সেই হংসবন মধ্যে আমি এই চড়ুই পাখী না যেয়ে হয়তো ভালোই করেছি।

চৌধুরী তখনও বলে চলেছে, এদিনের অতিথি কারা জান ভায়া, বাছা বাছা পেয়ারের মানুষ। রামা শ্যামার 'এন্ট্রান্স্' নেই। হাসি আর গয়না পত্তরের জেল্লাতে, সেণ্ট পাউডারের গন্ধে সারা পাড়া ময়ময়। মদের স্রোতে রাস্তার কুকুরটা পর্যন্ত অন্য খাবার খায় না। আহা, রায় মশাই কার্তিকপূজাটা যদি মাসাবধি থাকতো!

পরক্ষণেই ভোঁস্ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো চৌধুরী, না মনটা খারাপই হয়ে গেল ভায়া। চল যাই একটু বেড়িয়ে আসি। ওরাও সেদিন দুঃখ করছিলো।

জামাটা গায় দিয়ে বেরুলাম। না, কমলরানীদের ওখানে যাবার জন্য নয়। এমনি। সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় লিবার্টি সিনেমা

হলের (তখন যেন কী নাম ছিলো হলটার) কাছ দিয়ে যেতে যেতে চৌধুরী বললো, একটা সিনেমা দেখলে মন্দ হতো না। দেখাবেন নাকি রায় মশায়? শুনেছি বইটে নাকি বেশ ইয়ে।

বললাম, আমার টাকাটা ফেরৎ দিলে দেখাবো।

চৌধুরী বললো, বেশতো তাহলে চলুন আমিই দেখাই।

বলে কি চৌধুরী! চৌধুরী নিজের পয়সায় সিনেমা দেখাবে? না, চৌধুরীটাকে যতখানি বাটপার ভেবেছিলাম তা নয় দেখছি।

মুখে বললাম, না থাক। পরের পয়সায় সিনেমা দেখার বাসনা নেই আমার।

চৌধুরী বললো, ঐ তো আপনাদের দোষ মশাই। আপন ভাবতে পারেন না। না হয় ইয়ে পাড়াই থাকি, ইয়েদের দালালিই করি, তাই বলে আমিও যে একজন শিল্পী এটাও যদি আপনার মতো লোক ভুলে যান, তাহলে রামা শ্যামা তো আমাদের অন্য চোখে দেখবেই। আর সঙ্গীতশিল্পী, কথাশিল্পীরা তো একই শ্রেণী মশাই। অবশ্য আপনার সঙ্গে আমি নিজের তুলনা করছিনে। সত্যি বলতে কি এমন ধোয়া তুলসী পাতাটি হয়তো অনেকেই হয়না। একটু মদ ছুঁবেন না, ওদের সঙ্গে একটু আধটু ইয়ার্কী করবেন না। কমলমণিরা সেদিন বলছিলো, সতুবাবু একজন অদ্ভুত লোক।

গোপালী অবশ্য বলে, রায় মশায়ের চিত্ত নিশ্চয়ই অন্য কোথাও বাঁধা পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কোন ইস্কুল কলেজের মেয়ে!

ওঃ, চৌধুরীটা যা জপাতে পারে! হেসে বললাম, তাই বলে নাকি?

—বলেনা আবার? এ পাড়ায় আসবে, এবাড়ী সেবাড়ী যাবে, অথচ এক কাপ চা পর্যন্ত খেলে দশবার কাপ প্লেট অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখবে, যেন সিফিলিস্, গনোরিয়ার বীজাণু ওর মধ্যে কিল বিল করছে। জানিনে এপাড়া থেকে যেয়ে রোজ চান করো কিনা!

বললাম, হুঁ, আর কি কি করি চৌধুরী?

—এই দাদা দিদি পাতাও আর কি? তবে আর বেশী দিন নয়। গোপালী বলে, যারা প্রথমদিকে এরকম শুচিবাইগ্রস্ত হয় তারা নাকি পরিণতিতে তত বেশী বেশ্যা নেওটা হয়। গোপালী তো বলে, সাতদিনে অমন ভীষ্মের কৌমার্য ধ্বংস করে দিতে পারে। অবশ্য গোপালীর মা বলেছে, ওসব

কথা বলতে নেই।

বললাম, বুলেটের খরচ পোষাবেনা বলে বোধ হয়।

দ্বিজু চৌধুরী হেসে বললো, আচ্ছা সেকথা পরে জিজ্ঞেস করে দেখবো ভায়া। এখন একটু দাঁড়াও, আমি চট করে টিকিট কিনে আনি। দেখি আবার টিকিট পেলে হয়, যা ভিড়। আর হবেই বা না কেন, ঐ যে 'বয়স্কদের জন্যে' লেখা রয়েছে।

দ্বিজু চৌধুরী টিকিট কাটতে গেলো বাধা না শুনেই। নিশ্চয়ই দুখানা ইণ্টার ক্লাশ কেটে আনবে'খন (তখন ইণ্টার ক্লাশ ছিলো)। নাকি থার্ড ক্লাসে দেখাবে, তবেই সেরেছে!

অবসর পেয়ে পানের দোকানের সামনে যেয়ে এক প্যাকেট সিগারেট চাইলাম। আয়নার দিকে নজর পড়তেই মনে মনে হাসলাম, সত্যি বুলেটের দাম উঠবে না।

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, কোলকাতাতে দু'পাঁচশো টাকা রোজগার করে চরিত্রহীন হওয়া যায়না। বড় জোর ছ্যাঁচড়ামো করা যায়। বিলিতি টানলেও মাতাল হয়; ধেনো মদ খেলেও মাতাল হয়। কিন্তু তাই বলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাতাল কি আর ধেনো খেকোদের বলা যায় নাকি?

মাতাল নিয়ে অনেক রঙ্গরসিকতা আছে আমাদের দেশে ওদেশে।

দুই মাতাল অনেকরাতে বাড়ী ফিরছে। পথের এক ল্যাম্পপোষ্ট দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই খুলছে না। (আসলে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে তালা কোথায়?) অপর মাতাল বন্ধু তালা খুলতে পারছে না দেখে বলে উঠলো, হ্যাঁরে বোধ হয় এ বাড়ী আমাদের নয়। আমরা বোধ হয় ভুল বাড়ীতে এসেচি।

অপর মাতাল বললো, বললেই হলো ভুল বাড়ীতে এসেচি। দেখছিস্ না দোতলায় বাতি জ্বলছে!

আর এক মাতালের গল্প শুনেছিলাম, মাতলামী করতে করতে ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে সেই লাইনে ট্রাম আসচে।

ড্রাইভার বললো, এই ব্যাটা মাতাল, লাইন ছেড়ে চলতে পারিস না? সঙ্গে সঙ্গে মাতাল জবাব দিলো, আমি তো পারিনে, তুমি পারো?

এসব হচ্ছে বনেদী মাতাল। এসব কী আর সস্তা বোতলে আসে! বিশেষজ্ঞটি বলতেন, বেশ্যাবাড়ীতে একটা কাচের গ্লাস ভেঙে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একশ' টাকার নোট যে এগিয়ে দিতে পারেনা, তাকে আমরা বনেদী লোকই বলিনে।

দ্বিজু চৌধুরী একটু পরেই ফিরে এলো। হাতে দুখানা টিকেট।

বললো, নিন শীগগির ঢুকে পড়ুন, কাটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার আবার গোড়া থেকে বই না দেখলে ইনটারেষ্ট লাগেনা।

ঢুকলাম। ও হরি, এ যে দেখছি সেকেণ্ড ক্লাশ! অ্যাঁ! না, দ্বিজু চৌধুরীকে এতখানি ছোট ভাবা উচিত হয়নি আমার। লোকটা আজ অভাবে পড়ে, এমনটা হয়েছে বটে, আসলে লোকটার নজর বেশ উঁচুই।

বই তখনও আরম্ভ হয়নি। কাটিং চলছে। অন্ধকারেই সিট হাতড়ে বসলাম। কিন্তু বসার পূর্ব ক্ষণে আমার ডানপাশের সিটে মনে হলো একটা নারীমূর্তি যেন। হবেও বা।

চৌধুরীর দিকেই সরে বসলাম। কাটিং শেষ হলো। বাতি জ্বললো। এবার আর চিনতে কষ্ট হলোনা। হুঁ, কমলরাণীদের বাড়ীর ভাড়াটে। মেয়েটাকে কমলরাণীর ঘরেও দু চার দিন দেখেছি। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। নামটা যেন কী!

সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগলো, তাইতো এ শ্রীমতী এখানে কেন? তবে কি দ্বিজু চৌধুরী একেও নিয়ে এসেচে, নাকি কাকতালীয় ব্যাপার!

বাতি জ্বলতেই দ্বিজু চৌধুরী বাইরে নিয়ে এলো। একথা সেকথার পর বললো, মনে কিছু করবেনাতো ভাই, একটা কথা বলি, কমলা তোমাকে ভালো বেসে ফেলেছে। না, না তোমার টাকা পয়সা চায়না সে। আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে ধরেছে, তোমাকে পাইয়ে দিতে। আমি কথা দিয়েছিলাম।

বললাম, ফাঁদটা এত সুন্দর পেতেছো যে, রহস্যকাহিনীর মতো লাগছে। কত দালালী পেয়েছো?

চৌধুরী জিভ্ কেটে বললো, আরে ছি ছি, কী যে বল ভাই।

পরক্ষণে হাত ছুটো ধরে বললো, কিছু মনে করোনা দাদা, তোমার একটা পয়সা লাগবে না। শুধু ভালবাসার মানুষ। তুমি হয়তো জানোনা ভায়া ওরা হরবখৎ ভালবাসায় পড়েনা। ওদের ভালবাসায় পড়তে নেই। তবু পড়ে। উর্বশী পুরুরবার প্রেমে পড়েছে। সুজাতা পড়েছে। শ্যামা পড়েছে। তোমাদের রবিঠাকুর শ্যামাকে নিয়ে এক কাব্যনাট্য লিখে ফেলেছেন। প্রেমের জন্য শ্যামা তার স্তাবককে বলি দিয়ে ভালবাসার মানুষের জন্য সংসার ছেড়েছে। পরিণতি অবশ্য ভাল হয়নি। কিন্তু ওরা সামলাতে পারেনা।

বললাম, বক্তৃতা থামাবে চৌধুরী!

চৌধুরী অপ্রতিভ কণ্ঠে বললো, থামাবো। তবে আমার অনুরোধটা রাখো ভাই। তোমাকে দেখে ওর ভালো লেগেছে। ও জানে তুমি ধনী নও। তেমন সুরূপ, সুদর্শনও নয়। তবু তোমার কিছু বিশেষত্ব আছে এটা ঠিক। এ পল্লীতে এমন নিস্পৃহতা নিয়ে কেউ আসে না। এমন সহৃদয়তাও খুব বেশী দেখা যায় না। না না এসব আমার কথা নয়। ওরই কথা। তাই আমাকে ধরেছিলো, পয়সাতো কতই রোজগার করি, যদি রায় মশায়ের মত করাতে পারেন তাহলে সুখী হবো।

বললাম, সিনেমার পয়সাটা দিয়েছে কে চৌধুরী?

দ্বিজু চৌধুরী বললো, আর লজ্জা দিওনা ভাই। আমি সিনেমা দেখাবার পয়সা পাবো কোথায়। আমার কাছে কি বাড়তি পয়সা থাকে! টাকা দিয়ে আমাকে ছুপুরেই পাঠিয়েছিলো। আমি তিনখানা টিকিট কেটে একখানা কমলাকে পৌছে দিয়ে তারপর তোমার ওখানে গিয়েছিলাম।

বললাম, আমি যদি না আসতাম!

চৌধুরী বললো, সে ভয় যে না ছিলো তা নয়। তবে কি জান ভায়া, এক সময় যাত্রার দলে ছিলাম তো, একটু আধটু অভিনয় জানা আছে আর কি। তাছাড়া দালালী করতেও তো 'অভিনয়' লাগে ভায়া!

বললাম পয়সাটা ওকে ফেরৎ দিও চৌধুরী। ওটা আমিই দোব।

পরক্ষণেই কী ভেবে বললাম, না তোমার হাতে দিয়েও ভরসা নেই। হয়তো কোথায় মদ ভাঙ খেয়ে উড়িয়ে দেবে।

ঘণ্টা পড়েছিলো। দুজনেই আবার হলে ঢুকেছিলাম। চৌধুরীকে আমার জায়গায় বসতে বাধ্য করে আমি চৌধুরীর সিটে বসেছিলাম! তারপর একসময় সিনেমা ভেঙেছিলো।

সিনেমা হলের প্রায় উল্টোদিকের রেষ্টোরেণ্টটা একটা পাঞ্জাবী হোটেল। চা-ও পাওয়া যেত। সেখানে এক কম্পার্টমেণ্টে বসে তিনটি টিকিটের দাম মেয়েটাকে দিতে যেতেই মেয়েটা কেঁদে ফেলেছিলো।

তারপর চৌধুরীকে চাপা কণ্ঠে একহাত নিয়েছিলো। আসল ঘটনা বেরুতেও দেরী হয়নি।

চৌধুরীকে মেয়েটা ধরেছিলো এটা সত্যি। কিন্তু এজন্য মেয়েটার চেয়ে চৌধুরীই দায়ী বেশী। সেই মেয়েটাকে প্রলুব্ধ করেছে। সবচেয়ে মজার কথা, এজন্যে কমলার কাছে কিছু টাকাও খেয়েছে দ্বিজু চৌধুরী।

মেয়েটি চলে যাবার পর চৌধুরী আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলো, ইয়ে, লজ্জা আমাদের থাকতে নেই ভায়া। দালালদের ও থাকলে চলেও না। তবু বলছি, কমলরাণীকে যেন এসব কথা বলোনা ভাই। তাহলে আর আমার নিস্তার থাকবে না।

আঙ্গুরবালাও দ্বিজু চৌধুরীর নিস্তার রাখেনি।

বলেছিলো, আর তুমি এখানে আসবে না।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, পয়সা দিয়েও না।

—না, তোমার ও-পয়সা ছোঁব না আমি।

—বেশ তাহলে বিনি পয়সায়ই আসবো। হাজার হলেও এক সময়তো আমি তোমার বিয়ে করা সোয়ামী ছিলাম।

তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো আঙ্গুরবালা। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেছিলো, সোয়ামী ছিলে, ঝেঁটিয়ে তোমার সোয়মীগিরি বের করবো না! লজ্জা করে না সাধুপুরুষ, আমি না বেবুশ্যে। আমাকে না বাড়ী থেকে তাড়িয়েছিলে! এখন তুমি এ পাড়ায় কেন?

মেয়েরাই কেবল তোমাদের শাস্ত্রে দোষী। আর তোমরা সব ধোয়া তুলসীপাতা। আস্তাকুড় ঘেটে তোমরা পা ধুয়ে আসতে পারো, আর আমরা

দিনের পর দিন দাঁতে কুটোটি না কেটেও পতিব্রতা থাকবো! ঝাঁটা মারো অমন সতীত্বের মাথায়। ভাল চাওতো বেরুও নইলে বাড়ীওয়ালীকে ডাকবো আমি। ঘাড় ধরে বের করবে ব্যাটা দালাল। পা চাটা।

দ্বিজু চৌধুরী অবাক বিস্ময়ে আঙ্গুরবালার দিকে তাকিয়েছিলো। এ কোন আঙ্গুরবালা? এই আঙ্গুরবালার সঙ্গেই কি একদিন তার বিয়ে হয়েছিলো এমন দৃপ্তভঙ্গীতে কি সেদিন দাঁড়াতো আঙ্গুরবালা! যদি সত্যিই এমন রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়াতে পারতো সেদিন তাহলে হয়তো আঙ্গুরবালা দ্বিজু চৌধুরীর কাহিনী অন্যরকম হতো।

দ্বিজু চৌধুরী এগিয়ে এসে আঙ্গুরবালার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলো। কাছে টানার চেষ্টা করেছিলো। এক সময় যে সহজ-আয়ত্তে ছিলো তখন তাকে অবহেলা দেখাতে বাধেনি। লাঞ্ছনা দিতে বাধেনি।

আজ সেই প্রিয়া পরকীয়াতে পরিণত হয়েছে, আজ তার আকর্ষণও বহুগুণে বেড়ে গেছে। সেই প্রেম আজ আঙ্গুরবালার অভিমানপূর্ণ তিরস্কারে শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে, বন্যার মতো হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠছে।

কিন্তু অপরপক্ষের পোড় খাওয়া মনে তার প্রতিক্রিয়া কই? আঙ্গুরবালা আঁচড়ে কামড়ে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধ ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বলেছিলো, ফের যদি তোমাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখি তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। বেলাহাজ মিনসে ঢং করতে এসেচে।

গাল মন্দ খেয়েও পরদিন আঙ্গুরবালার ঘরে গিয়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী।

তারপরদিনও।

তারপর যখন সময় পেয়েছে। সময় বুঝেছে।

কিন্তু আঙ্গুরবালা কোন সময়ই ওকে সহ্য করেনি। প্রতিবারই যা নয় তাই বলে অশ্লীল গালাগাল দিয়েছে। কিন্তু অনেক সময় এই ছিনে-জোঁকের সঙ্গে পেরেও ওঠেনি।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েই দিয়েছিলো।

তবু মুখঝামটা, চড় চাপড় কসানো, এসব কখনও বাদ যেতো না। চৌধুরী তাতে মনে কিছু করতো না।

একবার নতুন করে ঘর বাঁধার প্রস্তাব দিতে যেয়ে বটির তাড়া খেয়েছিলো চৌধুরী।

বলেছিলো আঙ্গুরবালা, তবে রে মিনসে, সোহাগ মারাতে এসেচো। ঘর বাঁধবে! ঘরতো বেঁধেছিলিরে ড্যাকরা। তোদের আবার বিশ্বেস!

চৌধুরী আর এগোয়নি। অধিকারের সীমাও ছাড়ায়নি আর। আপত্তিও করেনি আঙ্গুরবালার লোক বসিয়ে রোজগার করতে (শুনতোই বা কে ?)।

বরং সময় পেলে দু পাঁচটা গান তুলে দিতো আঙ্গুরবালাকে। ভদ্রপাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিতো। গুণ্ডাবদমাসদের হাত থেকে যথাসম্ভব বাঁচাতে চেষ্টা করতো। বাড়ীর অন্য মেয়েরাও ক্রমে ওদের সম্পর্ক জানতে পেরেছিলো। জানিয়েছিলো বোধহয় মদের ঝোঁকে দ্বিজু চৌধুরীই। আর সেদিন বেলনের বাড়ির চোটে চৌধুরীর মদের নেশা ছুটিয়ে দিয়েছিলো আঙ্গুরবালা।

—মিনসে, এরপর যদি আমার ঘরে লোক না বসে তোমাকে আমি কচু কাটা করব। ঢ্যামনা ব্যাটা পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটতে গেছে। আমি যেন ওর বাবাকেলে মাগ।

চৌধুরী হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বার বার বলেছিলো, এবারটার মতো মাপ করে দাও আঙ্গুর বিবি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এমন অশাস্ত্রীয় কথা বলবো না। এই শালার ধেনো ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি। তুমি কোনদিন আমার বিয়ে করা মাগ ছিলেনা, এই আমি হলফ করে সব্বাইকে জানিয়ে বলছি।

বাড়ীর মেয়েরা আড়ালে আবডালে হাসতো। রসিকতা করতো চৌধুরীকে নিয়ে। আঙ্গুরবালার সামনে নয়। ওরে, বাব্বা, আঙ্গুরবালার জিভে যা বিষ, একেবারে ঝেরে কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দেবেনা?

কেউ চৌধুরীকে বলতো, লজ্জা করেনা তোমার এ বাড়ীতে আসতে? নিজের ইয়ে পর পুরুষকে নিয়ে ইয়ে করে, চোখের সামনে এ দেখতে তোমার লজ্জা করেনা। বেলাহাজ মিনসে কোথাকার।

কেউ বলতো, হ্যাঁগো মাষ্টার, তুমি ওর ঘরে যে যাও, পয়সা নেয়তো, না বিনি পয়সায়—।

দ্বিজু চৌধুরী হাসতো। কথার উত্তর দিতোনা।

না, আঙ্গুরবালাকে পয়সা দেওয়াতো দূরের কথা, তোয়াজ তোষামোদ করে দু' চার টাকা ধার করার নামে, মেরে দিতো। চিং হস্ত সহজে উপুড় করতো না। আবার দু' চার দিন পর বেহায়ার মতো হাত পাততো। হাত পায় ধরতো।

গালাগাল করে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতো আঙ্গুরবালা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দিয়ে পারতো না।

দিব্যি কেটে, তিন সত্যি করে প্রতিবারই ফিরিয়ে দেবার নাম করে ধার নিতো দ্বিজু চৌধুরী। এক এক সময় মমতাও হতো আঙ্গুরবালার।

আহা, লোকটা ভেসে বেড়াচ্ছে এ পাদাড়ে, ও বাদাড়ে। কত লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। তার চেয়ে আশ্রয় দেবে নাকি? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতো। শক্ত করে নিতো। না, বেশ্যাদের ওসব কথা মুখে আনতে নেই। ঘর বাঁধতে নেই।

ঘর বাঁধতে যেয়েই না সুকুমারী ভুল করেছিলেন।

সেই পুরানো আমলের সুকুমারী। মিসেস সুকুমারী দত্ত। উপেন্দ্র বাবু লিখলেন শরৎ সরোজিনী নাটক। এই নাটকে শরতের বয়স্থা ভগিনী সুকুমারীর ভূমিকায় নামে গোলাপ সুন্দরী। ভূমিকাটি বেশ জমে ওঠে। ফলে থিয়েটারের ভিতরের লোকেরা গোলাপ সুন্দরীকে সুকুমারী বলতো। ক্রমে বাইরেও ঐ সুকুমারী নামে চালু হয়ে যায়।

এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অনেক লোক ও বেশ কিছু রুচিবাগীশ থিয়েটারে বারবণিতা নিয়ে অভিনয় সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি একদিন যাঁরা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের সহযোগী মনোমোহন বসু পর্যন্ত থিয়েটারে পতিতা নিয়ে অভিনয় পছন্দ করতেন না।

হেমেন্দ্র কুমার রায়মশাই মনোমোহন বাবুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনেছিলেন, বসু মশায় বলেছেন, '...আমি তো নারী নিয়ে অভিনয়ের বিরোধী নই, আমার আপত্তি পতিতাদের জন্যে। কিন্তু হিন্দুদের কুলকন্যারা যে নটী হয়ে রঙ্গমঞ্চে আরোহন করবেন, এমন কথা স্বপ্নেও আমি ভাবিতে পারিনা।

······দেখছেন তো, পতিতাদের সঙ্গে ওঠাবসা ক'রে থিয়েটারের অভিনেতাদের কতটা চারিত্রিক অবনতি হয়েছে ? নট বলতে এখন বোঝায় সমাজ-ছাড়া বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো, মাতাল, মূর্খ লোককে।' ইণ্ডিয়ান মিরর, সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকা একসময় এ নিয়ে সরগোল তুলেছিলো।

হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত মশায় লিখেছেন, এই কাগজগুলো অনবরত প্রচার করতে থাকে যে 'কোম্পানী বেশ্যা লইয়া অভিনয় করে, এখানে অসৎ চরিত্রতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এমন কি অভিনেত্রীদের বিবাহেরও আন্দোলন চলিয়াছে। এরূপ থিয়েটার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে নিলামে চড়াইয়া একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা উচিত।'

এ সব লেখার মূলে সুকুমারী সমাচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপেন্দ্র বাবুর বইয়ে গোলাপ সুন্দরী নামলেন। অবশ্য তার পরিচিতি সুকুমারী হিসেবে। উপেন্দ্রবাবুর ধারণা 'অভিনেত্রীরা বিবাহিত জীবন যাপন করিলে তাহাদের জীবন সুখময় হইতে পারে এবং তাহারা সৎভাবে থাকিতে পারে।'

'শরৎ সরোজিনীতে' একটি ছোট ভূমিকা ছিলো এক পুস্তক বিক্রেতার। পার্টটি করতেন উপেনবাবুরই একজন অনুগত ব্যক্তি। তার নাম গোষ্টবিহারী। উপেনবাবু গোষ্টবিহারীকে রাজী করালেন অনেক কষ্টে। গোষ্টবিহারী সুকুমারীকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের উদারনীতিক প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়।'

বিয়ে হলো। বর কনের মধ্যে মনের মিলও হলো। প্রথম দিকে

---

* হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন, মনোমোহন বসু কেবল নাট্যকারই ছিলেন না, তাঁর দুলীন নামে একখানি প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে রামাভিষেক, সতী, হরিশ্চন্দ্র, প্রণয় পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাময়িক সাহিত্যেও তাঁর দানের অভাব নেই। প্রথমে তিনি 'বিভাকর' নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর তিনি মধ্যস্থ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরে তা পাক্ষিক ও সর্বশেষে মাসিক হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া তাঁর স্কুলপাঠ্য বইও ছিলো। তদুপরি তিনি সঙ্গীত পারদর্শী ছিলেন।

গোষ্ঠবিহারী সুকুমারী বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন।

হেমেন্দ্র বাবু লিখেছেন, লোকে অবশ্য এই বিয়ে বিদ্রূপ করতে ছাড়লো না। তাদের নিয়ে ছড়া গাইতে থাকলো,

'আমি সখের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রীপুরুষে এক্টোকরি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে।'

এদিকে সুকুমারী দত্ত যথাসম্ভব মানিয়ে চলতেই চেষ্টা করে আসছিলেন। লোকনিন্দা লোকের বিদ্রূপ গায় না মেখেও চলছিলেন। ইতিমধ্যে একটি মেয়ে এসেচে কোলে। এবার কপাল ভাঙলো সুকুমারীর। বারবনিতা বিয়ে করার অনুশোচনায় গোষ্টবিহারী তখন জর্জরিত। উপেনবাবু তখন বিলেতে। গোষ্টবিহারী একদিন কেটে পড়লেন। জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে তিনিও বিলেত পাড়ি দিলেন।

সুকুমারীর এত ভালবাসা ব্যর্থ-হলো। ঘর বাঁধার সাধ চিরকালের মতো লুপ্ত হলো। সুকুমারীর গল্প আঙ্গুরবালা শুনেছিলো।

আঙ্গুরবালা সে ভুল আর করতে চায়না। একবার যখন এপথে এসেচে জলে পড়েছে, জলই তাদের জীবন। ডাঙায় ওঠালে তা বাঁচবে না।

সুকুমারী দত্তর তবু 'জীবন সংগ্রাম' করার সাধ্য ছিলো। 'অপূর্বসতী' নামে একটা বই-ও লিখেছিলেন। অভিনয় শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠানও খুলেছিলেন। কিন্তু কোন কিছুতে সুবিধে করতে না পেরে আবার অভিনেত্রী-জীবনেই ফিরে যান।

কিন্তু আঙ্গুরবালার কী থাকবে তখন। তার জন্যে খোলা থাকবে ঝি-গিরির পথ। তার চেয়ে এই ভালো। এই ভালো।

অথচ ঘর না বাঁধলে কী যেতো আসতো সুকুমারী দত্তের। অপরেশ বাবু লিখেছেন, সুকুমারী দত্তের 'বিমলা', 'গিরিজায়া'র অভিনয় দেখিয়া প্রবাদ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, আজ বিমলা, গিরিজায়াকে জীবন্ত দেখিলাম।

তবেই বোঝ। তবু কি নিজের মেয়েকে এই পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার জন্য কি কম কিছু করেছেন সুকুমারী! সে কি আজকের কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ। মেয়েকে রাখলেন সংশিক্ষার জন্যে, নব্যভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মশায়ের তত্ত্বাবধানে।

কিন্তু মন ভরাবার কী ছিলো সুকুমারীর। বারবনিতার ঘর বাঁধতে নেই। ভালবাসতে নেই। ঘর বেঁধেছো, কি ভালবেসেছো—সুকুমারী দত্তের কথা, বিনোদিনী মাসীর কথা, তারাসুন্দরী মাসীর কথা মনে রেখো। চুনোপুঁটিদের কথা না শুনলেও চলবে। তেমন কুকুর বেড়ালের প্রেম তো আকছারই ঘটে এ পাশে ও পাশে। তাদের কথা না হয় বাদই দিলে।

কথায় বলে, দেখে শেখো। ঠেকে শেখো। বাড়ীওয়ালী মাসী বলতো, শুনেও শেখা যায়। ঠেকে শেখার থেকে তা অনেক নিরাপদ।

আর কাকে নিয়েই বা ঘর বাঁধবে।অঙ্গুরবালা। দ্বিজু চৌধুরীকে নিয়ে? ইন্দ্রিয় সর্বস্ব একটা লোককে নিয়ে। ভালবাসার জোয়ারে যে সব সময়ই ভাসছে। রুক্মিনীর ঘরে ঢুকেও তার ভালবাসা। পটলি, ক্ষ্যান্তমণি, কালিদাসীর ঘরে যেয়েও তাই। এই না কদিন আগে কাদম্বিনীর ঘরে যেয়ে রোগ নিয়ে এলো। পার্কের পুব দিকের ডাক্তার খানায় যেয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে ঔষধ খেলো, ইনজেকশন নিলো। আর তার টাকা জোগালো প্রথম প্রথম না জেনে এই আঙ্গুরবালা।

অমন ভালোবাসার কাঁথায় আগুন।

তার চেয়ে এই ভালো, এই ভালো। ডুবতে চাওতো ডুবে যাও, ভাসতে চাওতো ভাসো। না, আর কারও পায়ের তলায় নয়। রক্ষিতাদের তবু স্বাধীনতা আছে, বাঙালী ঘরের বউয়ের সে স্বাধীনতা নেই। ভাল না লাগলো সোয়ামী পাল্টাতে এখনও সংস্কারে বাধে।

সুবর্ণর সঙ্গে প্রথম আলাপে তারাসুন্দরী সম্পর্কে কিছু শুনেছিলাম। তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতির কথা, তারাসুন্দরী সম্পর্কে স্বর্গীয় বিপিন পাল মশায়ের মন্তব্য।

কিন্তু তখনও জানতুমনা শেষ জীবনে রাজনীতির চেয়ে সাহিত্যের চর্চাই বেশী করতেন বিপিনপাল মশাই। হেমেন্দ্র কুমার রায় মশায়ের বর্ণনা উল্লেখ করে সুবর্ণ লিখে রেখেছে, একদিন দেখলুম তাঁর সামনের টেবিলে

(বিপিনচন্দ্র তখন একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রের সম্পাদক, অবশ্য চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণের'ও প্রধান ভার গ্রহণ করেছিলেন এমসময়) দুইখানি হাফটোন ছবির ব্লক। ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর অভিনয়ের ছবি।

'জিজ্ঞাসা করলুম, ও ব্লক আপনার টেবিলে কেন ?'

'তিনি বললেন, ইংরেজীতে তারাসুন্দরীর অভিনয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, তারই ছবি।'

হেমেন্দ্র কুমার লিখেছেন, 'বিপিন চন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম এবং তখনকার দিনে অধিকাংশ ব্রাহ্মই ছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের বিরোধী। কেবল ব্রাহ্মই বা বলি কেন, কোনো হিন্দু সম্পাদকও তখন পর্যন্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় মাসিক পত্রিকায় নট-নটির ছবি প্রকাশ করেননি।'

সেজন্য হেমেন্দ্রকুমার বিস্মিতকণ্ঠে বিপিনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কাগজে ঐ ছবি ছাপা হবে, নটীর অভিনয় সমালোচনা বেরুবে!' বিপিনচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তাতে দোষটা কিসের? নাট্য সাধনা একটা বড় ব্যাপার, তারাসুন্দরী একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

সত্যি বলতে কি তারাসুন্দরী সম্পর্কে একথা সুবর্ণর খাতায় দেখার আগে আমি জানতুম না।

যেমন জানতুম না, কবিবর সত্যেন্দ্র নাথ একাধিকবার তাঁর বন্ধুদের কাছে বলেছেন, 'তারাসুন্দরীর আশ্চর্য্য প্রতিভা। ওঁর ওপরে একটি কবিতা রচনার ইচ্ছা আছে।'

হেমেন্দ্র কুমার লিখেছেন, 'তাঁর (কবির) সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, হঠাৎ অকালেই তাঁকে মহাপ্রস্থান করতে হয়েছিল।'

চিত্তরঞ্জন 'বারবিলাসিনী' নামে এক কবিতা লিখেছিলেন। অতি দরদ দিয়ে লেখা কবিতা। চিত্তরঞ্জন এসেছেন 'নটো' গিরিশকে অভিনন্দন জানাতে।

গিরিশচন্দ্র বলছেন, আপনি জানেন না আমি 'নটো' গিরিশ—সমাজে আমার স্থান নেই।

চিত্তরঞ্জন বাধা দিয়ে বললেন, আপনি সমাজের অনেক উর্দ্ধে, আপনার ন্যায়

জ্ঞানী ও ভক্ত অতি বিরল। আমি তো মনে করি বৈষ্ণবকবিদের ধারা একমাত্র আপনিই রক্ষা করেছেন।

অবাক হয়ে গিরিশচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালেন। কী দেখলেন কে জানে। বললেন, দেখুন আমি ভবিষ্যদ্ বক্তা নই। তবে আমি দেখছি আপনিও একজন পরমযোগী পুরুষ। আপনার ভোগ কেটে যাবে। ঠাকুরের কথায় বলতে গেলে আপনাকে দেখে লোক অবাক্ হবে।

তা হয়েছিল বৈকি। এই চিত্তরঞ্জনই তো দেশবন্ধু। দীনের বন্ধু।

এমন সময় এলেন দানিবাবু। গিরিশচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিলেন দুজনকে।

চিত্তরঞ্জন বললেন দানিবাবুকে, আপনার ওসমান ও তারাসুন্দরীর আয়েসা বড়ই চমৎকার হয়েছে, আর একদিন দেখাবেন।

দানিবাবু বিনয় নম্র কণ্ঠে বললেন, যে আজ্ঞে, মশায়।

সুবর্ণ তার খাতায় 'ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র' থেকে একথার উল্লেখ করে লিখেছে, তারাসুন্দরী যে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও স্নেহধন্যা হয়েছিলেন তার অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় প্রতিভায় একথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সেকালের সর্বজন মুখে।

যেমন অভিনেত্রী বিনোদিনী, তেমনি তারাসুন্দরী গিরিশচন্দ্রের স্নেহাশীর্বাদ পেয়ে ধন্যা হয়েছেন। স্টার থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ তখন পেয়েছেন তিনি। গ্রীনরুমে তাই পরমহংসের ছবি। পট প্রণাম করে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন ছোট্ট এক কিশোরী। কে?

না, তারা। তারাসুন্দরী।

জহর চেনা চোখে নামটা চেনা চেনা। এই মেয়েটিই তো সরলা নাটকে 'গোপাল' সেজেছিলো না? জিজ্ঞেস করলেন গিরিশচন্দ্র।

আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে উত্তর দিলো তারাসুন্দরী, হ্যাঁ।

দিলীপ মৌলিক মশাই নাট্যলোকের পুরনো পাতায় লিখেছেন, এই শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠ শুনে আবিষ্ট হলেন গিরিশচন্দ্র। অমৃতলালকে ডেকে বললেন, 'অমৃত, মেয়েটাকে যত্ন করিস্। ওর কিছু হবে।'

সব কিছুই হয়েছিলো তারাসুন্দরীর। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মক্ষিরাণী। গিরিশ-চন্দ্রেরও আগে এই মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিলেন বিনোদিনী। বিনোদিনী

তখন খ্যাতির মধ্যাহ্নগগনে। সতেরো আঠারো বছরের ছোট তারাসুন্দরী। বিনোদিনীর মা, তারাসুন্দরীর মা 'গঙ্গাজল' সম্পর্ক। অতি আন্তরিকতা দুজনে।

বিনোদিনীই তারাসুন্দরীকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। নিজে তার আশা-আকাঙ্খার পূর্ণরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

সরলায় গোপালের ভূমিকা নেবার আগেই ও বাচ্চা তারা থিয়েটারে এক-আধবার নেমেছে। চৈতন্যলীলায় একাধিকবার বালকের ভূমিকায় তাকে দেখা গেছে।

কিন্তু বিনোদিনী থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তারার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু না, নয় বছরের কিশোরী তারাকে ষ্টার থিয়েটারে নিয়ে এলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। সিটি থিয়েটারের এক সময়কার পরিচালক নীলমাধব চক্রবর্তী। এক সময়কার দেবীচৌধুরাণী নাটকের নামকরা ভবানী পাঠক।

তারার আশা সম্ভাবনার রূপ নিলো। স্টারের 'নসীরামে' তারা পেলো ভীল বালকের পার্ট। সরলায় 'গোপাল'।

এর পর থেকেই তারার বিজয় বৈজয়ন্তী। হারানিধি নাটকে হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় নামতে হলে নাচ গান জানা দরকার। পিছপা হলেন না তারাসুন্দরী। রামতারণ সান্যাল মশাই নিলেন গানের ভার। নাচ শিখলেন কাশীনাথ চাটুজ্যের কাছে। আসর মাত করে দিলেন তারাসুন্দরী।

গিরিশচন্দ্রের আশীর্বাদ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠল।

এরপর 'দেবীচৌধুরানী'। নতুন করে অভিব্যক্ত হলো তারাসুন্দরীর অভিনয় প্রতিভা। এ ছাড়া তারাসুন্দরীর রিজিয়া; দুর্গেশনন্দিনীর আয়েসা, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, সাজাহানের জাহানারা, দুর্গাদাসে গুলনেয়ার, রাখীবন্ধনে ধারা, অযোধ্যার বেগমে বেগম, কিন্নরীতে জনা ও উৎপল—আরও কত বইতে কত ভূমিকা।

চন্দ্রশেখরের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তারসুন্দরীর জীবনে আসেন তৎকালীন সুদর্শন নট ও ধনীসন্তান অমরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্র দত্ত। পরিণতিতে অমরেন্দ্র-নাথের বাগান বাড়ীতে এসে উঠলেন জমজমাট খ্যাতি ছেড়ে দিয়ে। বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চের দর্শককুল এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শন থেকে বঞ্চিত হলো।

অবশ্য তা সাময়িক ভাবেই সেবার। গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারে। 'করমেতিবাঈ' চলছে তখন মিনার্ভায়। অভিনেত্রী তিনকড়ির তখন খুব নামডাক। কি নিয়ে মনকষাকষির ফলে হঠাৎ মিনার্ভা ছেড়ে চলে যাওয়ায় গিরিশচন্দ্র মুস্কিলে পড়লেন। কাকে দিয়ে করমেতিবাঈর পার্ট করানো যায়!

যায় একজনকে দিয়ে। আর সে তারাসুন্দরী। অনেক ভেবেচিন্তে লোক পাঠালেন গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথের কাছে। তারাসুন্দরীর আগ্রহে অমরেন্দ্রনাথ তারাসুন্দরীকে অভিনয় করতে দিলেন। অপূর্ব অভিনয়ে তিনকড়িকে ছাড়িয়ে গেলেন তারাসুন্দরী। গিরিশচন্দ্র উৎফুল্ল বিস্ময়ে বললেন, 'বেটি তুই আমার মান রাখলি।'

আর একবার। মিনার্ভাতে 'রাণাপ্রতাপ' খোলা হলো। রাণাপ্রতাপ দানীবাবু। শক্ত সিংহ অপরেশ মুখোপাধ্যায়। পৃথ্বীরাজ অর্দ্ধেন্দু শেখর। যোশীবাই তারাসুন্দরী। মেহের সুশীলাবালা। ইরা ভূষণকুমারী। লক্ষ্মী সুধীরাবালা (পটল)।

রাণাপ্রতাপে 'দৌলত' করার কথা কিরণবালার।

অপরেশবাবু লিখেছেন তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর' গ্রন্থে। কিরণবালা অসুস্থ। কিন্তু তখনও কেউ ভাবেনি সে আসবে না। গাড়ী গেছে। তখনও ফিরে নাই। সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। কনসার্ট বাজছে। এমন সময় খবর এলো, সে (কিরণবালা) একেবারেই উঠতে পারছে না। তার আসা অসম্ভব। ভিতরে একটা মহা সোরগোল পড়ে গেছে। এদিকে যথাক্রমে দুবার কনসার্ট বেজে ড্রপ উঠেছে। এদিকে স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অভিনয়। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো—এত বড় একটা দুরূহ ভূমিকা—হঠাৎ কে দাঁড়াবে?

অপরেশবাবুর লেখা থেকে বলতে হয়, তখন রঙ্গমঞ্চের উপর পৃথ্বীরাজ ও যোশীবাইয়ের অভিনয় চলছে। ভিতরে মনোমোহনবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং আরও দুই চারজন আমরা পরামর্শ করছি, কি করা হবে, কি করা উচিত। কথা উঠলো, এক পারে 'তারা'; সে যদি সম্মত হয় তাহলেই আজকের ফাঁড়া কাটে।

প্রোগ্রাম দেখা হলো। দেখা গেলো, যোশীবাই ও দৌলতে দেখা সাক্ষাৎ নেই।

তারা যোশীর অভিনয় করে যেমন ভিতরে এসেচে, মনোমোহনবাবু কি মহেন্দ্রবাবু (ঠিক মনে নেই) তারাকে বললেন, ভাই, শীঘ্র এ পোষাকটা ছেড়ে দৌলতের পোষাকটা পরতে হবে।

তারা বললো, ব্যাপার কি ?

ব্যাপার যে কি তা তাকে বুঝাবারও তখন সময় নেই। কিরণের অসুখের কথা সে শুনেছিলো, ব্যাপার বুঝতেও তার বাকী রইলো না ; কারণ রঙ্গালয়ে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে যে এরূপ ঘটনার মধ্যদিয়ে যেতে হয় একথাটা তার অজানা ছিলোনা।

সবশেষে অপরেশ মুখোপাধ্যায় মশায় বলেছেন, তারাসুন্দরী যোশী ও দৌলত এই দুই ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং তার এই দুই চরিত্রের অভিব্যক্তি অপূর্ব। একেবারে আন্‌কোরা নতুন ভূমিকা নিয়ে যে তারা অভিনয় করছে, এ কথা দর্শক বুঝতেই পারলেন না ; অধিকন্তু সকলের ধারণা হলো, প্রতিযোগিতায় বাজী জেতার জন্যই আমরা এই আয়োজন করেছি।

এই তারাসুন্দরী। অথবা তারাসুন্দরীতেই এ সম্ভব।

মিনার্ভাতে 'কিন্নরী' হচ্ছে। ক্ষিরোদ বিদ্যাবিনোদের। বইটে এমন কিছু আহামরি নয়। তবে দুটি হাসির গান-নাচের ভূমিকা আছে আলিবাবার হুসেন ও মর্জিনার মতো। উৎপল ও মকরী। উৎপল সাজতেন নৃপেন বসু। আর চারুশীলা মকরী। নৃপেন বসু মিনার্ভা ছাড়লেন, কারণ 'কিন্নরী'র জনপ্রিয়তা তখন একটু ভাঁটার দিকে।

হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন, তারাসুন্দরী পুরুষবেশে গ্রহণ করলেন উৎপলের ভূমিকা। সাধারণতঃ তিনি গম্ভীর রসের ভারি ভারি ভূমিকায় অভিনয় ক'রেই তুলনাহীন নাম কিনেছিলেন।···কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর অভিনয়ের দ্বারা উৎপলের মতো নিম্নশ্রেণীর ভূমিকাও কতখানি অসাধারণ করে তোলা যায়, তারাসুন্দরী সেটা সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। গানের সময়ে যে অপূর্ব মৌখিক ভাবাভিব্যক্তি দেখালেন, বাংলা রঙ্গালয়ে তার তুলনা আর পাইনি।···

হেমেন্দ্র কুমার তারাসুন্দরী প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, বৃদ্ধা বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। বড় নটী বলে তাঁর নামও তিনি শুনেছেন কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয় তিনি দেখেন নি। 'তবে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গম্ভীর

রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে দেখেছি, তারাসুন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাঁদের সকলেরই উপরে।···তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার ও উচ্চারণ ছিল অতি স্পষ্ট।

·· কি 'মেলোড্রামায়' আর কি বাস্তব নাটকে তারাসুন্দরী সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন। · তারাসুন্দরীর আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতুম আন্তরিকতার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ক্রিয়াশীল মণীষার প্রভাব।

হেমেন্দ্র কুমার বলেছেন, আয়েসা ও রিজিয়ার ভূমিকায় তারাসুন্দরীকে যিনি দেখেননি তিনি জীবনের একটি প্রধান উপভোগ্য সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। চন্দ্রশেখর পালায় কেবল প্রেমিকা শৈবলিনী রূপে নয়, উন্মাদিনী রূপেও তিনি অদ্ভুত অভিনয় করতেন, তারও স্মৃতি কোনো দিনই ভুলতে পারবোনা।···অনূদিত 'ওথেলো' নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় তিনি বৃদ্ধ বয়সেও লীলাময়ী নব-যৌবনীর মতো যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তাও ভোলবার কথা নয়।

এছাড়া ইবসনের 'দি ভাইকিংস্ অ্যাট হেলগেল্যাণ্ড' অবলম্বন করে অপরেশ বাবু লিখলেন 'রাখীবন্ধন'। ১৯২০ সালে ষ্টারে অভিনয় হলো রাখীবন্ধনের। 'ধারা'র ভূমিকায় তারাসুন্দরী যে 'সংযত, স্বাভাবিক ও ভাবাত্মক অভিনয়' করেছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার তার সঙ্গে বিলেতী অভিনেত্রী এলেনটেরির অভিনয় দক্ষতার তুলনা করেছেন।

রিজিয়া তারাসুন্দরীর বিজয় নিশান। অপরেশবাবু বলেছেন, তখন এবং এখনও রিজিয়া বলতে তারাসুন্দরীকেই বোঝায়।

কিন্তু অনেকের মতে সিরাজদৌল্লায় 'জহুরা'র ভূমিকায় তারাসুন্দরী রিজিয়াকেও ডিঙিয়ে গেছে।

এছাড়া ছত্রপতি শিবাজীতে লক্ষ্মীবাইরূপে তারাসুন্দরীই অপূর্ব।

প্রৌঢ় বয়সে তারাসুন্দরী বিনোদিনীর মতোই ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন তারাসুন্দরী। পূজা অর্চনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। বাঙালী দর্শক ভাবলেন বাংলার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে তাঁরা বরাবরের জন্যই হারালেন। নাট্যমঞ্চের খ্যাতি অর্থ প্রতিষ্ঠার চেয়ে নতুন রসের সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

এদিকে পুরাতন যুগ যেয়ে নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটেছে বঙ্গীয় নাট্যশালায়। অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী গত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্রও দেহ রাখলেন ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী। অবশ্য শেষ অভিনয় গিরিশচন্দ্রের, আরো আগে। ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই, বলিদানের করুণাময়ের ভূমিকায়।

এসেচে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের যুগ। নতুন পরীক্ষা নিরিক্ষার যুগ। শিশির কুমারের ইচ্ছা গিরিশ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান 'জনা'র পুনরাভিনয় করবেন। 'জনা'র ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয়ের কথা তিনি জানতেন। আরও জানতেন তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরে আহ্বান গেলো শিশির কুমারের। উপেক্ষা করতে পারলেন না তারাসুন্দরী। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছেন তখন। কিন্তু হলে কি হবে পুরানো চাল, পুরানো ঘি নতুনকে হার মানায়। বাংলাদেশ নতুন করে দেখলো তারাসুন্দরী সেদিনও অনন্যা। কি উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলে, কি কণ্ঠমাধুর্যে, গম্ভীর ও শান্তরসের অভিব্যক্তিতে, তারাসুন্দরী যা দেখালেন স্বয়ং শিশির কুমার তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, পৃথিবীর ষ্টেজে তার তুলনা নেই।

'জনা'র পর 'পাষাণী'। পাষাণীর উন্মাদিনী সাকীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী আবার প্রমাণ করলেন তাঁর অননুকরনীয় অভিনয়কুশলতা।

তারাসুন্দরী লেখাপড়ার চর্চা করতেন। আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত যথেষ্ট মূল্যবান ছিল। এছাড়া যে কথা অনেকে জানেন না তিনি কবিও ছিলেন।

১৩০২ সালে অমরেন্দ্রনাথ 'সৌরভ' বলে এক মাসিক পত্র বের করেন। সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। গিরিশচন্দ্রের কাছেই অভিনয় শিক্ষা।

এই 'সৌরভে' বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী দুজনেরই কবিতা বেরিয়েছিলো। এ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে আমার পুত্র-কন্যার মতো সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।'

হেমেন্দ্র কুমার রায় মশায় লিখেছেন, সৌরভের দুই সংখ্যায় তারাসুন্দরীর

দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়—'প্রবাহের রূপান্তর' এবং 'কুসুম ও ভ্রমর'। কবিতা দুটি আমি পড়েছি। পঞ্চান্নো বৎসর আগেকার দিনে অধিকাংশ সুপরিচিত কবিও তার চেয়ে ভালো কবিতা রচনা করতে পারতেন না। 'সৌরভ' দীর্ঘজীবি হলে তারাসুন্দরীর কাব্য সাধনা অধিকতর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা ছিল।

আশ্চর্যের কথা, তারাসুন্দরী রূপসী ছিলেন না। অন্তত তিনকড়ি বা বিনোদিনীর মতো তো নয়ই। 'কিন্তু সুন্দরী নারীর ভূমিকায় যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সেও নাট্যমঞ্চের উপরে পদার্পণ করতেন, তখন অপূর্ব ভাবাভি-ব্যক্তির দ্বারা নিজের মুখে-চোখে-দেহে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রপঞ্চ।' —সার্থকভাবে একথা বলেছেন প্রত্যক্ষদর্শী খ্যাতনামা সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় মশায়।

তারাসুন্দরীর শেষ জীবনের কথা সুবর্ণ লেখেনি। সম্ভবতঃ জানে না। আমিও সঠিক ভাবে জানিনে। তবে শুনেছি, শেষ জীবনে উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে তার সেই মন্দিরেই ফিরে গিয়েছিলেন। নাট্যমঞ্চের প্রদীপ্ত দীপশিখা, ভগবানের আরতিতেই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

ভালকথা, পুনশ্চ দিয়ে ছোট অক্ষরে সুবর্ণ তারাসুন্দরী অভিনীত আরও কয়েকটি বইয়ের নাম লিখে রেখেছে এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে তারাসুন্দরী 'শ্রী'র ভূমিকায় নেমেছেন। গিরিশ-চন্দ্র হয়েছেন সীতারাম। অপরেশবাবু লিখেছেন, '···এরূপ অভিনয় জগতের যে কোন রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করতে পারতো।

ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তন হলো এমারেল্ড ষ্টেজ ভাড়া করে। খুললেন অমরেন্দ্রনাথ। দেবী চৌধুরাণীর পর নগেন্দ্র চৌধুরী মশায়ের হরিরাজ খোলা হলো। হরিরাজ সাজলেন অমরবাবু নিজে, রাণী অরুণার ভূমিকায় তারাসুন্দরী।

এই ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্দ্র কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দেন। নবকুমারের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ। কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় শ্রীমতী কুসুম। আর মতিবিবির ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

১৩১৪ সালের কথা। ক্ষিরোদ প্রসাদের চাঁদবিবি নিয়ে মহলা হবে।

কিন্তু ছোট নাটক। গিরিশচন্দ্র দায়িত্ব নিলেন তাকে বাড়িয়ে পঞ্চম অঙ্ক নাটক করে দেবার। নামলো চাঁদবিবি। এলাহি কাণ্ড। অপরেশবাবুর কথায় প্রথম রাত্রিতে বিক্রয় ছাব্বিশ শত টাকা। স্থান থাকলে বোধহয় আরও ছাব্বিশ শত টাকা বিক্রয় হতো।

এই অঘটন ঘটিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন আদিল শার ভূমিকায় কালীবাবু, মল্লজী অপরেশ মুখোপাধ্যায়, চাঁদবিবি তারাসুন্দরী, মরিযম ভূষণকুমারী (ছোট), তাজবিবি হয়েছিলেন কিরণবালা।

বলা বাহুল্য চাঁদবিবি-রূপিনী তারাসুন্দরী ছিলেন অতুলনীয়া।

এর আগে মনোমোহন বাবুর রিজিয়ার সাফল্য দেখে মিনার্ভা তার দ্বিতীয় নাটক হিসাবে 'ঐন্দ্রিলা' নাটক বেছে নেন। ঐন্দ্রিলার ভূমিকায় তারাসুন্দরী নামলেন।

যে দুর্গেশনন্দিনী দেখে চিত্তরঞ্জন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা খোলা হয় ১৩১২ সালে। অপরেশ বাবু লিখেছেন' প্রথম রাত্রিতে টিকিট বিক্রী হয়েছিলো নয়শ' আটচল্লিশ টাকা। প্রধান ভূমিকাগুলো বণ্টিত হয়েছিলো এমনি করে, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বীরেন্দ্র সিংহ। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী দিগগজ্। ওসমানের ভূমিকা নিয়েছিলেন সুরেন ঘোষ ওরফে দানীবাবু। বিমলা সেজেছিলেন তিনকড়ি দাসী। আর আয়েসার ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

ভালোকথা, তারাসুন্দরী চিরকাল 'দাসী' পদবীই যোগ করতেন। 'দেবী' টেবির চল্ পরবর্তী আমলের।

ভালকথা, এই তারাসুন্দরীকেই মা সারদামণি বলেছিলেন, তোমার থিয়েটারের একটা বীরভাবের পার্ট আবৃত্তি করে শোনাও।

শুনিয়েছিলেন তারাসুন্দরী।

অচিন্ত্য কুমার লিখেছেন, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি ঠাকুর ঘরে ঢুকতো না। 'মা ঠাকুরুণের' পাও স্পর্শ করেনা। গলবস্ত্র হয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে। মা তাদের প্রসাদ দেন, পান দেন। প্রসাদের উচ্ছিষ্ট জায়গা তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে, মার হাতের পান আলগোছে নেয় যাতে না ছোঁয়া লাগে।'

তারাসুন্দরী শুনিয়েছিলেন আবৃত্তি। মা তিনকড়িকে বলেছিলেন গান শোনাতে। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর গান—আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।

মা বলতেন, এদেরই ঠিক-ঠিক ভক্তি। যেটুকু ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে। আহা, কি সুন্দর গান শোনাল তিনকড়ি। আর তারাসুন্দরী কি সুন্দর পাঠ বললে।'

এখানেই সুবর্ণর অথ তারাসুন্দরী ইতিকথা সমাপ্ত। না, মেয়েটার সংগ্রহ আছে বটে। আজকাল যে রেটে 'ডি. ফিল' পাচ্ছে, গুছিয়ে টুছিয়ে লিখলে কে জানে মেয়েটা একটা তেমন কিছু বাগাতে পারতো কিনা।

দ্বিজু চৌধুরী বলতো, কোনদিন 'হোটেল, বারে' গেছো নাকি রায় মশাই ?

বলেছিলাম, বারে যাবার সৌভাগ্য হয়নি, তবে হোটেলে গেছি।

—কী রকম হোটেল ?

—পাইস্ হোটেল, এই যেমন জয় মা কালী বোর্ডিং, কমলা বোর্ডিং, বাজার রাস্তার উড়ের হোটেল।

দ্বিজু চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠেছিলো।

বলেছিলো, হ্যাখো খোকা, ট্যাকের জোর না থাকে, নিদেন পক্ষে দু চার খানা হোটেলের উপর লেখা বই পত্তর পড়ে দেখো থিউরেটিক্যাল জ্ঞানটা হবে কিছুটা। আর যদি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাও, তাহলে আমাকে অবলম্বন করতে পারো।

হেসে বলেছিলাম, তা তোমার অভিজ্ঞতাই না হয় বিবৃত কর চৌধুরী। শ্রবণে অর্ধ-অভিজ্ঞতা হোক।

চৌধুরীর হাতে কাজ ছিলো। বলেছিলো, আজ নয়, আজ একটা বড় পার্টির আসার কথা আছে। ভাল টিপ্ দেয়। আর একদিন শুনাবো।

আর একদিন হোটেল বারের কেচ্ছা, গড়ের মাঠের কেচ্ছা শুনিয়েছিলো দ্বিজু চৌধুরী।

বলেছিলো, প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ বলে, এ পাড়ার অনেকে, বিশেষ করে বিগত যৌবনারা এখানে সেখানে হোটেল বারে যাতায়াত করে। আধ ইঞ্চি পুরু রং মেখে, গালের মেছতা, বলীরেখা ঢাকার অপপ্রয়াস করে। 'ফলস্

ব্রেষ্ট' বেঁধে পতিত স্তনকে উন্নত করে এক শ্রেণীর বেশ্যা যুবতী সেজে রাতের অখাদ্য সব হোটেল বারে ভিড় জমায়। দিনের বেলায়ও ভিড় করতে দোষ নেই অবশ্য।

প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ বলে খদ্দেরের ছদ্মবেশেই তারা আসে। এক আধ-পেগ সস্তা দামের মদ সামনে নিয়েই বসে।

ক্রেতা যারা, নারী শিকারী যারা তারাও খদ্দের সেজেই আসে।

এসে বসে।

চোখে চোখে ইসারা হয়। ছোঁয়াছুয়ি হয়। দামাদামী হয়। তার পর এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় কোথায় যায় তা আর নাই শুনলে ! তবে হঁ্যা, ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সি এ দুটোর চাহিদে কম নয়। আর কোলকাতা সহরে এত বাড়ী ঘর বাড়লে কি হবে, এখনও আস্তাকুঁড় নর্দামার ছড়াছড়ি। গড়ের মাঠের বিশাল চত্বর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ফুলের কেয়ারীর আড়াল আবডাল থেকে আরম্ভ করে, বহু বহু জানা অজানা গলি ঘুঁজি। ভাড়া দেয় এমন এন্তার বাড়ী। হানাবাড়ী, কী নয়। আর অতদূরেই বা যাবার দরকার কী। হোটেলের এ-পাশে ওপাশে 'লেডিজ ওনলি' লেখা পর্দা ঢাকা কামরা-গুলোর বেঞ্চগুলোও অনেক সময় শয্যার কাজ করতে আপত্তি কোথায়। অবশ্য সেজন্য কিছু রেট বেশী দিতে হয়। নিদেন পক্ষে হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অন্দর মহল, আশে পাশের কামরা। পয়সা ছড়ালে কোলকাতা সহরে বাঘের দুধ মিলে কিনা জানিনে ভায়া, তবে খারাপ হবার জায়গা মিলে।

বলেছিলাম, কেন পুলিশের হস্তক্ষেপে এখন নাকি এসব অনেক কমে গেছে?

—তা গেছে। কিন্তু নিঃশেষ হয়েছে কি ? ধর্মতলায়, সুরেন ব্যানার্জি রোডে খারাপ খারাপ বই, ছবি কিনতে পাওয়া যায়। পুলিশ ধরে, কেস হয় কিন্তু কমেছে কি ? বরং আগের থেকে দাম বেড়েছে। বিশ্বাস না হয়, বইয়ের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িও, প্রমাণ পাবে। যাক্ যা বলছিলাম, ছোকরা, এ পাড়ার মেয়েদের কেউ কেউ যে এই সব হোটেল রেস্তোরাঁয় ভিড় করে তা নয়, ফিরিঙ্গী মেমগুলোও রোজগারের ধান্ধায় এই সব হোটেল রেস্তোরাঁয় এসে বেলেল্লা কাণ্ড করে। একটু কম বয়সী হলে তো কথাই নেই ভায়া। টানাটানি, মারামারি, ছোরাছুরিও চালাচালি হয়। এমন কি পরের পয়সায়

এক পেগ মদ পেলেও কৃতার্থ হয়। স্থিনেজোঁকের মত লেগে থাকে, যদি কিছু বাগানো যায়। এই সব হোটেল বারের সামনেও ট্যাক্সি, চারপাশ ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীর অভাব নেই। আর এই ক্রিয়াকাণ্ডেও চিত্তির কাণ্ড। ভাড়া বেশী আদায় তো বটেই, অতিরিক্ত মাতাল, নবীশ বাবু পেলে পকেট ফাঁক করে গড়ের মাঠে শুইয়ে ফেলে রেখে উধাও হবার ঘটনাও নতুন নয়।

বলেছিলাম, গড়ের মাঠ তো হাওয়া খাবার জায়গা শুনেছি, লোপাট হবার জায়গা যে তা তো জানতুম না চৌধুরী!

—জানবে জানবে। কচু কাটতে কাটতেই তো ডাকাত হয়। আহা, আমি যদি আর বছর দশেক বেঁচে যেতে পারতুম (ভগবান জানেন, চৌধুরী হাত দেখতে টেখতেও জানতো কিনা? কী আর বয়েস হয়েছিলো চৌধুরীর। দশবছর বাঁচা তার পক্ষে কিছু কঠিন ছিলোনা। কিন্তু না, দ্বিজু চৌধুরী দশ বছর বাঁচেনি)!

—বলেছিলাম, দশবছর বেঁচে থাকলে কী হতো চৌধুরী?

—দেখে যেতে পারতুম, তুমি ডাকাত হতে পারলে কিনা?

হেসে বলেছিলাম, তোমার দেখে যাবার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।

(সত্যই কি আমি প্রার্থনা করেছিলাম? মনে করতে পারছিনা। তবে আর কেউ যে প্রার্থনা করতো তা কি তখন জানতাম!)

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, এক ডাক্তারকে একজন রোগী জিজ্ঞাসা করেছিলো, ডাক্তার বাবু আমি আশী বছর বাঁচবো তো?

ডাক্তার বলেছিলেন, আপনার বয়স কত?

—আজ্ঞে চল্লিশ।

—মদ খান?

—না।

—রেস খেলেন?

—না।

—এদিক ও-দিক যাবার অভ্যাস আছে?

—আজ্ঞে না।

—বিয়ে থা করেছেন ?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তবে, তবে কীজন্য এতদিন বাঁচতে চান বলুন তো ?

কথা ঘুরাবার জন্য বললাম, তা গড়ের মাঠে নিশীথে অ্যাত কাণ্ড তা কি এরা জানে না চৌধুরী ?

—জানে, আবার জানেও না। অবশ্য 'এ ডাকে' সাড়া দেবার লোকেরও অভাব নেই। নিশির ডাক যে। ও-ডাক যে উপেক্ষা করা যায় না ভায়া। দীপশিখায় পুড়ে পতঙ্গ মরে। কিন্তু তাই বলে কি দীপশিখার ডাক উপেক্ষা করতে পারে পতঙ্গ ? অন্ধ পতঙ্গ! আর একবার ঐ ফাঁদে পা দিলে কী হয় তাতো আগেই বলেছি। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ীওয়ালাই বা কেন, এপাড়া ওপাড়ার এই ধরণের অনেক মেয়েই পরিচিত গুণ্ডা সঙ্গী নিয়ে (নিজেও হয়তো বা ঐ গুণ্ডাদলেরই কেউ) শিকার করতে বেরুয়। কুমারী মেয়ে সেজে অসহায়ত্বের ভান করে কোন নবীশকে (সেয়ানাকেও) প্রলুব্ধ করে। কোন সময় পথ হারানোর কাহিনী ফাঁদে। কোন সময় অন্য কিছু। সে কিছুর শেষ নাই। সে কাহিনীর সীমা নেই।

ফলশ্রুতিতে যুবকটি নিঃসঙ্কোচ উদারতায় ঐ ফাঁদে পা দেয়। ট্রাম লাইনের দিকে এগুয়। ট্যাক্সি ভাড়া করতে ছোটে। এদিক ওদিকেও যায়।

আর, আর সেই সময়ই এই শেভালরির ক্লাইম্যাক্স।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুচারজন সমাজসংস্কারকের (?) আবির্ভাব ঘটবে। ছদ্মপুলিশের আবির্ভাব ঘটতেও পারে।

—কী ব্যাপার মশাই, এ মেয়েটি কে আপনার সঙ্গে ?

(মেয়েটি ইতোমধ্যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করতে পারে। চীৎকার করে উঠার ভান করতে পারে। আরও অনেক কিছুই করতে পারে।)

যুবকটি হয়তো একটা যাহোক উত্তর দিতেও চেষ্টা করবে।

—এসব কী বলছেন আপনারা ?

—ঠিকই বলছি ছোকরা। আমাদের আর কথা বলা শেখাতে হবে না।

মস্তানরা তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবে, বলুন তো লোকটা আপনাকে কী বলছিলো?

মেয়েটি ততক্ষণে চোখে জল এনে (ওঃ, কত ঢঙই যে জানে এরা), কত কষ্টে, বলতে লজ্জায় প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন ভাবে বলবে, আজ্ঞে আমাকে পাপ প্রস্তাব দিচ্ছিলো!

বুঝুন ঠ্যালাখানা। আরও যান পরোপকার করতে? কথায় বলে না, বাংলাদেশে সব চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে পরোপকার করা। 'বিধবা বিবাহ' রূপ পরোপকার করতে যেয়ে তোমাদের বিদ্যাসাগর মশায় হাড়ে হাড়ে পরোপকারের ঠ্যালা বুঝেছিলেন। নিজের গাঁট থেকে দুপক্ষকে টাকা দিতে হয়েছে, নিন্দা পেতে হয়েছে, গুণ্ডা অনুসরণ করেছে খুন করার জন্য; মানুষের সততা সম্পর্কে সন্দেহ এসেছে কোন কোন সময় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এসব তত্ত্ব কথা ভাবার সময় কোথায় ছোকবার, বলো?

ততক্ষণে মস্তানরা বীরদর্পে বলে উঠেছে, কী হে ছোকরা বা কী মশায় মামদো বাজী, লোচ্চামি করার জায়গা পাওনা, অ্যাঁ। পিটিয়ে ছাতু করে দেবো না? ভদ্রমহিলাকে (?) কিনা পাপ প্রস্তাব, অ্যাঁ?

সঙ্গী অপর কেউ হয়তো ততক্ষণে জামার কলার ধরে (অবশ্য যুবকটির এরূপ স্থলে আপত্তি করার বা বাধা দেবার এক্তিয়ার আছে। কেউ কেউ যে এমনি ভাল মানুষটির মতো ছাতু হতে দেবে এমন আশ্চর্য ব্যাপার নাও ঘটতে পারে। এমন কি এই ছাতুর দুর্ভিক্ষের দিনেও এমনটি সহজে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যারা আসেন সমাজসংস্কারক সেজে তাদের ছাতু করার চেয়ে অন্যদিকেই আকর্ষণ বেশী। সেটা হচ্ছে ট্যাক খালি করানোর কর্ম। অবশ্য কেন জানিনে এরূপ এরূপ ক্ষেত্রে পরোপকারী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ মিইয়ে যান। জানের ভয়ের চেয়ে, মানের ভয়েই বেশী। ইজ্জত নিয়ে টানটাই সবচেয়ে বেশী কিনা।

এখানে একটা কথা বলেনি ভায়া, পরে আবার ভুলে যাবো। তোমার এমন মনে হতে পারে, পরোপকারী ভদ্রলোক মাত্রেই নির্দোষ

হবেন, অথবা গুণ্ডাদলের মেয়ে ছাড়া কোন মেয়ে যেন সঙ্গিনী হয় না। আসলে তা নয়, কোন লোক হয়তো নিজের বোন বা আত্মিয়াকে নিয়ে ময়দানে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাও এইসব সমাজসংস্কারকবেশী গুণ্ডাদের হাতে পড়তে পারেন। অযথা লাঞ্ছিত বা সন্দেহভাজন হতে পারেন। এমনকি থানা পুলিশ পর্যন্ত তার জের চলতে পারে! আবার সব পরোপকারী ব্যক্তি মাত্রেই যে ধোয়া তুলসী পাতাটি তাও আবার না হতে পারে। সোজা তো নয়, একটি যুবতী মেয়ে সাহায্য চাইছে বা যেচে আলাপ করতে এসেছে, এমন রোমাঞ্চকর রোমাঞ্চ ক'জন অনুভব না করে পারে, বল না ছোকরা!

হেসে বলেছিলাম, ছোকরাকে জিজ্ঞেস না করে, সেই পরোপকারী ছোকরার কথা বল দেখি চৌধুরী। তুমি বাপু ধান কাটতে শিবের বিয়ের গীত গাও বড।

চৌধুরী বলেছিলো, তার চেয়ে বল ককটেল পার্টিতে যেয়ে গীতার খোঁজ করা। যাকগে সে কথা, তুমি তো আবার হোটেল বারে যাওনি যে ককটেল পার্টি চিনবে। তারপর শোন, মস্তানদের মধ্য থেকে মহান প্রস্তাব আসবে, চল লালবাজারে যেয়ে বাজার করে আসবে। ছদ্মবেশী পুলিশ থাকলে ব্যাপারটা আরও জমবে এখানে।

এরপর ভয় ভীতি প্রদর্শন দর কষাকষি। যেটুকু পাপ ইতোমধ্যে পরোপকার করতে এসে হয়ে গেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো! আর লোকটাতো তখনও জানে না, তাকে ওরা যেখানেই নিয়ে যাক, লালবাজার বা হেস্টিংস কোন থানায় সত্য সত্যই নিয়ে যাবে না। বিশেষ করে লালবাজারের সঙ্গে এই কালোবাজারী কাণ্ডের কোন সম্পর্কই নেই। টাকার টাকা যাবে, ইজ্জৎ যাবে। খবরের কাগজে উঠবে। কে বিশ্বাস করতে চাইবে, সে নির্দোষ। টাকা পয়সা যায় হাতের ঘড়ি আংটি বোতাম (চাই কি পরণের জামাকাপড় জুতো অবধি) গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আণ্ডারওয়ার সম্বল করে কত নবীশ নাগর, সেয়ানা মরদ বুক চাপড়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার শতকরা কটাই বা থানা পর্যন্ত আসে।

টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে সেই সতী-সাধ্বী মেয়েটাকে (?) নিয়ে সমাজ

সংস্কারকরা চলে যাবে। চাই কি দু'পা এগিয়ে যেয়েই ঐ ছদ্মবেশী গুণ্ডারা, সতীসাধ্বীরূপিণী সোনাগাছি, রামবাগানের ধোয়া তুলসী পাতাটির সঙ্গে উদ্দাম হাসাহাসি করে পরোপকারী যুবককে চমকে দিতে পারে। অবশ্য চমকে ওঠা না ওঠা সেই যুবকটির 'ষ্ট্যামিনার' উপর নির্ভর করে।

বলেছিলাম, বানিয়ে বলছো নাতো চৌধুরী ?

চৌধুরী সব জান্তা হাসি হেসে বলেছিলো, এরকম নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে কতজনের যে সর্বনাশ ঘটে, তার ইয়ত্তা নেই। বান্ধবী নিয়ে, আত্মীয়া নিয়ে হাওয়া খেতে যেয়েও তেমন তেমন ক্ষেত্রে ঐ ময়দানে বা ময়দানের মতো জায়গায় যথাসর্বস্ব যায় বান্ধবী, আত্মীয়ার সতীত্ব খুইয়ে বাড়ী ফিরেছে, এমন কাহিনীও একেবারে দুর্লভ নয় পুলিশ রেকর্ডে। গুরুজনেরা কোলকাতার তিনটি জায়গায় রাতবিরেতে যেতে মানা করে থাকেন। তার মধ্যে রাতের ময়দান একটি।

—বলকি চৌধুরী ?

চৌধুরী বলেছিলো, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্বাস না হয় তোমার গুরুজনদের জিজ্ঞেস করে দেখো। আর আমাকে যদি তোমার গুরুজন বলে মনে করো তবে তো কথাই নেই।

মনে পড়লো, কে যেন একজন বলেছিলেন, ময়দানটিকে যদি সত্যই ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ স্থান করতে হয় তবে ময়দানে আলোর ব্যবস্থা, পুলিসী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা দরকার। চাই কি ময়দানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি থাকার কথাও বিবেচনা করে দেখা উচিত কর্তৃপক্ষের।

এতখানি উদার আকাশ ও মখমল বিছানো স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান যে কোন প্রথম শ্রেণীর শহরের বুকে দুর্লভ। আমেরিকায় একটু নির্জনতা উপভোগ করার জন্য উইক এণ্ডে সত্তর আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ ছয়শ' মাইল চলে যায় উচ্ছল তরুণ তরুণী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া। আর আমাদের দেশে মাত্র কয়েকটা পয়সা খরচ করলে কোলকাতার যে কোন স্থান থেকে ময়দানে পৌছা যায়।

আমারও মনে হয়, ময়দানে আরও আলো, আরও পুলিশ, আরও সতর্কতা এই তিনের সহযোগিতা ঘটালে একটা অতি দুর্লভ রম্যস্থানরূপে পরিগণিত করা যায়।

ঠিক একই ভাবে, আমাদের কোন কোন পার্কও রাতের বেলায় নিরাপদ নয়। রাত বাড়ার আগে থেকেই কিছু পরিমাণ বিশেষ শ্রেণীর লোকের যেমন জটালা দেখা যায়, তেমনি অনেক সন্দেহজনক চরিত্রের যুবক যুবতীর সাক্ষাৎ মিলে। সন্দেহজনক কাজকর্মও চলে।

আমাদের এক বন্ধু বলতেন, (একটি তরুণ ও একটি তরুণীর মধ্যে এমন কি ভালো কথা বলার থাকতে পারে যা নাকি পার্কের আবছা অন্ধকার কোণ না হলে বলা চলেনা।) আরে মশাই সদ্ আলোচনা, ইস্কুল কলেজ য়ুনিভারসিটির পড়াশোনার কথা বলতে আবার আড়াল আব ডাল লাগে না কি হে! না কি তা এমন গোপনীয় যে নির্জন একান্তে হাতে হাত দিয়ে ধর্মালোচনার ভান না করে বললে চলবে না। আরে বাপু বিজ্ঞানের উন্নতি যে রেটে চলছে পার্কগুলোর নির্জন বেঞ্চ, গাছ বা কুঞ্জের নীরব লতাগুলোর যদি বাকশক্তি ফিরে আসে তবে কত ঘরের কেচ্ছা যে বেরুতো তার অন্ত নেই।

চৌধুরী বলেছিলো, শোন তাহলে এক কেচ্ছা। মিষ্টার 'ক' বিরাট ধনী। প্রৌঢ়। বিবাহিত। পার্টি, টেনিস, ক্লাব নিয়ে মত্ত। মিষ্টারের স্ত্রী 'গ'টিও তাই। মিষ্টার 'খ, আর একজন শিল্পপতি। তিনিও তাই। তার স্ত্রী মিসেস্ 'ঘ'ও তাই।

'ক' সেদিন বললেন, আজ ফিরতে দেরী হবে। ইরাণ থেকে একজন অয়েল ম্যাগনেট এসেছেন তার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে।

মিষ্টার 'খ' সাহেব মিসেস্কে বললেন, জাপান থেকে এসেচেন একজন বিজিনেস্ ম্যাগনেট, ফিরতে রাত হবে।

মিসেস 'গ' বললেন স্বামীকে, আমি কিন্তু যেতে পারছিনে। আজ বিকেলে আমাদের অল ইণ্ডিয়া ওয়্যান কালচারাল সোসাইটির জরুরী অধিবেশন।

মিসেস 'ঘ' বললেন স্বামীকে, ও তাই নাকি, আমি কিন্তু বাপু তোমাকে কোম্পানী দিতে পারছিনে। আমার আবার ফ্লাউয়ার এক্সিবিশনের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন সেরিমানি।

রাত দশটার সময় কোন এক নামকরা ক্লাবের মেহেদি গাছের কুঞ্জে একটি মত্ত পুরুষ কণ্ঠ শুনে অপর কুঞ্জের আড়ালে বসা একটি মহিলা উঁকি মারলেন। ততক্ষণে এপাশের একটি মহিলা কণ্ঠ শুনে ওপাশের একটি পুরুষ তেড়ে

উঠলেন। চার জোড়া করে আট জোড়া চক্ষুর মিলন ঘটল। আট জোড়া চক্ষুতো নয়, অষ্টবজ্র সম্মেলন।

কিন্তু কেউ কিছু বলবার ভাষা পেলেন না।

মিষ্টার 'ক' মিষ্টার 'খ'র মিসেসের সঙ্গে তৈলবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন সম্ভবতঃ। আর মিসেস 'গ', অল ইণ্ডিয়া ওম্যান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী অধিবেশন, মিষ্টার 'খ'-এর সঙ্গেই সারছিলেন বোধহয়।

চৌধুরী বলতো, নাটক দেখতে চাও তো উঁচু তলায় যাও ভায়া। আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খিস্তি খেউড় শুনতে চাও তো আমাদের পাড়ায় এসো। এখানে সব এস্পার ওস্পার। আর ওখানে সব ঢাকঢাক গুড়গুড়। গুড়গুড়, আর গুড়গুড়। চিনির কারবার নেই কোথাও।

ও পাড়ার একটা ফ্লার্ট মেয়ে কোন পুরুষ বন্ধুকে সিনেমার হলে, বারে বা বটানিকস্‌ এ সঙ্গ দেবার জন্য নিদেন পক্ষে চল্লিশ টাকা আদায় করবে। আর আমাদের পাড়ার ঐ টাইপের একটি মেয়েকে ঐ পরিমাণ টাকা রোজগার করতে অন্ততঃ চারবার লোক বসাতে হবে।

তারাসুন্দরীর যেমন রিজিয়া, তিনকড়ির তেমনি 'জনা'। যাঁরা দেখেছেন তারাই মুগ্ধ হয়েছেন। যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেমন আলোক তেমনি রশ্মি। হেমেন্দ্র নাথ লিখেছেন, এরপর বহু অভিনেত্রী জনার ভূমিকা করেছেন, প্রকাশমণি, তারাসুন্দরী, কণক সরোজিনী এবং সুশীলা সুন্দরী। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করলে সর্বাপেক্ষা তিনকড়ির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করতে হয়।

'জনার মাতৃত্ব, বীরত্বভাব এবং প্রতিহিংসার অভিব্যক্তি' তিনকড়ি দাসী অদ্ভুতভাবে দেখাতেন। প্রবীর মারা গেলে প্রতিহিংসা পরায়ণা মাতা জনার সে এক বাঘিনীর মূর্তি। তিনকড়িকে কেউ ভুলতে পারতেন না সে মূর্তিতে।

তিনকড়িকে থিয়েটারে আনেন বাবু অক্ষয়কালী কোঁয়ার। কবি রাজকৃষ্ণ রায় মশায় তখন নবস্থাপিত বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। দায়িত্বও তাঁর ঘাড়ে। রাজকৃষ্ণ বাবু সাহায্য পেলেন অক্ষয় বাবুর। অক্ষয় বাবুর আর্যনাট্য সমাজও তাই এগিয়ে এলো।

তখনও বালক দিয়ে স্ত্রী ভূমিকা। কিন্তু তাতে ঠিক যেন জমেনা। অবশেষে ১৮৮৯ সালে মীরাবাঈতে মেয়ে নিতে হলো। আর মীরাবাঈয়ের ভূমিকায় নামলেন তিনকড়ি। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না তিনকড়ি।

মিনার্ভা থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বইএর উপর বিরাট আগ্রহ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পত্রালাপ আছে আগে পরে। যদিও এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র থিয়েটারের উপর একটু ক্ষুব্ধ। কারণ তাঁর জামতাবাবাজীর দুর্ব্যবহারে বঙ্কিমকন্যা আত্মহত্যা করেছেন। আর জামতা বাবাজীর এমারেল্ড থিয়েটারে আগের থেকেই যাতায়াত ছিলো। সেখানকার এক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাকি তার প্রণয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে সুযোগ এলো। গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিলেন সীতারামের। নিজেই সাজলেন সীতারাম। শ্রী ও জান্তীর ভূমিকায় উপযুক্ত অভিনেত্রী কাকে পাওয়া যায়। তিনকড়ি দাসীর 'চেহারা কথাবার্তা ও গাম্ভীর্য' অন্য সকলকে হার মানায়।

সুশীলাবালাও নেমেছিলেন। আর গান গেয়েই আসর মাৎ করে দিয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বিনোদিনী। পেয়েছিলেন তারা-সুন্দরী। পেয়েছিলেন তিনকড়িও। বিনোদিনীকে নিয়েও যেমন ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, তিনকড়িকে নিয়েও তাই।

গিরিশচন্দ্রের এক ধনী বন্ধু তিনকড়িকে বাঁধা রাখতে চান। অঢেল টাকা বাগানবাড়ী। সোনায় মুড়ে দেবে নাকি তিনকড়িকে। কিন্তু শিল্প-জগতের আকর্ষণ ছাড়েন কি করে তিনকড়ি। আজ ভাড়ায়, কাল ভাড়ায়। অবশেষে গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন তিনকড়ি।

গিরিশচন্দ্র নস্যাৎ করে দিলেন সে প্রস্তাব। বললেন, টাকা দিয়ে কি শিল্পী কেনা যায়।

কথাটা বাবুর কানে গেলো। বুঝলেন, গিরিশচন্দ্র বেঁচে থাকলে তিনকড়িকে কব্জায় পাবেন না।

ঠিক করলেন, গিরিশচন্দ্রকে খুন করতে হবে।

বাগানবাড়ীতে মাইফেলের নাম করে নিমন্ত্রণ করলেন গিরিশচন্দ্র ও

তিনকড়িকে। নামকরা গুণ্ডা গোলাপ সিংএর দলকে রাখলেন বাইরে। মাইফেল ভাঙলে গিরিশচন্দ্রকে জরুরী কথাবার্তার নামকরে আটকে রাখবেন, তারপর খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হবে বারোটার সময়। সে মাটির উপর গাছ বসানো হবে, ঘাস বিছানো হবে। কাকে কোকিলে যেন টের না পায়।

কিন্তু ভগবানতো টের পাবেন।

গিরিশের বন্ধু রাজেন ধনী বন্ধুর সাগরেদ।

সন্দেহ হলো তার। একথা সেকথায় গোলাপের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করলেন।

অনেক কৌশলে গিরিশচন্দ্রকে পায়খানা গরাদহীন জানালা দিয়ে গোপনে নামিয়ে আনলেন পাচিলের উপর। তিনকড়ির চাকর তখন ঠিকে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করছে রাজেন বাবুর নির্দেশমতো।

বাবুর যখন সন্দেহ হলো মাইফেল শেষে ততক্ষণে পাখী উড়ে গেছে।

প্রাণে বাঁচলেন গিরিশচন্দ্র। বাঁচলো তিনকড়িও।

লেডী ম্যাকবেথ রূপে বাঙালী নটীদের মধ্যে তিনকড়িকেই চিনতেন সবাই। যেমন দীর্ঘ দেহ, তেমনি ব্যক্তিত্ব, তেমনি অভিনয়। একেবারে ধন্যি ধন্যি অভিনয়। মুকুল মুঞ্জরার তারা, আবু হোসেনের মুন্নাবাই সেও ঐ তিনকড়ি। করমেতি বাঈ এর ভক্তির ভাবটা অবশ্য তেমন ফোটাতে পারেন নি তিনকড়ি। কিন্তু তাতে কি ১৩১২ সনের ১৯ শে মাঘ রবিবার দুর্গেশ নন্দনী নামলো মিনার্ভায়। প্রথম রাত্রির বিক্রী নয় শ' আটচল্লিশ টাকা।

আর নামলেন গিরিশচন্দ্র বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায়। বিমলা হলেন শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী।

বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয় দেখে বলেছিলেন, আজ বিমলাকে জীবন্ত দেখিলাম।

হেমেনবাবুর কথায়, ম্যাকবেথের অভিনয় করে মিনার্ভা থিয়েটার সাধারণের নিকট প্রথম শ্রেণীর নাট্যশালা বলে পরিগণিত হয়।

বিনোদিনীর সে সময়কার বাবু কালীপদ ঘোষ বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে রামকৃষ্ণ দর্শন করিয়েছিলেন। গিরিশের বন্ধু সেই মদ্যপ কালীপদ

ঘোষ। ডিকিনসনের বড়বাবু। 'অসুরের মত বিরাট অয়স্কান্ত চেহারা – নরেন যার নাম রেখেছে দানাকালী।' —লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার। তিনকড়ি ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে যেয়ে দেখেন নি। থিয়েটারে দেখেছেন। প্রণাম করেছেন। আশীর্বাদ পেয়েছেন। প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ পেয়েছেন জননী সারদামণির। গান শুনিয়েছেন সারদামণিকে।

তিনকড়ির তবু সন্দেহ যায়না। একদিন গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন (সেখানে আরও অনেকে ছিলেন), মশায়, ঠাকুর কি আমাদের কৃপা করবেন? গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন, তাঁর দরজা সকলের জন্যই অবারিত।

তিনকড়ি বললেন, অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এই হীনস্থানে জন্ম হয়েছে। এখন বলুনতো কি কাজ কল্লে আর এস্থানে জন্মাতে হয়না?

গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন, ভগবানের এক নাম পতিত-পাবন। যদি সাদা প্রাণে তাঁকে ডাকা যায়—ডাক্‌বার মত ডাকতে পার, তবে তিনি নিশ্চয়ই পতিতাকে পায়ে স্থান দেবেন।

তিনকড়ি গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, আমি তো ডাকি, রোজ রোজ ডাকি, কত লোকেই তো ডাকে কিন্তু আমার মত হীনার ডাক তাঁর কাছে পৌঁছায়?

গিরিশচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, সকলের ডাক সমানভাবে পৌঁছায় বলেই তো তিনি ভগবান। তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র নেই, রাণী বা অভিনেত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রাণে মনে ডাকলে তাঁর অভয় কোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থান দেবেন। জগাই মাধাইকে দিয়েছিলেন, তোমাদেরও দেবেন। লিখেছেন ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের লেখক। তিনি পেয়েছেন স্বর্গীয় ক্ষেত্রমিত্র, অপরেশ মুখার্জি, তারাসুন্দরীর বিবৃতি এবং উপেন্দ্র মোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত তিনকড়ি দাসীর জীবন বৃত্তান্ত থেকে।

তিনকড়ি বলেছেন গিরিশচন্দ্রকে, মশায় আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমাদের পাপার্জিত অর্থে কি কোন সদ্ব্যয় হতে পারে?

রামকৃষ্ণ ভক্ত গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, নিশ্চয়ই হতে পারে, তবে যা দেবে কামনা করে দিওনা। তিনকড়ি বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয় গরীবদের চিকিৎসার জন্য আমি কিছু সৎকার্যে দান করি।

এই শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী। পঙ্কে তো অনেক কিছু গজায়। কিন্তু

পঙ্কজ বলতে পদ্মকেই বুঝায়। বারবণিতালয়ের পঙ্কে অনেক ক্লেদ, অনেক গ্লানি। তবু তো বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ির মতো পঙ্কজ জন্মাতে বাধেনি। সতীত্ব নিয়ে এদের যাই বলুক রুচিবাগীশরা, কিন্তু নারীত্বে কোন নারীর চেয়ে খাটো এরা? স্বর্ণ লিখেছে, আমি মুক্তি চাইনে ঠাকুর। আমি যেন হাজারবার এদের মাঝে জন্মাই।

কিন্তু একি তার নীচে কী লিখেছে স্বর্ণ? কিন্তু যাক, ওকথা এখানে বলার নয়।

কাশীর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের প্রাসাদের সামনেকার ঘাটে বসে এই সেদিনও দশবছর আগেকার এই কাহিনী আর একবার মনে করার চেষ্টা করেছি। পাশে বসে থাকা সদ্য বিয়ে করা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর হনিমুন যাপন করার দীপ্তমুখ দুটি বারবার ঝাপসা হয়ে এসেচে। সামনে দিয়ে উত্তর বাহিনী গঙ্গার মাঝে নৌকার উপর বসা উচ্ছল তরুণতরুণীদের কলহাস্যের মধ্যে স্বর্ণ, কমলরাণী, দ্বিজু চৌধুরীর হাসি শুনে চমকে উঠেছি।

কিন্তু আজ দু'বছর কাশী আছি সব দিন এমনটা হয়না। এমনটা হয় কার্তিক পূজা এলে, দোল এলে।

সামনে বসে থাকা গল্পরত বন্ধুটিকে হঠাৎ মনে হয় দ্বিজু চৌধুরী বলে। যেন সেই দশ বছর আগের মতো হাত নেড়ে তার পক্ষে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে চলেছে, বুঝলে ভায়া, পঙ্কে জন্মেও এরা পঙ্কজ হতে পারে। অন্ততঃ তোমার স্বর্ণ যে একটা রজনীগন্ধা এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ভায়া।

কিন্তু তবুও তো দশটা বছর এর মধ্যে চলে গেছে। দশটা বছর যেন সেদিন। এই তো সেদিন দেওঘরে চাকুরী নিয়ে এলুম। সেখান থেকে কেমন করে একেবারে কাশীতে। বাবার এক আস্তানা থেকে, আর এক আস্তানায়। বৈদ্যনাথ থেকে বিশ্বনাথ। কাশীর দ্বারপাল কালভৈরব, ঢুণ্ডিগণেশ মহারাজ আমার এই অনধিকার প্রবেশে বাধা দেয়নি।

বাধা দেয়নি গোধুলিয়া মডার্ণ বোর্ডিং-এর মাকুন্দ ম্যানেজার বাবু। শুধু বলেছিলেন, হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন রাতবিরেত গলি-ঘুঁজিতে তথ্য সংগ্রহ করতে বেরুবেন না যেন।

তা না বেরুলাম মশাই। দিনের বেলায় কাশীগণ্ড দেখে দেখে সচিত্র কাশীধাম দেখে শত শত নাম জানা মন্দির, নাম না জানা মন্দির দেখে উঠতে উঠতেই না এই দুটো বছর কোথা দিয়ে উবে গেলো।

কলেজে পড়ানোটা যেন আমার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আসল যেন রাজা দিবোদাসের কূপ দেখা। যে কূপে দিনের একটা সময় সূর্যের একফালি রশ্মি ছিটকে পড়ে, আর তার মধ্যে নিজের ছায়া দেখা যায় উবুড় হলে। আর দেখলেই শান্তি। অন্ততঃ আরও ছয়মাস বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি। ছয়মাসের মধ্যে যার মৃত্যু ঘটবে তার আর নিজের ছায়া দেখতে হবে না। এ কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে, এজন্য সচিত্র কাশীধামের লেখকের কোন দায়িত্ব নেই।

কাশী বিশ্বনাথের মালিকানা। কিন্তু ক'জন জানেন কাশী যে একান্ন পীঠস্থানের একটি এজন্য বিশ্বনাথের কোন কৃতিত্ব নেই, যে কৃতিত্ব বিশ্বনাথ গলির পিছন দিক দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে সমান্তরাল করা এক পথের মধ্যে অবহিত বিশালাক্ষী দেবীর। সতীর নয়ন দুটি পড়েছিলো এখানেই। বিশালাক্ষীর সোনার চোখ দুটির দিকে চেয়ে সেকথা অবিশ্বাস করার সাধ্য আপনার যতই থাকুক আমার তো নেই মশাই। এসব দেখুন, আর সারা বিকেলটা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে কাটিয়ে দিন। আজকাল অবশ্য অনেক ঘাটে মলের গন্ধে টেকা মুস্কিল তবু দু'চারটে ঘাট এখনও আছে যেখানে দু এক ঘণ্টা বসা যায়। গঙ্গার কলধ্বনী শোনা যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে রাজা দিবোদাস দশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন কিনা আজ আর কেউ তার খোঁজ রাখেনা। তবে দশাশ্বমেধের উপরে পুটিয়ার মহারাণীর শিবমন্দিরের রেলিংএ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যায়। আর তাকিয়ে তাকিয়ে এই জন তরঙ্গ দেখা যায়। না, বুড়োবুড়ী দেখে চোখ ক্লান্ত হবার ভয় নেই। এখনকার কাশী তরুণতরুণীর কাশী। রঙ-বেরঙের কাশী।

সেদিকে তাকাতে তাকাতে এক একবার আপনার আমার পরিচিত পরিচিতা কোন তরুণ তরুণীর উপস্থিতি কল্পনা করতে পারেন। আহা, আমি যে কাশী বেড়াতে এসেছি, আমার পরিচিত কেউ দেখলো না, এজন্য কার না ক্ষোভ হয়! অন্ত কারও না হোক, আপনার আমার এ দুজনের হলেই

ক্ষতি কি বলুন।

এই তো কয়েকদিন আগে কোলকাতার এক নামকরা পাড়ার নামকরা অভিনেত্রীকে দেখলাম না হাতে এক ডালা ফুল, পরণে দুধগরদের লালপেড়ে শাড়ী। মুখে চন্দনের কাজ—অহল্যাবাঈ ঘাটের পাণ্ডার কাজ সন্দেহ নেই। তারই কেউ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন। কিন্তু যাকে দেখাচ্ছেন তাঁর চলা চলতি দেখে মনে হচ্ছিল এ পথে তিনি বহুবার হেঁটেছেন।

আরও আশ্চর্য, এখানে তাঁকে দেখার জন্য পুলিশ কর্ডন ভাঙার ব্যাকুলতা নেই। নেই অনেক কিছু। যেমন চোখে কালো চশমা নেই। নেই দেড়শ' টাকা দামের সেণ্টের গন্ধ। এমন কি, আমি যে-আমি দেড়শ' টাকা মাইনের লেকচারার, আমিও যেন ইচ্ছে করলে একটু সহজেই আলাপ করে নিতে পারতাম। চাই কি, ইতোপূর্বে প্রকাশিত রোমাঞ্চকর (বন্ধুরা বলেছেন অখাদ্য) উপন্যাসটি তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে চিত্ররূপ দেবার মহান সৌভাগ্য তিনি লাভ করতে চান কিনা এ কথা জানার সুযোগ পেতে পারতাম। কিন্তু না, জীবনে সব সুযোগই কি গ্রহণ করতে পেরেছি! পারিনি। সেদিনও পারিনি।

তবে হ্যাঁ, একটা সুযোগ ফস্কাতে দেইনি। আর দেইনি বলেই এই কাহিনী আরও কয়েক পৃষ্ঠা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। সদ্য বিবাহিত বন্ধু ও বন্ধুপত্নী ক'দিন হলো উঠেছেন মডার্ণ হোটেলে। কাশীর পুরানো (?) বাসিন্দে হিসেবে আমার উপর মহান দায়িত্ব পড়েছে দুজনকে তাদের অবসর মুহূর্তে কাশী দেখানোর। অবসর অবশ্য তাদের কতটুকু সে কথা অবশ্য তারাই জানে। চাকর ব্যাটাকে দিনে যতবার জিজ্ঞেস করি, ততবারই উত্তর পেয়েছি, হোটেলের অন্য ব্লকে ওঠা নতুনবাবুর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। কোন সময় জবাব পেয়েছি, আপনি কি কিছুই বুঝেন না বাবু। আমাদের তো এইসব দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। নেহাৎ খাওয়ার তাগিদ না থাকলে বোধহয় দরজাই খুলতেন না।

তা হবে।

কিন্তু তবু তারা দরজা খোলে। এক সময় সেজেগুজে আমার দরজায় এসে হাজির হয়। মুখে বলে, ঘরে আছ নাকি রায়। যেন আমিও দরজা

বন্ধ করে আছি।

এদিকে দুজনের আবার দুই রুচি। গৃহিনীটির নজর বিশ্বনাথ মন্দির। তস্য গলি। তস্য পুঁতির মালা, বেনারসী শাড়ী। বন্ধুটি চরম নাস্তিক।

তার নজর সারনাথের সিংহ, অশোকস্তম্ভ। বেণীমাধবের ধ্বজা। মান-মন্দিরের জটিল অংশ। এক কথায় চূড়ান্ত নাস্তিক বাবাজী।

তবে নেহাৎ ইতিহাসের দোহাই দিয়ে যেটুকু মাঝামাঝি রফা করে ধর্মস্থান তথা ঐতিহাসিক স্থান দেখানো।

বন্ধুপত্নীকে ধর্ম মাহাত্ম্য, বন্ধুবরকে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত বলার রফাওয়ারী ব্যবস্থা।

এমনি করে সেদিন পুরানো বিশ্বনাথ মন্দিরের পেছনটায় বসেছিলাম। পেছনের দেওয়ালটা মুসলমান অত্যাচার থেকে বেঁচে যেয়ে এখনও টিকে আছে তাঁর অপূর্ব কারুকার্য নিয়ে। সেটাই মসজিদের পেছনের দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। তার সামনেই বিরাট নন্দী মূর্তি। বন্ধুপত্নীকে বলছিলাম, এই অত্যাচার দেখে শ্রীযুক্ত নন্দী একবার নাকি ডেকে উঠেছিলেন।

বিরাট প্রস্তর নির্মিত ষণ্ডবাবাজীর দিকে তাকিয়ে বন্ধুটি ব্যঙ্গ হাসি হেসে উঠেছিলেন। বন্ধুপত্নী নন্দীমশায়ের প্রতিটি খুরে সভক্তি প্রণাম করেছিলেন।

পাশেই জ্ঞানবাপী। পবিত্র কূপ। বিশ্বনাথকে পাণ্ডারা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে (বুঝুন, নাস্তিকেরা যে বলে তোমাদের দেবতার আত্মরক্ষার ক্ষমতাও নেই। তোমাদের রক্ষা করবেন কি করে ?) ঐ জ্ঞানবাপীতে রেখেছিলেন। প্রথম মন্দির ধ্বংস করেছিলেন কুতুবুদ্দিন, কেউ বলেন কালাপাহাড়। তখন বিশ্বনাথ কোথায় ছিলেন তা অবশ্য আমিও জানিনে। আউরঙ্গজীব—দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের সময়কার ঘটনা। জ্ঞানবাপীর পাশেই তৃতীয় বা বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দির। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ-এর অর্থে নির্মিত। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এর দেয়া তেইশ মণ সোনা দিয়ে মোড়া গম্বুজের তলায় বাবা বিশ্বনাথ লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভক্তি কুড়িয়ে অবস্থিত।

আর, আর দেড়জন ভক্তের ভক্তি উৎসর্গ করতে যেতেই সেই থান কাপড়ে আবৃতা নারীমূর্তি। সেই জিজ্ঞাসা। সেই উত্তর, দ্বিজু চৌধুরীকে ওরা খুন করে ফেলেছে।

আহারে, এই তিনদিন আগেও না দ্বিজুকে কল্পনা করেছি দ্বারভাঙ্গা ঘাটে বসে! অথচ ছাখো, তার কতদিন আগেই না দ্বিজু চৌধুরী সশরীরে স্বর্গে যেয়ে বসে আছে।

আশ্চর্য, আমি হয়ত এই মুহূর্তে যাকে ভাবছি কে জানে সেও এতক্ষণ স্বর্গে পাড়ি দিয়েছে কিনা।

কিন্তু ওরা কারা, কারা দ্বিজু চৌধুরীকে খুন করলো। কিভাবেই বা করলো। কমলরাণী আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর ধীরে ধীরে যা বললো, তা হচ্ছে, একটা ভদ্রঘরের মেয়ে যোগাড করে দেবে বলে তিনজন পাঞ্জাবীর একটা দলকে 'ভোগা' দিয়েছিলো চৌধুরী।

মোটা টাকা দাও। কিন্তু মোদ্দা কথা, এ পাডার মেয়ে হলে চলবে না।

চৌধুরীর দোষ নেই। সে ব্যাটা দালাল এ 'টোপ' ছাড়তে পারে? কিন্তু জানতো না কী—দ্রবিড়দের সঙ্গে 'ফাত্রামী' আরম্ভ করেছে।

ঐ যে একটা গল্প আছে না?

এক ছোকরার বদ অভ্যাস মাঠের মধ্যে কাউকে নমাজ পড়তে দেখলেই একটা কাঠি নিয়ে পাছায় খোঁচা দেয়।

একদিন যায় দুদিন যায়। রোজই এমনটা করে। করে অবশ্য বালসুলভ চপলতায়। অনেকেই চটে কিন্তু ছেলে মানুষ বলেই হোক্, অথবা ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই হোক কেউ কিছু বলেনা।

কিন্তু একদিন হয়েছে কি, এক পাঞ্জাবী মুসলমান নমাজ পড়তে বসেছে। ছোকরাতো তার পাছায় খোঁচা দিতে গেছে। দাড়ি গোঁফ দেখেও ঠিক গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি।

কিন্তু যেই না খোঁচা দেওয়া, পাঞ্জাবী তো চটে উঠে পাশে রাখা কৃপাণ দিয়ে একেবারে এক রামখোঁচা।

খবর শুনে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে উঠলেন, অ্যাঁ শেষে কিনা পাঞ্জাবীর পেছনে খোঁচা দিতে গেছো ছোকরা, এখন বোঝ ঠ্যালা!

কিন্তু ঠ্যালা বোঝার জন্য সে ছোকরা আর বাঁচেনি।

দ্বিজু চৌধুরীও না।

চেষ্টা অবশ্য করেছিলো চৌধুরী। ভদ্র ঘরের না হোক একটা হাফগেরস্ত

সংগ্রহ করার তালেও ছিলো। কিন্তু অদেষ্ট খারাপ।

অবশেষে ভেজাল মাল চালাতে চেষ্টা করেছিলো। ভেবে ছিলো সাক্ষাৎ আর্য বংশধরেরা মাগধী দ্রব্য চিনতে পারবে না। কিন্তু চৌধুরীতো জানেনা এদেশে যারা গাড়ী চালায় এটা ওটার নিষিদ্ধ কারবার করে তাদের মধ্যে সব না হোক বেশ কিছু সংখ্যক শ্রীমান এক একটা খচ্চরের হাড়ি।

দ্রব্যটিকে ওদের গাড়ীতে তুলেও দিয়েছিলো চৌধুরী। ঘোমটা পরা এ পাড়ার দ্রব্যটি সতীলক্ষ্মীর ঢং করে জড়োসড়ো হয়ে বসেও ছিলো।

তারপর ভালয় ভালয় নগদ দু'শ টাকা হাত পেতে নিয়েছিলো। তারপর ফিস্ ফিস্ করে আনন্দের চোটে সতীলক্ষ্মীর (?) কানে কানে বলেছিলো, ঘাবড়াসনে ময়না, ভাল লোকের হাতেই তোকে দিয়ে গেলাম। যা পাবি, আমার কমিশনের কথাটা ভুলিসনে যেন।

এই কমিশনের কথাটাই দ্বিজু চৌধুরীর কাল হলো। এডগার অ্যালেন পোর খুনী নায়ক বউকে খুন করে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছিলো। সন্দেহ করে পুলিশ এলো। এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে। না, কোন চিহ্ন নেই অপরাধের। বাড়ীর আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করেও কোন হদিশ পেলো না। খুনী স্বামী নিশ্চিন্ত, তাকে সন্দেহ করার অবকাশ নেই পুলিশের। দুতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনের আনন্দে হাতের ছড়ি দিয়ে পাশের সদ্য রঙ করা দেয়ালে আঘাত করে বলে উঠলো, বুঝলেন বাড়ীটা এই সেদিন রং করেছি, প্লাষ্টার করেছি, দেখেছেন কেমন মজবুত।

ব্যস্ ঐ টুকুই যথেষ্ট। লাঠীর ঘায়ে দেয়ালের প্লাষ্টার ফেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে উঠলো। একটা বেড়ালের কণ্ঠ। সেই সূত্র ধরেই সব ধরা পড়লো। বউকে গাঁথতে যেয়ে বাড়ীর পোষা বেড়ালটাকে ভুল করে কোন ফাঁকে গেঁথে ফেলেছিলো খুনী।

কিন্তু দ্বিজু চৌধুরী কেমন করে জানবে পাঞ্জাবীদের মধ্যে একজনা দ্বিজু চৌধুরীর নিষিদ্ধ গলির 'ককনি ভাষা' বুঝবে। আর সন্দেহ করে এক হ্যাঁচকা টানে দ্বিজু চৌধুরীকে ট্যাক্সিতে তুলে উধাও হবে।

তার পরের খবর পাওয়া গিয়েছিলো ময়নার কাছে। তার জ্ঞান হবার পর। তার আগেই অবশ্য পুলিশ টের পেয়েছিলো ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডের এক

ঝোপের মধ্যে ময়নার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া দেহের পাশে একটা বড় পুঁটুলি দেখে। সে পুটুলির কাপড়টাও ময়নারই কাপড়। আর তাতে জড়ানো দ্বিজু চৌধুরীর খণ্ড খণ্ড করা মৃতদেহ।

ভদ্রঘরের মেয়ে কিনা সেটা যাচাই করতে ময়নার গোটা তিনেক আঙ্গুল কাটাই যথেষ্ট হয়েছিলো পাঞ্জাবীর পুঙ্গবদের।

আর তার মূর্ছিতপ্রায় দেহটা নিয়ে যে পৈশাচিক লীলায় মত্ত হয়েছিলো তার সাক্ষী ছিলো বাইরের অন্ধকারের কালো আকাশ। আর এক আকাশ তারা।

কমলমণির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছিলো। আমারও।

কমলমণি বলেছিলো, ওর অদৃষ্টে যে এমনটা হবে এ আমি আগেই জানতাম দাদা। এ আমি আগেই জানতাম।

কমলমণি কী জানতো, তা আমি জানতে চাইনি। কারণ কোন ঘটনা ঘটার পর এ রকম সবজান্তা বা ভবিষ্যৎবক্তা অনেক পাওয়া যায় আমাদের দেশে। আবার এও সত্য, ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 'কামিং ইভেণ্টস্ কাষ্ট দেয়ার স্যাডোস্ বিফোর'। বাংলা করলে দাঁড়ায়, ছায়া পূর্বগামিনী।

ভালবাসার জন সম্পর্কে আশঙ্কা করার প্রবাদ তো সেই কালিদাসের কাল থেকে। বিদ্যাসাগর মশাই যার তর্জমা করেছেন, স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

কিন্তু কথা হচ্ছে কমলমণি কবে দ্বিজু চৌধুরীকে স্নেহ করতো!

কমলমণি দ্বিজু চৌধুরীর ইতিহাসে, তাদের পাড়ার ভূগোলে যে চিত্র আমার মানসপটে পটায়িত তা হচ্ছে, একজন অহি, অপর জন নকুল। কে অহি কে নকুল সে অবশ্য বলা মুস্কিল, তবে আঁষ বটির সঙ্গে মাছের সম্পর্ক যদি ধরা যায়, তবে দ্বিজু চৌধুরী যে মৎস এবং তাও সফরী মৎস, সে আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।

আর দ্বিজু চৌধুরীর মৃত্যুতে কমলমণিই বা থান কাপড় পরবে কেন? নাকি, নতুন নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বারবণিতাকে কাউকে না কাউকে ধরে বিয়ে সাদীর রেওয়াজ হয়েছে, আইন বাঁচাবার জন্য!

দ্বিজু চৌধুরী বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেতো।

কমলমণি এতক্ষণ কী ভাবছিলো কে জানে।

কিছুক্ষণ পর বললো, সত্যি বলছি, এ আমি জানতাম দাদা। একটা যে কিছু অঘটন ঘটবে এ আমার মন গেয়েছিলো। কিন্তু তখন কি জানতাম, আমার রোগের সময় যখন আমার বাবু আমায় ছেড়ে দিলো, বাড়ীওয়ালী যখন ঘর ভাড়ার জন্য খিটি মিটি করা সুরু করলো, তখন ঐ মিনসে আমার জন্য যেন তেন প্রকারে টাকা রোজগার করে আনবে!

আমি তো থ' মেরে গেছি মশাই ততক্ষণে।

দ্বিজু চৌধুরী তাহলে প্রত্যুপকার জানতো। কিন্তু জেনে শুনে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে এ ছলনা করতে গেলো।

কমলমণি বললো নিজেই, ভদ্রঘরের না হোক, নিদেন পক্ষে হাফগেরস্ত মেয়ে সে যোগাড় করে ওদের দিতে পারতো, কিন্তু ইচ্ছে করেই দেয়নি।

—কেন বলতো!

—নিজেই সব টাকা খাবে বলে। ভদ্রঘরের মেয়ে যোগাড় করতে গেলে বহু টাকা দরকার। বিপদের আশঙ্কাও বেশী। ঝামেলাও বেশী। কিন্তু তবু ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিলোনা দাদা। এর আগেও সে একর্ম না করেছে তা নয়। কিন্তু এবার করেনি, বেশী টাকা মারার লোভে। আর সেই টাকায় সে আমার এক্স-রে করাবে, ওষুধ কিনবে, এই নাকি ছিলো তার ইচ্ছে।

তাজ্জব, তাজ্জব। কমলমণির সঙ্গে দেখা না হলে, চিরকাল দ্বিজু চৌধুরী একটা বাটপাড়, দালাল বলেই গণ্য হয়ে থাক্‌তো। কে জানে, এখনও যাদের খারাপ চোখে দেখছি, কোনদিন হয়তো শুনবো, তাদের যত খারাপ বলে মনে করতাম, তত খারাপ তারা ছিলোনা।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু সেজন্য কমলমণির থানকাপড পরার রহস্যটাতো বুঝলাম না। না বুঝি, নিজের থেকে ওর এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেও বাধছিলো।

তবু একটু ইতস্তত: করে সে কথাটাই নীতি বিগর্হিত জেনেও জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। কিন্তু বলার সময় যা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো তা আমি একটু আগেই কি ভাবতে পেরেছিলাম। নিশ্চয়ই তা আমার অবচেতন মনে

লুকিয়ে ছিলো।

আমার মুখ দিয়ে বেরুলো, স্বর্ণর কোন খবর জানো কমলমণি ?

বলেই বিশ্বের লজ্জা সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে উঠলাম.।

কমলমণি এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কি কোন খবরই রাখেন না দাদা ?

--কেন বলতো ?

—না, ব্যাপারটা পত্রিকায়ও উঠেছিলো কিনা! হয়তো আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। স্বর্ণ এখন হাজতে। আর হাজতেই বা বলি কেন, অ্যাদ্দিনে বোধহয় দ্বীপান্তর বা দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়ে গেছে।

দ্রুতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, খুলে বলতো কমলমণি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। স্বর্ণর মতো মেয়ে এমন কি করলো যার জন্য তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হবে ?

কমলমণি একবছর আগের কথা বললো।

নতুন ভাড়াটে আন্নাকালীর ঘরে এক বাবু এসেছিলো দলবল নিয়ে। লোক বেশী, তাই অন্য ঘরের ভাড়াটেদেরও ডাক পড়েছিলো। স্বর্ণেরও ডাক পড়েছিলো। মোটা মজুরী। যাদের ঘরে বাবু নেই বা খদ্দের নেই ইচ্ছে করলে তারা আসতে পারে।

কিন্তু স্বর্ণ তো সে ধরণের মেয়ে নয়। পরের ঘরে যেয়ে টাকা রোজগার, অহেতুক হৈ হুল্লোড় করা, বা অঢেল মদ খেয়ে মাতলামো করতে দেখেনি কেউ।

তবু স্বর্ণ আন্নাকালীর ঘরে গিয়েছিলো। আসলে যে বাবুটি দলবল নিয়ে আন্নাকালীর ঘরে এসেছিলো তাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছিলো স্বর্ণ।

কী ভেবে আন্নাকালীকে ডেকে ফিরিয়ে বলেছিলো, না, টাকা দিতে হবে না। তুমি যাও আমি কাপড় পাল্টে একটু পরেই আসচি।

তা এসেছিলো স্বর্ণদি। এমন করে সেজে গুজে এসেছিলো, ঝানু মেকআপম্যানও এমন সাজাতে পারবে না। আর শাড়ীখানা! এই রকম শাড়ী পরা দেখেই না সম্রাট আউরঙ্গজেব নিজের মেয়েকে তিরস্কার করে

উঠেছিলেন। কন্যা কিন্তু এক ভাঁজ নয়, সাত ভাঁজ করে ঢাকার মসলিনখানা পরেছিলেন। সুবর্ণদি পরেছিলেন মসলিন নয়, রমণী নিলাজ—শাড়ী। না, তখনও নাইলন শাড়ী বাজারে বেরয়নি।

ঘরে ঢুকতেই সারা ঘরে এক উন্মাদনা নেমে এসেছিলো।

আর সুবর্ণদি! আলিবাবার মর্জিনা বাঁদীর মতই হাস্যে লাস্যে নৃত্যে সারা ঘর মাতিয়ে তুলেছিলো। মর্জিনা বাইজীর মতই কোমরে একটা দীর্ঘ ছোরা গোঁজা ছিলো। নতুনদির এমন রূপ, এমন ভঙ্গী কেউ কল্পনা করতেও পারে নি। নতুনদি যে এমন নাচতে পারে তাও এমন করে আগে কেউ জানতো না। সবাই 'কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ, ঘুরে ফিরে মাইরী' বলে চীৎকার করছিলো। প্যালার নোটে ঘর জলজল। মদের গ্লাসের ঠুকাঠুকিতে জলতরঙ্গ বাদ্য।

কিন্তু নায়কটি কখন থেকে যে মদের নেশায়, না রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে বসেছিলো কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

লক্ষ্য করলো তখন যখন লোকটা চুপিসারে কবাট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

কিন্তু চুপিসারে পালিয়ে যাবে কোথায় চাঁদ! মর্জিনা বাঁদীর নজর রয়েছে না সারাক্ষণ!

একজনের হাত থেকে মদের গ্লাশ কেড়ে নিয়ে সবটা এক চুমুকে সেবড়ে, কোমর থেকে লম্বা ছোরাটা বের করে নাচের ভঙ্গীতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো নতুনদি।

তারপর এক ডজন মেয়ে পুরুষের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে, আহা-হা কর কি, কর কি মাইরী, ধ্বনির মধ্যে পলায়নপর নায়কের পৃষ্ঠদেশে আমূল বসিয়ে দিলো ছোরাটা। একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়।

তারপর একপলক সারা ঘরের পাথর হয়ে যাওয়া সবার চোখের সামনে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে এক ভ্রূকুটি ছুঁড়ে দিলো।

তারপর সোজা থানায় যেয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মসমর্পণ।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'আনকণ্ডিশনাল সারেণ্ডার।'

দু একজন ঐ অবস্থায় পিছু ছুটলো।

কী ব্যাপার?

না, দর্পনারায়ণকে আমি নিজ হাতে খুন করে এসেচি। আমাকে অ্যারেষ্ট কর।

কী সর্বনাশ!

সশব্যস্ত দারোগাবাবু উন্মাদিনী ছোরাহাতিনীর দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, তা ভালই করেছ বাছা। কিন্তু ঐ দপ্পনারাণটি কে?

কে আবার। নাম্নার গ্রামের কুমার কন্দর্প নারায়ণের নাম শুনেছেন তো! সেই যে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো জমিদার ছিলেন সন্দর্প নারায়ণ চৌধুরী, তার প্রথম পুত্র! তারই জ্ঞাতি লম্পট ভ্রাতা।

হ্যাঁ, যে শয়তান, কন্দর্প নারায়ণের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে, তাঁর স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। প্রলুব্ধ করেছে। ফুসলে নিয়ে কুলের বার করেছে। কিন্তু তাতেও তার দোষ দেইনি। কারণ আমিও তো নাবালিকা ছিলাম না। দোষ আমারও ছিলো। প্রতিশোধ নেবার বাসনাও ছিলো। কিন্তু কার মনে হিংসা জাগাবো। কাঠের মধ্যে কি আর বিদ্যুতের শক্ লাগে?

দারগাবাবু এবার একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, ছোরাটা টেবিলের উপর রাখো।

সুবর্ণ সেকথা রাখলো।

দারোগাবাবু বললেন, তারপর কি হলো, এবার বল। নাও, বসে পড়ো ঐ চেয়ারটায়। না, না ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

বলেই পাশে দাঁড়ান 'দরওয়াজা'কে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

নতুনদি তখন বললো, কুলত্যাগ করেছিলাম ওকে নিয়ে। পনের হাজার টাকার গয়না, আমার নিজের নগদ টাকা যা ছিলো তা নিয়ে। কিছুদিন চোখের আড়ালটি করতো না। তারপর থেকে স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকলো। একথা সেকথা বলে, ব্যবসা করার কথা বলে একে একে সব সম্বল নিতে লাগলো। তাতেও দুঃখ হয়নি আমার। তারপর একদিন আমাকে লাথি মেরে পালালো।

তারপর এই প্রথম সাক্ষাৎ। আর প্রথম সাক্ষাতেই বোঝাপড়া করে নিয়েছে সুবর্ণ।

দারোগাবাবু স্বর্ণর মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন নি। হাতকড়া দিয়ে, হাজতে পুরে লাসের খোঁজে বেরিয়েছিলেন।

মুখে বলেছিলেন, যত্তসব ছেনালী কাণ্ড। শালার একটু যে শান্তি পাব তা আর অদৃষ্টে নেই।

পরদিনই কোর্টে হাজির করে দিয়েছিলো। পত্রিকায় উঠেছিলো। সংবাদ পেয়ে কন্দর্প নারায়ণ এসেছিলেন। এ তল্লাটের বাঘা উকীল ব্যারিস্টার দিয়েছিলেন। কিন্তু মস্তকে যার সর্প দংশন করেছে, শ্রীযুক্ত কন্দর্প নারায়ণ তার কি করবেন! নিম্ন আদালত থেকে মহাধর্মাধিকরণ পর্যন্ত একসুরে বলে গেলো স্বর্ণ, দর্পনারায়ণকে সেই খুন করেছে। একটু কাঁপলো না, একটু ভেঙে পড়লো না। আর কারও প্ররোচনায় নয়, সুস্থ দেহে, ঠাণ্ডা মাথায় তা সে করেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন,

ইউর অনার, ইট্ ইজ্ পিউরলী কোল্ড ব্লাডেড্ মারডার। ৩০২ ধারার সার্থক প্রয়োগ করার ক্ষেত্র। ক্যাপেবল্ হোমিসাইড্ অ্যামাউন্টিং টু মারডার।

কমলরাণীও সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলো। স্বর্ণকে আসামীর কাঠগড়ায় দড়িবাঁধা অবস্থায়ও দেখেছ। সে এক পাষাণ মূর্তি। নতুনদির সেই মূর্তির লেশ মাত্র চিহ্ন নেই। মনে হয়েছে হিমালয় পর্বতের ভাবলেশহীন একটি তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গ।

হ্যাঁ, কন্দর্প নারায়ণকেও দেখেছে বৈ কি?

স্বয়ং কন্দর্প কি এঁর চেয়ে সুন্দর!

কিন্তু হলে কি হবে, ভদ্রলোকের দিকে তাকালে মনে হবে, ঐ সাগরে আর যাই হোক, তরঙ্গ খেলেনি কোনদিন। অথচ এই লোকটাই নাকি কত তরঙ্গ ভেঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেচেন।

ভদ্রলোক সারাটি দিন আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন মোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে।

আরে মিনসে, এই তাকানোটা যদি কয়েক বছর আগেও তাকাতিস্!

কমলমণি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলো, কতকগুলো মেয়েমানুষ

আছে না, যারা সতীত্ব হারালেও, নারীত্ব হারায় না, ব্যক্তিত্ব হারায় না, নতুনদি ছিলেন তেমনি।

দশ বছর আগেকার একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো আমার। পরদিন কোলকাতা ত্যাগ করার কথা আমার।

স্বর্ণর খাতাটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিলাম।

চা খাইয়েছিলো স্বর্ণ। চা খেয়ে চলে আসার পূর্বক্ষণে আমার কোলকাতা ছাড়ার কথা বলেছিলাম স্বর্ণকে।

ভুল দেখেছিলাম কিনা জানিনে, স্বর্ণর মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো।

তারপর একটু থেমে বলেছিলো, কেন, তবে যে বলছিলেন, এখানে থেকেই পত্রিকা চালাবেন?

বলেছিলাম, না, খাটুনি পোষাচ্ছে না স্বর্ণ। দেওঘরে একটা সুযোগ পাচ্ছি; শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তারও বলছেন একটু চেঞ্জ মতো করে আসতে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণ বলেছিলো, তুমি—আপনিও চললেন তাহলে!

তারপর সহসা অসতর্ক আমাকে বিন্দুমাত্র সাবধান হবার সুযোগ না দিয়ে, গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করেছিলো। না, না আমি একটা গুরুঠাকুর গোছের কেউ না হওয়া সত্বেও স্বর্ণ এই অপকর্মটা করে ফেলেছিলো। পাঠক পাঠিকার সে জন্য আমার সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হবার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ ঐ প্রণাম টনাম গুলো কেমন যেন হঠাৎ-টঠাৎই হয়ে পড়ে। হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, কোথাও কিছুনা, একটা লোক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লকি, অমনি হঠাৎ মাথাটা একটু নুইয়ে (না নুইয়েও) বলে বসলো, এই যে প্রেম কিঙ্কর দাস বাবু নমস্কার, কেমন আছেন?

স্বর্ণ প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিলো।

এবারও যদি ভুল না দেখে থাকি, স্বর্ণর চোখ দুটো যেন চিক্ চিক্ করছিলো।

কে জানে সত্য কিনা, কে জানে কি জন্য।

অনেকে আছে না, নিজের সম্পর্কে অপরকে ভাবতে দেখলে সুখী হয়, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। অন্ততঃ সুবর্ণর ব্যাপারটি দেখে আমার তাই মনে হয়েছিলো। অবশ্য মনে হবার একাধিক কারণও যে না ছিলো তা নয়।

না না, সুবর্ণ তার শঙ্খ শুভ্র দেহ ও মূল্যবান গন্ধ দ্রব্য মাখা সাজসজ্জা নিয়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলো বলেই নয়, এ অন্য কথা।

এরও বেশ কিছু দিন আগের কথা।

সুবর্ণ তার কার্তিকপূজায় নিমন্ত্রণ করেছিলো।

সংবাদটি কমলমণির কানেও গিয়েছিলো। আর তা শুনে কমলমণি বঙ্কিমহাসি হেসেছিলো।

সেদিন এর মানে বুঝিনি। কমলমণির নিমন্ত্রণ নেহাৎ সৌজন্যমূলক নিমন্ত্রণ বলেই গণ্য করেছিলাম।

দ্বিজু চৌধুরী বলেছিলো, কার্তিকপূজার রাত্রে ওরা খদ্দের বসায়না রায় মশাই। অনেকেই যথাসম্ভব নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করে। আর নিমন্ত্রণ করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা মনের মানুষদের। না হে, আমাদের ওপাড়ার শাস্ত্রে একনিষ্ঠ প্রেমের বালাই নেই। এখানকার প্রেম মনের একটা মাত্র খুপরীতে কেবল-মাত্র একজনের জন্যই থাকে না। আমাদের প্রেম এমন নয়, একজনকে বিলুলেই ফুরিয়ে যাবে। সবার জন্য আমাদের পাড়ার প্রেম।

তোমাদের দ্রৌপদীর মতো আর কি। যুধিষ্ঠির খুড়ো এলে তার সঙ্গে যেমন, ভীম অর্জুন এলেও তেমনি। যদি কিছু পার্থক্য থাকে তা সূক্ষ্ম। আর দ্রৌপদী যখন তোমাদের উপর তলার, তাহলে একালের দ্রৌপদীদের বেলাই বা দোষ কি ?

কিন্তু যাক্ সেকথা, তোমাকে সুবর্ণ নিমন্ত্রণ করেছিলো, অথচ ছাখো তুমি সুবর্ণের বাবু নও, খদ্দের তো নয়ই। তবু যে হালখাতায় (?) তোমার নিমন্ত্রণ ছিলো কেন, তা আমার কাছে না শুনে কমলরাণীর মুখেই শুনো। সুবর্ণকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।

লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়েছিল কিনা, সামনে আয়না ছিলোনা বলে বুঝতে পারি নি সেদিন।

তবে সুবর্ণ বা কমলমণি কাউকেই সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে

পারিনি। আরও ছোট খাট অনেক ঘটনা মনে পড়লো। সব চেয়ে বড় কথা, স্বর্ণর সংগৃহীত তিনকড়ি দাসীর জীবন বৃত্তান্তের শেষে যে লাইনটি ছিলো সে কথাটিতো আমিই জানি।

না, থাক; সেকথা শুধু আমার জানার জন্যই তোলা থাক।

শরৎচন্দ্রের দেবদাস পরজন্মে বাল্যসখী পার্বতীকে পত্নীরূপে কামনা করেনি। করেছিলো চন্দ্রমুখীকে। আদর করে এ জন্মেই তাকে ডাকতো 'বউ'।

কিন্তু আমি শ্রীমান বারাণসী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ডি. এ. সহ দুশ' টাকা মাইনের লেকচারার কোন চন্দ্রমুখীকে পরজন্মে কামনা করিনে। বলি, এজন্মেই কোন চন্দ্রমুখী ঘরে এলোনা, তার আবার পরজন্ম।

তা যাক, শ্রীমতী স্বর্ণর কথা তো জানা হলো। এজন্মে তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। কোন এক নামজাদা সাহিত্যিক অনেকটা এরকম পরিস্থিতিতে নায়ককে আন্দামান পাঠিয়ে, একটা সাংঘাতিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে জাত-জন্ম খুইয়ে এরকম একটা কার্য করার সম্ভাবনা নেই।

শ্রীযুক্ত কুমার কন্দর্প নারায়ণ সে মহান কার্য করুন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কলমের এক খোঁচায় কন্দর্প নারায়ণজীকে বঙ্গদেশের ঘি, দুধ, আর ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বই থেকে বঞ্চিত করে আন্দামান পাঠিয়ে ন্যায় বিচারের তথা মানবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারলাম না বলে আমার পাঠক-পাঠিকা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তবু যদি লেখকের অনুমতি ছাড়াই তিনি আন্দামান যেতে চান, তবে আউটরাম ঘাটে যেয়ে আন্দামান-গামী জাহাজে উঠে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে এই গরীব লেখকের বারাণসী থেকে কোলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত খরচ কন্দর্প নারায়ণজীকেই দিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, ডাক্তার আর লেখকেরা নাকি নিষ্ঠুর হন। ডাক্তার দেহকে কেটে 'ফালা ফালা' করে দেহের রহস্য ভেদ করতে চান। লেখক হৃদয়-কে 'ফালা ফালা' করে হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা

পান। একটা দেহের পোষ্টমর্টেম, আর একটা হৃদয়ের পোষ্টমর্টেম। কিন্তু আমি এমন দরের লেখক, হৃদয় আর হৃদপিণ্ড একই বস্তু কিনা, বা হৃদয় বস্তুটি উদরে থাকে, না মাথায় থাকে অনেক চেষ্টা করেও (ফালা ফালা করেও) তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

তা না পারলাম, তাতে হয়তো তেমন দোষ নেই। কিন্তু শ্রীমতী কমলমণির থান কাপড়ের কথা এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসা না করে নিলে আর জীবনে তা হবে কিনা সন্দেহ। ইতোমধ্যেই বন্ধুবর ও বন্ধুপত্নীর মুখ চোখের অবস্থা যা হয়েছে তাতে হৃদয় আর হৃদপিণ্ড যে একই স্থানে অবস্থান করে তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিলো না। ইতোমধ্যেই তারা মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ মন্দিরে রাখা লক্ষ শিব দেখা শেষ করে ভ্রুকুঞ্চিত করে আমাকে ও কমলমণিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

সুতরাং কালবিলম্ব না করে বললাম, কিছু মনে করোনা কমলমণি, দ্বিজুর সঙ্গে তোমার থান কাপড় পরার কোন সম্পর্ক আছে, নাকি তীর্থে এসেচো বলে থান কাপড পরে এসেচো।

কমলমণির মুখে যুগপৎ লজ্জা ও বিষাদ খেলা করে গেলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নিচু করে বললে, ওঁর কাছে কি কোন কিছুই শুনেননি দাদা?

—কৈ নাতো!

কমলরাণী থান কাপড়ের আঁচলের একপাশ খুঁটতে খুঁটতে বললো, আঙ্গুরবালা বলে কোন নাম ওর মুখে শুনেছেন কোনদিন।

বললাম, হ্যাঁ, অনেকবারই শুনেছি। আঙ্গুরবালাকেই তো বিয়ে করে-ছিলো দ্বিজু চৌধুরী।

আমার বিস্ফারিত প্রতীক্ষার মধ্যে শান্তকণ্ঠে বলে উঠলো কমলমণি, আমিই সেই আঙ্গুরবালা, ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী।

—লে হালুয়া! (কথাটা লেকচারারসুলভ হলোনা বোধহয়। কিন্তু কী করা যাবে বলুন। সাচ্চা ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে চাইলে একটু স-কার ব-কার দিয়ে না বললে ঠিক জুৎ হয়না বলেই কারও কারও ধারণা।)

কিন্তু কি তাজ্জব কা বাৎ, আঙ্গুরবালা কিনা কমলরাণী, অথবা কমলরাণী কিনা আঙ্গুরবালা। আর আমি কিনা না জেনে শুনে আঙ্গুরবালার ঘরে বসেছি, তার জীবন কাহিনী শুনেছি। না, আমার মত গবেট দিয়ে কিচ্ছু হবে না। নিশ্চয়ই আমার এই লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু আগেই, চাইকি দু'পাঁচ পাতা পড়বার পরই যে কোন পাঠকের চিনতে কষ্ট হয়নি, কমলমণিই আঙ্গুরবালা। নিশ্চয়ই পাঁচজনের মধ্যে পাঁচজন পাঠকই বলে বসেচেন, আরে এতো আগেই জানতাম আমরা।

তা জানুন কিন্তু আমি এই মুহূর্তে দশ বছর আগের কমলরাণী ও দ্বিজু চৌধুরীর চিত্র নতুন করে দেখলাম। আর একবার নিজের অজ্ঞাতে মুখ দিয়ে আনপার্লামেণ্টারী শব্দ বেরিয়ে গেলো, লে হালুয়া।

এই ভারতীয় নারী। এই ভারতীয় স্বামী স্ত্রী আর তাদের বন্ধন। সহস্র ভাঙনের মুখে এ বন্ধন অটুট।

দ্বিজু চৌধুরীর মৃতদেহ দাবী করার অনেক অসুবিধে জেনে কমলরাণী দমে যায়নি। নিজে অসুস্থ দেহ নিয়ে ব্যারাকপুরের জঙ্গলে আঁতিপাতি করে খুঁজেছে। এক অতি ছোট অস্থিকণা সংগ্রহ করেছে, এবং ঐ অস্থিকণা যে দ্বিজু চৌধুরীরই তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে।

তারপর সযত্নে সেই অস্থিকণা নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে অর্পণ করেছে। গয়ায় যেয়ে পিণ্ডি দিয়েছে। তারপর বাবার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছে দ্বিজু চৌধুরীর মৃত আত্মার শান্তির জন্য।

মুখে বলেছে, মিনসের তো নরক বাস ছাড়া কিছু হবেনা। তাই এক টুকরা ত্রিবেণীতে ফেলতে এসেছিলাম দাদা। তা ওটা যে কিসের হাড় তা ভগবানই জানেন। মিনসের যদি উদ্ধার পাওয়া বরাতে না থাকে তো আমি কি করতে পারি।

ঠিক দশ বছর আগের কমলমণি। তেমনি দ্বিজু চৌধুরী সম্পর্কে ঝাঝালো কণ্ঠ। কিন্তু এবার যেন সেই রুক্ষ কণ্ঠ ভেদ করে তার সজল অন্তঃকরণটা দেখতে পেলাম, (তবে যে বলছিলাম, হৃদয় কোথায় থাকে জানিনে মশাই !)

কমলমণির অপস্যয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আবার ভাবলাম, এই ভারতীয় নারী। শত ভাঙনের মুখেও হৃদয়ের উপকূলে কেমন দৃঢ় বন্ধন

দিয়ে রেখে সে ভাঙনকে রোধ করেছে।

কিন্তু সব ভারতীয় নারী যে ওসব বন্ধন টন্ধনের ধার ধারেনা তার প্রমাণ পেলাম পরদিন সকালে।

বুড়ো চাকরটার কাছে সংবাদটা শুনে বন্ধুর ঘরের দিকে এগিয়েছি মাত্র। সবটা যাবার আগেই একটি কম্বু কণ্ঠ ভেসে এলো। তার নির্গলিতার্থ, এমন বেশ্যা ঘেঁষা বন্ধু যার, সে যে কোন চরিত্রের লোক, তা বুঝতে আর বাকী নেই বন্ধু পত্নীর। এরপর আর একদিনও সে এখানে থাকতে রাজী নয়। এমন স্বামীর ঘর করতেও রাজী নয়।

এমন কি সে স্বামী ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও না।

সেদিনই দুপুরের গাড়ীতে বন্ধুপত্নীকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যই কিনা কে জানে, কোলকাতার টিকিট কাটিয়ে আনলেন বন্ধুবর।

না, বন্ধুবরকে আমি ঘুণাক্ষরে জানতে দেইনি বিয়ের আগে বন্ধুপত্নী শ্রীমতী শিবানী মজুমদার আর এক বছর আগে এই মডার্ণ বোর্ডিং-এ-ই উঠেছিলেন। বুড়ো চাকরটা ইঙ্গিত করে বলেছিলো, কী একটা দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই নাকি ওরা এসেচে। ওরা মানে শ্রীমতী শিবানী মজুমদার ও তার সঙ্গী উত্তর কোলকাতার এক রকক্লাব বয় শ্রীমান অমুক চন্দ্র অমুক। বুড়োটা দিব্যি গেলে বলেছিলো, ওরা নিঘ্ঘাৎ স্বামী স্ত্রী নয়।

এই সেদিন, চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে, প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তি দেখে ফেরার পথে বন্ধুবর বলেছিলো, বুঝলে ভাই, তোমার এই বন্ধুজায়াটি কিছুতেই এ হোটেলে উঠবেন না। বলেন কিনা, দশাশ্বমেধ হোটেল ভালো, একেবারে গঙ্গার কাছে। কিন্তু সেখানে যে সিট খালি নেই, একথাটা তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনে।

গোধুলিয়ার মডার্ণ বোর্ডিংএ বন্ধুপত্নীটি যে কেন উঠতে চাননি তা আমি তখনই বুঝেছিলাম।

যাঁরা বলেন, আজকাল সাহিত্যিকদের একটা রেওয়াজ হয়েছে, তাঁরা লোকের খারাপ দিকটাই দেখতে পায়। তাদের বিনীতভাবে বলতে ইচ্ছে করে 'সত্যের জয় অসত্যের পরাজয়' সাহিত্যে এ নীতির যুগ বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে

এসেই শেষ হয়েছে। এখানে আমার মতো ক্ষুদে লেখকও যেন ক্রমশই অসহায় হয়ে পড়েছে।

না, পাঠক পাঠিকা ভুল বুঝবেন না, বোধহয় একটা জরুরী কাজে আটকে থাকার জন্যই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে 'সি অফ' করার সৌভাগ্য থেকে এবারও আমাকে বঞ্চিত থাকতে হলো।

কিন্তু কমলমণি যেদিন কোলকাতা যাবে, নির্ঘাৎ আমি টাঙা করে ষ্টেশনে যাবো। চাইকি কমলমণি আপত্তি না করলে, তাকে টিকিট কাটতেও সাহায্য করবো।

না, টাকাটা কমলমণিই দেবে।

ইতি—অনেক অনেক পালার
গুটি কয়েক পালা॥

পরিশিষ্ট

হ্যাঁ, ভালকথা, কমলরাণী আমাকে একটা বাঁধানো খাতা দিয়েছিলো। খাতাটা সুবর্ণর। সুবর্ণ নাকি ওটা আমাকে দিতে বলেছিলো। কেন কে জানে। মুক্তোর মতো হরফে লেখা একটা প্রবন্ধ। আমি হুবহু তুলে দিলাম।

রাশিয়ার বারবণিতাদের নিয়ে লেখা 'ইয়ামা দি পিট' এর লেখক আলেকজান্দার কুপ্রিণ-এর কথায় কৃষক ও বেশ্যা মানুষের মতই প্রাচীন। কুপ্রিণ সাহেব বলতে চেয়েছেন এই দুটো বৃত্তিই সুপ্রাচীন। মজার কথা, এঁদের নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কম এবং অনেক পরে।

মহর্ষি বাৎস্যায়নকেই প্রাচীনতম যৌনশাস্ত্রকার বলা হয়ে থাকে। বাৎস্যায়নই চাণক্য বা কৌটিল্য এ ধারণা অনেক মণীষীর। বাৎস্যায়ন অবশ্য তাঁর 'কামসূত্রম্' রচনায় 'বাভ্রব্য' এর কাছে ঋণী। এই বাভ্রব্য ছিলেন পাঞ্চাল দেশের রাজা। কথিত হয় অথর্ববেদের কিছু কিছু মন্ত্র এঁর রচনা।

এছাড়া বাৎস্যায়ন যাঁদের কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য নিয়েছেন, তাঁরা হলেন, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, সুবর্ণনাভ, গোনর্দীয়, গোণিকাপুত্র, দত্তক, কুচুমার।

অবশ্য একেবারে আদিতে গেলে, 'কাম মীমাংসার প্রথম সঙ্কলয়িতা মহাদেবের অনুচর নন্দী। তিনি বেদ হইতে ইহা সঙ্কলন করেন।' এরপর যাঁর নাম করা যায়, তিনি হচ্ছেন, 'ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু, ইনি একজন ব্রহ্মজ্ঞ। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও মহাভারতে ইঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।'

দত্তক পাটলিপুত্র নগরীর পতিতাদের ওপর গবেষণা করে লেখেন। অনেকের মতে গোনর্দীয় আর পতঞ্জলি একই লোক। এঁর জন্মস্থান উজ্জয়িনীর কাছে গোনর্দ গ্রামে।

মহর্ষি বাৎস্যায়নের কামসূত্রের একটি বিশেষ খণ্ড বৈশিক অধিকরণ। এটা দত্তক এর রচনা থেকে সাহায্য নিয়ে লেখা বলে অনেকে মনে করেন। বৈশিক অধিকরণ বেশ্যাদের নিয়ে লেখা। দু'টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

এখানে বেশ্যাবৃত্তি কতপ্রকার, নারীর বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের কারণ, বেশ্যার

উপপতি গ্রহণ, এই বৃত্তিতে সাফল্যলাভের উপায়, কোন শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে বেশ্যার উপগত হওয়া উচিত বা অনুচিত, কিভাবে বেশ্যা নায়ক সংগ্রহ করবে, কিভাবে নায়কের মনস্তুষ্টি তথা অর্থোপার্জন করবে, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বাৎস্যায়নের মতে বেশ্যা প্রধাণতঃ দুই শ্রেণীর। এক পরিগ্রহা বা কারো রক্ষিতা, অপরিগ্রহা বা বহুভোগ্যা বারবণিতা। এ ছাড়া 'অনেক পরিগ্রহা' বলেও এক শ্রেণীর বেশ্যার কথা বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন।

আবার ব্যাপক অর্থে, বাৎস্যায়ন বলেছেন—

কুম্ভদাসী পরিচারিকা কুলটা স্বৈরিণী নটী শিল্পকারিকা।
প্রকাশবিনষ্টা রূপোজীবা গণিকা চেতি বেশ্যাবিশেষাঃ ॥

অর্থাৎ 'কুম্ভদাসী (সামান্য কর্মচারী), পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী (যে পতিকে তিরস্কার করে স্বগৃহে বা অন্যগৃহে যেয়ে অন্য ব্যক্তির অভিগম করে), নটী, শিল্পকারিকা (রজক, তন্তুবায়, ভার্যা ইত্যাদি), প্রকাশবিনষ্টা (পতি মৃত বা জীবিত থাকতেই সংগ্রহণ ধর্মে গৃহীত হয়ে কামাচার প্রবৃত্তিতে চলে থাকে), রূপজীবা এবং গণিকা, এই কয়টি বেশ্যা বিশেষ'—(মহেশচন্দ্র পাল অনূদিত)।

এর মধ্যে প্রথম 'ছ'টি রূপোজীবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তদ্ভিন্ন কুম্ভদাসী ও গণিকা, এই তিন প্রকারই বেশ্যা জানিবে।'

বাৎস্যায়ন অনুসারে বেশ্যা ও গণিকায় পার্থক্য আছে। চৌষট্টি কলায় যিনি সিদ্ধা তিনিই গণিকা। সাধারণ বেশ্যা থেকে এরা স্বতন্ত্র। মৌর্যযুগে এবং তদ্‌পরবর্তী যুগে উল্লেখ আছে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাদের সম্মান দিতেন এবং তাদের কাছে আসতেন।

বাৎস্যায়ন বলেছেন,

"পূজিত সা সদা রাজ্ঞা গুণবদ্ভিশ্চ সংস্তুতা।
প্রার্থনীয়াভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে ॥"

—'রাজা তার (গণিকার) পূজা করেন। গুণবান্‌গণ তার গুণের অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূতা হয়।'

এই চৌষট্টি কলা কি, এ প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন, এর মধ্যে কর্মাশ্রয় চতুর্বিংশতি কলা, যথা, গীত, নৃত্য, বাদ্য, লিপিজ্ঞান (অক্ষর বিন্যাস বোধ),

বচন (বক্তৃতা), চিত্রবিধি, পুস্তক কর্ম (পুস্তক রচনা), পত্রচ্ছেদ্য (তিলক না), মালবিধি, অস্বাদ্য বিধান (রন্ধন), রত্ন পরীক্ষা, সীব্য (সেলাই), ...পরিজ্ঞান, উপকরণক্রিয়া, মান (মাপ) বিধি, আজীব (জীবনোপায়) জ্ঞান, তির্য্যগ্‌যোনিচিকিৎসিত (পশুপক্ষী-আদি-চিকিৎসা), মায়াকৃত (ইন্দ্রজাল), পাষণ্ডসময় জ্ঞান (বদমায়েশদের স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার প্রভৃতি জানা), ক্রীড়া-কৌশল, লোকজ্ঞান, বিচক্ষণতা, সংবাহন, শরীর সংস্কার এবং বিশেষ কৌশল।

অন্যান্য কলাগুলির মধ্যে দ্যূতাশ্রিত বিংশতি প্রকার কলা হচ্ছে 'আয়ুঃপ্রাপ্তি সর্ববিধ চিকিৎসা জানা), অক্ষবিধান, রূপসংখ্যা, ক্রিয়ামার্গ, বীজ গ্রহণ, নয় জ্ঞান (নীতিশাস্ত্র জ্ঞান), করণাদান (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শরীর—এগুলোকে স্ববশে আনা), চিত্রাচিত্র বিধি, গূঢ়রাশি (সঙ্কেত ভাষা ব্যবহার), তুল্যাভিহার, ক্ষিপ্রগ্রহণ, অনুপ্রাপ্তি লেখাস্মৃতি, অগ্নিক্রম, ছলব্যামোহন (ছলনা দ্বারা কার্যোদ্ধার জ্ঞান), গ্রহদান, উপস্থানবিধি, যুদ্ধ, রুত (জীবমাত্রেরই শব্দের অনুকরণে শব্দ করতে পারা), গত ও নৃত্য।

এছাড়া, শয়নোপচারিক ষোড়শটি কলার মধ্যে, 'পুরুষের ভাবগ্রহণ, স্বরাগ-প্রকাশন, প্রত্যঙ্গ জ্ঞান (স্ত্রী বা পুরুষের প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে নিজের প্রত্যেক অঙ্গের আশ্লেষণ বা আলিঙ্গন করতে জানা), নখ ও দন্তের বিচারদ্বয়, নীবী স্রংসন (গাঁট কাটা প্রভৃতি কৌশল এরই অঙ্গোপাঙ্গ), গুহ্যের সংস্পর্শের অনুলোমতা (কোন্ অঙ্গের স্পর্শের পর কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিলে অধিক সুখোদয় হয়, তাহা জানা), পরমার্থ কৌশল, হর্ষণ, সমানার্থতাকৃতার্থতা একই সময়ে উভয়ের শুক্র স্খলন করার উপায় বোধ), অনুপ্রোৎসাহন (মনের ভাব বুঝে কাজে উৎসাহদান করতে শিক্ষা), মৃদুক্রোধ প্রবর্ত্তন, সম্যকক্রোধ নিবর্তন, ক্রুদ্ধ প্রসাধন, সুপ্ত পরিত্যাগ (নিদ্রা আয়ত্ত করণ বিধি), চরম স্বাপবিধি (মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করার উপায় বিধি) এবং গুহ্যগূহন (গোপনীয় বিষয় গোপন রাখতে জানা)।

শেষ চারটি কলা অর্থাৎ উত্তর কলা চারটি হচ্ছে, রমণের জন্য অশ্রুপাতের সঙ্গে শাপদান, নিজ শপথ ক্রিয়া, প্রস্থিতানুগমন (যে চলে যাচ্ছে তাকে এগিয়ে যেয়ে বিদায় দেয়া), বারংবার নিরীক্ষণ।

এই চৌষট্টি কলা মৌলিক। এরমধ্যে আবার উপায়লভ্য চৌষট্টি কলার

কথা বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন। এই কলাপটিয়সীদের মধ্যে চিন্তামণি, লক্ষহীরা, বসন্তসেনা, বাসবদত্তা প্রভৃতি প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র বিশেষ। উনবিংশ শতাব্দীতে গহরজান, ছোটময়না, বড় ময়না, সরস্বতী, হোসেনার নাম এদেশের রসিক সমাজে পরিচিত।

উত্তম বেশ্যা হতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার এ সম্পর্কে বাৎস্যায়ন বলেছেন,

নায়িকায়াঃ পুনা রূপযৌবনলক্ষণ মাধুর্য্যযোগিনী গুণেষ্বনুরক্তা
ন তথার্থেষু প্রীতিসংযোগশীলা স্থিরমতিরেকজাতীয়া বিশেষার্থিনী
নিত্যমকদর্য্যবৃত্তির্গোষ্ঠীকলাপ্রিয়া চেতি।

বৈশিকাধিকরণম্ ১ম ॥ ৬ ॥

মহেশচন্দ্রের অনুবাদ অনুসারে, রূপ, যৌবন, লক্ষণ, মাধুর্য, গুণে অনুরাগ, অর্থে তাদৃশ অনুরাগ নহে, প্রীতি সংযোগ, মতিস্থৈর্য, একজাতি (মায়াবিনী না হওয়া), বিশেষার্থিতা (যে কোন বস্তুতে রুচি প্রকাশ না করা), নিয়ত অকর্য্য-বৃত্তি ও গোষ্ঠীকালানুরাগ।

নায়ক জুটিয়ে আনার জন্য বেশ্যার দূত বা দালালের প্রয়োজন।

বাৎস্যায়ন এ সম্পর্কে বলেছেন,

তে ত্বারক্ষকপুরুষা ধর্ম্মাধিকরণস্থা দৈবজ্ঞা বিক্রান্তাঃ শূরাঃ
সমানবিদ্যাঃ কলাগ্রাহিণঃ পীঠমর্দ্দবিট বিদূষক মালাকার—
গান্ধিক শৌণ্ডিকরজকনাপিতভিক্ষুকাস্তে চ তে চ কার্য্যযোগাৎ ॥

অর্থাৎ 'এই সকল দালাল হইবে, ধর্মাধিকরণের দৈবজ্ঞ, বিশেষ বিক্রমশালী শূর, সমানবিদ্য, কলাগ্রাহী, পীঠমর্দ্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক, শৌণ্ডিক, রজক, নাপিত এবং ভিক্ষুকগণ···· ।'

বেশ্যা কাদের শয্যায় গ্রহণ করবে না এ সম্পর্কে বাৎস্যায়নের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে,

ক্ষয়ী রোগী কৃমিশকৃদ্বায়সাস্যঃ প্রিয়কলত্রঃ পরুষবাক্কদর্য্যো
নির্ঘৃণো গুরুজন পরিত্যক্তঃ স্তেনো দম্ভশীলো মূলকর্ম্মণি প্রসক্তে।
মানাপমানয়োরনপেক্ষী দ্বেষ্যৈরপ্যর্থহার্য্যো বিলজ্জ ইত্যগম্যাঃ ॥

অর্থাৎ, 'রাজযক্ষ্মা রোগ যাহার আছে, কুষ্ঠরোগ যাহার আছে, আর

ার বিষ্ঠামক্ষিকা আছে, সে যে ব্রনে বিষ্ঠাত্যাগ করে, সেই ব্রণেই ক্রমি ইরূপ যাহার শুক্রসংসর্গ মাত্রে স্ত্রী গর্ভবতী হয়, সেও ক্রমিশক্বৎপদবাচ্য, । যে কোন স্ত্রীতে গমনকারী (শুচি ও অশুচি অভেদে কাক যেমন মুখ .র সেইরূপ), যে নিজ স্ত্রীকে ভালবাসে, যাহার বাক্য অতীব কঠোর, .ঘ্র্ণ অর্থাৎ নির্দ্দয়, গুরুজন পরিত্যক্তা, চোর, দম্ভশীল, মূলকর্মে (মারণ, াদিতে) প্রসক্ত, মান ও অপমানের অপেক্ষা করেনা, যে দ্বেষ্য ও অর্থহার্য্য অর্থাৎ অর্থের লোভ দেখাইয়া আহরণ করিতে পারে এবং —এই সকল ব্যক্তি কখনই গম্য হইতে পারেনা।

ল গম্য কে ? বারবণিতা কাকে শয্যায় গ্রহণ করবে ?

ার্কে বাৎস্যায়ন বলেছেন,

.কবলার্থাস্বমী গম্যাঃ—

কেবলমাত্র অর্থসিদ্ধিকর এই সব পুরুষ গম্য।

া কারা ? না,

স্বতন্ত্রঃ পূর্ব্বে বয়সি বর্ত্তমানো বিত্তবানপরোক্ষবৃত্তিরাধিকরণ-বানকৃচ্ছ্রাধিগতবিত্তঃ। সজ্ঘর্ষবান্ সন্ততায়ঃ সুভগমানী শ্লাঘনকঃ পুণ্ডকশ্চ পুংশব্দার্থী। সমান স্পর্দ্ধী স্বভাবতস্ত্যাগী। রাজনি মহামাত্রে বা সিদ্ধো দৈবপ্রমাণো বিত্তাবমানী গুরূণাং শাসনাতিগঃ সজাতানাং লক্ষ্যভূতঃ সাবিত্ত একপুত্রো লিঙ্গী প্রচ্ছন্নকামঃ শূরো বৈদ্যশ্চেতি ॥

বৈশিকাধিকরণম্। ১ম অধ্যায় ॥ ৩ ॥

ার বলছেন, স্বাধীন, প্রথম বয়সে বর্তমান যুবক, ধনবান্, যাহার বৃত্তি প্রত্যক্ষগোচরে অবস্থিত, অর্থাধিকারে অধিকৃত, যাহার ধন কষ্ট করে রিতে হয় নাই, যে স্পর্ধাবান, যাহার আয় নিরবধি আছে, যে দুর্ভাগ্য জেকে সুভগ বলিয়া মনে করে, যে নিজের শ্লাঘা করা ভালবাসে, পুরুষ বলিয়া খ্যাপন করিতে নপুংসক ভালবাসে, যে সমান স্পর্দ্ধী, দানশীল, রাজা বা মহামাত্রের নিকট যে গ্রাহ্যবচন, দৈবপ্রমাণ অর্থাৎ রে ভাগ্যক্ষয়েই ধনক্ষয় হয়, উপভোগে নহে, যে ধনের মমতা করেনা, র শাসনাতিক্রান্ত, সজাত দায়াদ বর্গের লক্ষ্যভূত, ধনবানের একমাত্র কাম সন্ন্যাসী, ধনবান শূর এবং বৈদ্য, যাহার চিকিৎসায় আরোগ্যের

আশা করা যায়, সে যদি ধনবান নাও হয়, তথাপি গম্য , কারণ চিরি
করিবে।

ইহা ব্যতীত আরও যারা গম্য বলে বাৎস্যায়ন মনে করেন, তাঁরা :

প্রীতি যশোঽর্থাস্তু গুণতোঽধিগম্যাঃ।

অর্থাৎ, যে সকল গুণবানের কাছে প্রীতি ও যশ লাভ করা যায়, (
গুণবান ব্যক্তি গম্য।

অথ সুবর্ণ-বাৎস্যায়ন সমাচার পর্ব সমাপ্ত। মধু মধু। তাজ্জব
জেলে না গেলে এই এক গবেষণাযই ডক্টরেট, নিদেন পক্ষে সরস্ব
পারতেন।

ভালকথা, পুস্তকের একটা জায়গায় একটা ত্রুটি রয়ে গেছে বলে
বলেছেন, শ্বেতকেতুর পিতাব নামই উদ্দালক। বস্তুতঃ সেজন্যেই শ্বে
'ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু' বলা হতো। অবশ্য উদ্দালক ঋষিও একজ
শাস্ত্রকার ছিলেন।